# বাংলা গদ্যের চার যুগ

প্রকাশক—
এ, সি, দাশগুপ্ত
দাশগুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ,
৫৪।৩, কলেজ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৪৯

প্রিণ্টার—
শ্রীনবীগোপাল সিংহ রায়,
তারা প্রেস,
১৪বি, শঙ্কর ঘোষ লেন,
কলিকাতা

# বাংলা গদ্যের চার যুগ

অথবা

বাংলা সাহিত্যে গদ্যরীতির উৎপত্তি ও
ক্রমবিকাশের বিবরণ

শ্রীমনোমোহন ঘোষ, এম. এ., পি-এইচ. ডি.

দাশগুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ
পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক,
৫৪।৩, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

## এই গ্রন্থকারের অন্যান্য পুস্তক

১। **অভিনয়দর্পণ** ( সংস্কৃত ও ইংরেজী ) কলিকাতা, ১৯৩৪।

২। Medieval Mysticism of India—( বাংলা গ্রন্থের অনুবাদ ) London, 1935.

৩। **চতুরঙ্গদীপিকা** ( সংস্কৃত ও ইংরেজী )—কলিকাতা, ১৯৩৬।

৪। **পাণিনীয়শিক্ষা** ( সংস্কৃত ও ইংরেজী )—কলিকাতা, ১৯৩৮

৫। **কর্পূরমঞ্জরী** ( প্রাকৃত ও ইংরেজী ) কলিকাতা, ১৯৩৯।

৬। **রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র,** কলিকাতা, ১৯৪২।

৭। **প্রাচীন ভারতের নাট্যকলা,** ১৯৪৫।

৮। **সাহিত্যশিল্প,** কলিকাতা, ১৯৪৫।

৯। Bharata's Natyasastra in English Translation ( *in the press* ).

মাননীয় ডক্টর শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়,

এম. এ, ডি. লিট., এল-এল. ডি.

মহোদয়কে

আন্তরিক শ্রদ্ধার সহিত

সমর্পিত

# সূচীপত্র

# প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

প্রায় দেড়শ' বছর ধরে বাংলা গদ্যে গ্রন্থ রচনা চলতে থাকলেও, এ গদ্যের সাহিত্যিক রূপটি কেমন ক'রে ক্রমশ গড়ে উঠে' বর্তমান অবস্থায় পৌঁছেচে, সে সম্বন্ধে কোন সুস্পষ্ট ঐতিহাসিক আলোচনাই এ পর্যন্ত হয় নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও আর কেউ যে এ কাজে হাত দেন নি তা নয়। শ্রীযুক্ত ( অধুনা ডক্টর ) সুশীল কুমার দে মহাশয় History of Bengali Literature in the Nineteenth Century (1800-1825 ) নামক গ্রন্থেই বাংলা গদ্যের ইতিহাস আলোচনার উল্লেখযোগ্য সূত্রপাত করেন ( ১৯১৯ )। তার পরে ( ১৯২১ ) প্রকাশিত হয় স্বর্গীয় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের Bengali Prose Style ( 1800-1857 ); এই শেষোক্ত পুস্তকের এক বছর পরে ( ১৯২২ ) স্বর্গীয় শিবরতন মিত্র মহাশয় Types of Early Bengali Prose নামে প্রাগ্-আধুনিক বাংলা গদ্যের প্রচুর নমুনার এক সংগ্রহ প্রকাশ করেন। এ সকল ছাড়া সাময়িক পত্রিকায়ও মাঝে মাঝে এ বিষয়ে দু'চারটি প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে। বাংলা গদ্যরীতির এ সকল আলোচনার পরে এসম্বন্ধে একমাত্র উল্লেখযোগ্য পুস্তক হচ্ছে শ্রীযুক্ত ( অধুনা ডক্টর ) সুকুমার সেন মহাশয়ের রচিত 'বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য', ( ১৯৩৪ )। এ গ্রন্থখানিতে অনেকটা কালানুক্রমিকভাবে বাংলার উল্লেখযোগ্য গদ্য লেখকদের রচনারীতির বিচার করা হয়েছে। কিন্তু এ সত্ত্বেও বইখানিকে পুরোদস্তর ইতিহাসের পর্যায়ে ফেলা যায় না। অবশ্য এতে বাংলা গদ্যের ইতিহাসের অনেক মাল মশলা সংগৃহীত আছে। বইখানি পড়েই আমি বাংলা গদ্য-রীতির ক্রমবিকাশের ধারা সম্বন্ধে অনুসন্ধানের প্রয়োজন অনুভব করি এবং প্রায় তিন চার বছর ধরে কিছু কাজ করার পরে বাংলা মাসিক পত্রে এ বিষয়ে আমার কয়েকটি প্রবন্ধও প্রকাশিত হয়। কিন্তু তখনো অদূর ভবিষ্যতে পুস্তক প্রকাশের কোন কল্পনা ছিল না। এমন সময়ে ডক্টর সেন 'বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য' পুস্তকের যে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করলেন ( ১৯৪৯ )

তাতে দেখা গেল যে, 'গদ্যরীতি'র আলোচনা বর্জন ক'রে বইখানিকে তিনি গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস হিসাবে দাঁড় করিয়েছেন। এরূপে বাংলা গদ্য রীতির ইতিহাস সম্পর্কীয় পুস্তকের অভাব ঘটতে দেখে আমি এ গ্রন্থ প্রকাশে প্রবৃত্ত হই।

ঐতিহাসিক মাত্রেই জানেন যে কোন বইতে ঘটনাবলির কেবল কালানুক্রমিক উল্লেখ করলেই তা ইতিহাস আখ্যা লাভ করে না। ঘটনাসমূহের পরম্পরসঙ্গতি বা কার্যকারণ সম্পর্কের আবিষ্কার করলেই তবে সে সকল নিয়ে ইতিহাস গ'ড়ে উঠতে পারে। তবে একাজ বিশেষ সহজসাধ্য নয়। এতে নানা ভুল ভ্রান্তি ঘটতে পারে। কিন্তু এ আশঙ্কা সুমুখে নিয়েও বাংলা গদ্যরীতির আলোচনায় যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। এ প্রসঙ্গে যে সব মতামত প্রকাশ করতে হয়েছে সে গুলি যে সর্বত্র সকলের সমর্থন পাবে এমন আশা করিনে; তবু বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে যে সকল সজ্জনের অনুরাগ আছে, তাঁরা এই গ্রন্থ রচনার প্রয়াসকে প্রীতির চোখে দেখবেন এমন ভরসা করি।

গবেষণামূলক পুস্তক হলেও একে যথাসম্ভব আড়ম্বরহীন রূপ দেওয়া হয়েছে। পাদটীকার বাহুল্যে বইখানি সাধারণ পাঠকের নিকট দুরূহ আকার ধারণ করতে পারে, এ আশঙ্কায় অধিকাংশ মন্তব্য ও অত্যাবশ্যক প্রমাণসমুল্লেখ পৃষ্ঠাদিক্রমে পরিশিষ্টে করা গিয়েছে।

চলতি ভাষার শক্তি ও সৌন্দর্য সম্বন্ধে যথেষ্ট বিশ্বাস থাকলেও এ বইতে সে ভাষা ব্যবহার করার জন্যে কিছু কৈফিয়ৎ দেওয়ার দরকার আছে ব'লে মনে করি। কারণ, গুরুগম্ভীর বিষয়ের আলোচনায় চলতি ভাষার ব্যবহার এখনো অনেক পাঠকের আন্তরিক অনুমোদন লাভ করতে পারে নি। তাঁদের প্রতি এই নিবেদন যে, বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশ সহজবোধ্য হবে মনে করেই এতে চলতি ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। প্রাচীনকাল থেকে আরম্ভ করে আধুনিককাল পর্যন্ত নানা যুগপর্যায়ের বাংলা গদ্যের যে নমুনাগুলি উদ্ধৃত হয়েছে সেগুলি চলতি ভাষার পাশাপাশি বিন্যস্ত হওয়ার ফলে বাংলা গদ্যরীতির ক্রমবিকাশের চিত্রটি স্ফুটতর হয়ে ওঠবার সম্ভাবনা আছে।

এই বইএর বানান পদ্ধতি সম্বন্ধেও কিছু বলা প্রয়োজন। একালের বিভিন্ন গ্রন্থকারের রচনা উদ্ধার করতে গিয়ে তাঁদের নিজস্ব বানানপদ্ধতি বজায় রেখেছি। রবীন্দ্রনাথের শেষের দিকের যে গ্রন্থগুলি নূতন বানান নিয়েই প্রথম প্রকাশিত হয়েছে সেগুলি ছাড়া তাঁর আর সকল বইএর পুরাণো বানানযুক্ত সংস্করণগুলিরই পাঠ নেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া গ্রন্থকারের নিজস্ব রচনায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবর্তিত বানান অনেকাংশেই গৃহীত হয়েছে, তবে সর্বাংশে নয়।

ঘটনা সমূহের পৌর্বাপর্য সহজে বোঝা যাবে আশা ক'রে এ পুস্তকে উল্লিখিত তারিখ গুলিকে খ্রীষ্টীয় সালে বদল ক'রে দিয়েছি। অতএব এ বইতে সাল অর্থে অন্য পদ্ধতির বর্ষ গণনা বোঝাবে না। কোনো কোনো বাংলা সাল, সংবৎ বা শককে খ্রীষ্টীয় সালে বদল করতে গিয়ে হয়ত একটু আধটু ভুল থেকে গেছে; কিন্তু উপস্থিত ক্ষেত্রে এ ভুলকে মারাত্মক মনে করবার তেমন কারণ নেই। তবু সে রকম ভুল চোখে পড়লে কেউ যদি দয়া ক'রে দেখিয়ে দেন তবে তিনি আমার ধন্যবাদার্হ হবেন। অন্যান্য ভুল সম্বন্ধেও এই আমার বিনীত নিবেদন।

ভূমিকার উপসংহারে কৃতজ্ঞতা স্বীকার ও ধন্যবাদ দানের কথা। এ বইএর প্রণয়ন ব্যাপারে আমি নানা গ্রন্থের সাহায্য পেয়েছি। গ্রন্থপরিচয়ে সে সকল যথাযথ বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এদের মধ্যে শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে রচিত History of Bengali Literature in the Nineteenth Century, শিবরতন মিত্র সংকলিত Types of Early Bengali Prose এবং লঙ (Rev. J. Long), সংকলিত 'সংবাদসার' সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংগৃহীত 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' ও তৎপ্রণীত 'বাংলা সাময়িক পত্র' থেকেও নানা তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। পুস্তক দুখানি থেকে প্রাচীন বাংলা সাময়িক পত্রের রচনায় অল্প কয়েকটি নমুনাও উদ্ধার করেছি। অবশিষ্ট এবং বেশির ভাগ নমুনাগুলি লঙ এর 'সংবাদসার' থেকে উদ্ধৃত।

যাঁদের উৎসাহে এ পুস্তক প্রকাশিত হ'ল তাঁদের মধ্যে ডক্টর শ্রীকালিদাস নাগ মহাশয়ের নাম সকলের আগে উল্লেখ করা উচিত।

শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ও গ্রন্থকারের কয়েকটি প্রবন্ধ তাঁর 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশ ক'রে এ বিষয়ে তদীয় উৎসাহ বর্ধন করেছেন। এ উপলক্ষে আমি তাঁদের অকৃত্রিম আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বর্তমান সময়ে নানা অসুবিধার মধ্যেও এ পুস্তক প্রকাশের বন্দোবস্ত ক'রে দাশগুপ্ত কোম্পানীর অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয়ও আমার বিশেষ ধন্যবাদভাজন হয়েছেন। এসকল ছাড়া আর একজনের নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয়। আমার স্ত্রী শ্রীমতী মমতা ঘোষ প্রুফ সংশোধনের অবকাশে এ বইএর নানাপ্রকার ভ্রম-প্রমাদ দূর ক'রে এর উপযোগিতা বাড়িয়েছেন। এই সাহায্যের কথা প্রকাশে তিনি অনিচ্ছুক থাকলেও এ বিষয় সকলকে জানিয়ে আমি বিশেষ আনন্দ বোধ করছি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়,<br>৩১শে মার্চ্চ, ১৯৪২ } শ্রীমনোমোহন ঘোষ

## গ্রন্থপরিচয়


অক্ষয়কুমার দত্ত—চারুপাঠ, ২য় ভাগ ( সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত, )
কলিকাতা, ১৯১৮।

ধর্ম্মনীতি, কলিকাতা, ১৮১৬ শক।

বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধবিচার, কলিকাতা, ১৮০৩শক।

ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, ১ম ভাগ, কলিকাতা, ১৮৮৮।

অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী -মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, এলাহাবাদ, ১৯১৬।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর—রাজকাহিনী, কলিকাতা, ১৩২৬ বাং।

পথে বিপথে, কলিকাতা, ১৩২৫ বাং।

আসুম্পসাঁও—(Manoel da Assumpcam)—কৃপার শাস্ত্রের
অর্থভেদ—(Crepar Xaxtrer Orthobhed) লিস্‌বন্‌, ১৭৪৩।

ইয়েটস্‌ ( Rev. Dr. Yates )—সারসংগ্রহ, কলিকাতা, ১৮৪৪।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—গ্রন্থাবলী, কলিকাতা, ১৩৪৪-৪৭ বাং।

জীবন চরিত, কলিকাতা, ১৮৪৯।

বিধবা বিবাহ, কলিকাতা, ১৯২৯ সংবৎ।

বেতাল পঞ্চবিংশতি, কলিকাতা, ১৮৪৭।

ব্রজবিলাস, কলিকাতা, ১২৯১ বাং।

শকুন্তলা, কলিকাতা, ১৮৫৪।

সীতার বনবাস, কলিকাতা, ১৮৬০।

সীতার বনবাস—( চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সং ) এলাহাবাদ ১৯০৯

কালীপ্রসন্ন ঘোষ—নিভৃতচিন্তা, ঢাকা, ১৩২০ বাং।

নিশীথচিন্তা, ঢাকা, ১৩২০ বাং।

প্রভাতচিন্তা, ঢাকা, ১২৯৯ বাং।

কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন—পাষণ্ডপীড়ন, কলিকাতা, ১৮২৩।

পদার্থ কৌমুদী ( ভাবাপরিচ্ছেদের অনুবাদ ), কলিকাতা, ১৮২১।

কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য—দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথাভ্রমণ, কলিকাতা ১৭৭৯ শক।

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়—উপদেশ কথা, কলিকাতা, ১৮৪০।

বিদ্যাকল্পদ্রুম ( ১ম – ৩শ ) কলিকাতা, ১৮৪৬ – ১৮৫০।

সত্যস্থাপন ও মিথ্যানাশন, কলিকাতা, ১৮৪১।

কেরী Felix Carey ) – ব্যবচ্ছেদবিদ্যা, শ্রীরামপুর, ১৮২০।

কেশবচন্দ্র সেন—আচার্য্যের উপদেশ, কলিকাতা, ১৮৩৬ শক।

ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায—গ্রীক দেশের ইতিহাস, কলিকাতা, ১৮৩৩।

গোপাল লাল মিত্র—জ্ঞানচন্দ্রিকা, কলিকাতা, ১৮৩৮।

গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার—স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক, কলিকাতা ১৮২৪।

গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ জ্ঞানপ্রদীপ ১মভাগ, কলিকাতা, ১৮৪০।

চন্দ ও মজুমদার ( R. P. Chanda and J. K. Majumdar )— Selection from Official Letters and Documents relating to the life of Raja Rammohan Roy. Vol. I. কলিকাতা, ১৯৩৮।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ( অক্ষয়কুমার দত্ত সম্পাদিত )।

তারাচাঁদ দত্ত মনোরঞ্জনেতিহাস ( ৩য় সং ) কলিকাতা ১৮২৮।

তারাশঙ্কর তর্করত্ন—কাদম্বরী, কলিকাতা, ১৮৫৩।

দীনেশচন্দ্র সেন – বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ৭ম সং, কলিকাতা।

বঙ্গসাহিত্য পরিচ , কলিকাতা, ১৯৪১।

Bengali Prose Style, কলিকাতা, ১৯২১।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—আত্মজীবনী, কলিকাতা, ১৮৯৮।

ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান, কলিকাতা, ১৭৮৩ শক।

ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা, কলিকাতা, ১৭৮০ শক।

নিখিলনাথ রায – প্রতাপাদিত্য, কলিকাতা ১৩১৩ বাং।

পিযার্স ( W. Pearce ) – পত্রাবলী, কলিকাতা, ১৮২৮।

প্যারীচাঁদ মিত্রের গ্রন্থাবলী ( বঙ্কিমচন্দ্র কৃত ভূমিকাসহ ) কলিকাতা, ১২৯৯ বাং।

প্রবাসী, ১৩৪৭, ১৩৪৮ বাং।

প্রমথ চৌধুরী—বীরবলের হালখাতা, কলিকাতা, ১৩৩৩ বাং।

প্রেমচাঁদ রায়– জ্ঞানার্ণব, কলিকাতা, ১৮৪২।

ভবানীচরণ তর্কভূষণ—জ্ঞানরসতরঙ্গিণী, কলিকাতা, ১৮২৮।

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—কলিকাতা কমলালয়। কলিকাতা, ১৮২৩।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়—ইংলণ্ডের ইতিহাস, চুঁচুড়া ১২৬৯ বাং।

ঐতিহাসিক উপন্যাস, চুঁচুড়া—১২৭১ বাং।

পারিবারিক প্রবন্ধ ( ২য় সং ) চুঁচুড়া—১২৯২ বাং।

পুষ্পাঞ্জলি, চুঁচুড়া—১৮৭৫।

বাঙ্গালার ইতিহাস, ৩য় ভাগ চুঁচুড়া, ১৮৬৫।

বিবিধ প্রবন্ধ—চুঁচুড়া ( ১৮৮০—১৮৯০ )

সামাজিক প্রবন্ধ—চুঁচুড়া ১২৯৯ বাং।

স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস, চুঁচুড়া, ১৮৭৫।

ভ্রমপ্রকাশপত্র, শ্রীরামপুর, ১৮২৬।

মার্শম্যান ( J. C. Marshman )—The Life and Times of Carey, Marshman and Ward, লণ্ডন, ১৮৫৯।

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার—প্রবোধচন্দ্রিকা, শ্রীরামপুর, ১৮৩৩।

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত—কেশবচন্দ্র ও বঙ্গসাহিত্য, কলিকাতা, ১৩৪৩।

কেশবচন্দ্রের রাষ্ট্রবাণী, কলিকাতা।

রমেশচন্দ্র দত্তের গ্রন্থাবলী ( বসুমতী সংস্করণ )।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—গল্পগুচ্ছ, বিশ্বভারতী সং, কলিকাতা।

ঘরে বাইরে, কলিকাতা, ১৯১৬।

নৌকাডুবি, কলিকাতা, ১৯০৬।

য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র, ( ভারতী, ১২৮৬ বাং )।

য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারী, কলিকাতা, ১২৮—১৩০০ বাং।

যোগাযোগ, কলিকাতা, ১৯২৯।

শান্তিনিকেতন, নূতন বিশ্বভারতী সং।

রহস্য সন্দর্ভ ( রাজেন্দ্র লাল মিত্র সম্পাদিত )

রাজেন্দ্রলাল মিত্র অনুবাদিত খ্রীষ্টীয় স্তব।

রামগতি ন্যায়রত্ন—রোমাবতী, কলিকাতা ( ? ) ১৮৯৬। বাঙ্গালা-ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব, চুঁচুড়া ১৯৩০-৩১ সংবৎ।

রামজয় তর্কালঙ্কার—সাংখ্য প্রবচন ভাষ্য, শ্রীরামপুর, ১৮১৮।
রামমোহন রায়ের বাংলা গ্রন্থাবলী, এলাহাবাদের পাণিনি আপিস প্রকাশিত।
লঙ্ ( Rev. J. Long )—সংবাদসার, কলিকাতা, ১৮৫৩।
A Descriptive Calalogue of 1400 Vernacular Works and Pamphlets, কলিকাতা, ১৮৫৫।
বাইবেলের অনুবাদ ( কলিকাতা বাইবেল সোসাইটি কৃত ), ১৮৩৩-৪০।
বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায়—গ্রন্থাবলী ( বসুমতী সং ও শতবার্ষিক সং )।
বিপিনবিহারী গুপ্ত—পুরাতন প্রসঙ্গ ১ম খণ্ড, কলিকাতা, ১৬২০ বাং।
বিবেকানন্দ স্বামী—পরিব্রাজক, কলিকাতা, ১৩১৮ বাং।
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, কলিকাতা, ১৩১৩ বাং।
বর্ত্তমান ভারত, কলিকাতা, ১৩১৫ বাং।
ভাববার কথা, কলিকাতা, ১৩২০ বাং।
ব্রজমোহন দেব ( মজুমদার ) —পথ্যপ্রকাশ, কলিকাতা, ১৮৪২।
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় —বাংলা সাময়িক পত্র, কলিকাতা, ১৩৪৬ বাং।
সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ( ১ম সং ) কলিকাতা।
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—গ্রন্থাবলী ( বসুমতী সং )।
শিবনাথ শাস্ত্রী—রামতনু লাহিড়ি ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ ( ৩য় সং )।
শিবরতন মিত্র—Types of Early Bengali Prose, কলিকাতা, ১৯২২।
সুকুমার সেন—বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য, কলিকাতা, ১৩৪১ বাং।
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়—ভাষাপ্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ, কলিকাতা, ১৯৩৯।
সুশীলকুমার দে—History of Bengali Literature in the Nineteenth Century, কলিকাতা ১৯,৯।
হরিমোহন মুখোপাধ্যায়—বঙ্গভাষার লেখক, ১ম ভাগ, কলিকাতা ১৩১১ বাং

# কালানুক্রমণী

১৫৫৫ কুচবিহারের মহারাজা নরনারায়ণ আহোমরাজকে এক পত্র লেখেন।

১৬৭৩ (আঃ) দোম আন্তনিও (Dom Antonio) কর্তৃক 'ব্রাহ্মণ রোমান কাথলিক-সংবাদ' রচনা,

১৭৩৪ মনোএল দা আস্‌সুম্পসাঁও (Mauoel da Assumpcam) কর্তৃক 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' রচনা,

১৭৭৮ উইলকিন্‌স (C. Wilkins) সাহেব বাংলা ছাপার অক্ষর প্রস্তুত করান,

১৭৮৫ 'ইম্পে আইনে'র (Impev Code) মুদ্রণ,

১৭৯৩ 'কর্ণওয়ালিস আইনে'র (Cornwallis. Code) মুদ্রণ,

১৭৯৮ রামমোহন রায় কর্তৃক একেশ্বরবাদ সমর্থক পুস্তক প্রণয়ন,

১৭৯৯ শ্রীরামপুরে খ্রীষ্টান মিশন প্রতিষ্ঠা,

১৮০০ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপন ও বাংলার অধ্যাপক পদে কেরীর (William Carey) নিয়োগ,

১৮০১ রাম রাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' প্রকাশ,

১৮০২ মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'বত্রিশ সিংহাসন' প্রকাশ,

১৮১৫ রামমোহন রায়ের 'বেদান্ত গ্রন্থ' প্রকাশ,

১৮১৭ কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটি স্থাপন,

১৮১৮ মার্শম্যান (J. Marshman) সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশ,

১৮২১ রামমোহন রায় পরিচালিত সাপ্তাহিক 'সংবাদ কৌমুদী' প্রকাশ,

১৮৩১ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'সংবাদ প্রভাকর' প্রকাশ,

১৮৩৩ মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের নামে 'প্রবোধ চন্দ্রিকা' প্রকাশ,

১৮৩৯ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক 'তত্ত্ববোধিনী সভা' প্রতিষ্ঠা,

১৮৪০ গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য কৃত 'জ্ঞান প্রদীপ' ১ম খণ্ড প্রকাশ,

১৮৪৩ অক্ষয় কুমার দত্ত সম্পাদিত (মাসিক) 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রকাশ,

১৮৪৬ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত 'বিদ্যাকল্পদ্রুম' ১ম খণ্ড, প্রকাশ

১৮৪৭ ওয়েঙ্গার ( Wenger ) সম্পাদিত 'উপদেশক' প্রকাশ,

বিদ্যাসাগরের 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' প্রকাশ,

১৯৫১ রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' প্রকাশ,

১৮৫৩ তারাশঙ্কর তর্করত্নের 'কাদম্বরী' প্রকাশ,

১৮৫৪ বিদ্যাসাগরের 'শকুন্তলা' প্রকাশ,

'মাসিক পত্রিকা'য় প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলালে'র ক্রমশ প্রকাশ,

১৮৫৭ 'ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' ১ম ভাগ প্রকাশ,

১৮৬৫ প্যারীচাঁদ মিত্রের 'যৎকিঞ্চিৎ' প্রকাশ,

বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশ-নন্দিনী' প্রকাশ,

১৮৭১ প্যারীচাঁদ মিত্রের 'অভেদী' প্রকাশ,

১৮৭২ 'বঙ্গদর্শন' প্রতিষ্ঠা ও ঐ পত্রিকায় ক্রমশ 'বিষবৃক্ষ' প্রকাশ,

১৮৭৯ 'ভারতী' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র' ক্রমশ প্রকাশ,

১৮৯১ 'সাধনা' পত্রিকা প্রকাশ,

১৯০১ রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনে 'বঙ্গদর্শন' ( নব পর্য্যায ) প্রকাশ,

১৯১৪ চৌধুরীর সম্পাদিত 'সবুজপত্র' প্রকাশ।

## সংকেত-সমাধান

আঃ = আনুমানিক,

পৃঃ = পৃষ্ঠা,

প্রা, গ্র, = প্রাগুক্ত গ্রন্থ,

সং = সংস্করণ,

সাল = খ্রীষ্টীয় সংবৎসর,

বর্ষাঙ্কের পর সাল আদি লেখা না থাকলে তাকে খ্রীষ্টীয় সংবৎসর ব'লে বুঝতে হবে।

# বাংলা গদ্যের চার যুগ

## প্রথম অধ্যায়

### উপক্রমণিকা

বাংলা সাহিত্য যে এ দেশের বাইরেও সমাদর পেয়েছে এবং বিশ্বসাহিত্যে বাঙালীর দান যে সুস্পষ্টভাবে স্বীকৃত হয়েছে তার প্রধান কারণ ছন্দোবন্ধে রচিত বাংলা কাব্য, কিন্তু বাংলা গদ্য সাহিত্যও যথেষ্ট প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য। ভারতের কোনও প্রদেশের ভাষাতেই এমন প্রাচীন গদ্যগ্রন্থের সন্ধান মেলে না যাকে সাহিত্যের পর্যায়ে ফেলা যেতে পারে। এ সত্ত্বেও আধুনিক কালে বাঙালী যে চমৎকার গদ্যসাহিত্য সৃষ্টি করতে পেরেছে তার জন্যে সে যথেষ্ট সাধুবাদের দাবী রাখে। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের এ মুখ্য বিভাগটি নিতান্ত স্বল্পকালে ও স্বল্পায়াসে গড়ে ওঠে নি। প্রায় দেড়শ' বছরের চেষ্টার ফলে বাঙালী তার গদ্য সাহিত্যকে বর্তমান গৌরবময় আসনে বসাতে পেরেছে। এ সুদীর্ঘ সময় ধ'রে নানা বিচিত্র অবস্থার মধ্য দিয়ে নানা শ্রেণীর লিপিকুশল লেখকের সাধনায় সাহিত্যক্ষেত্রে অবজ্ঞাত গদ্য ধীরে ধীরে কেমন ক'রে সাহিত্য রচনার উপযোগী হয়ে উঠল, সেই বিস্ময়কর ইতিহাস জানার কৌতূহল স্বদেশপ্রেমিক ও বিদ্যাভিমানী বাঙালী মাত্রের পক্ষেই স্বাভাবিক। আর এ ইতিহাস না জানলে আধুনিক বাঙালীর সংস্কৃতি-প্রকর্ষের এক মুখ্যধারাই অনাবিষ্কৃত থেকে যাবে।

প্রত্যেক দেশের সাহিত্যেই গদ্যের খুব ব্যাপক প্রচলন হয়েছে অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে। যেমন ইংলণ্ডে ও জার্মানীতে গদ্যের প্রচলন

ষোড়শ শতাব্দী থেকেই বেড়ে চলেছে। তখন থেকে এ দুই দেশে গদ্য সাহিত্য যে এগিয়ে চলেছে, তার কারণগুলির অন্যতম হচ্ছে সে সময়ের কিছুকাল পূর্বে মুদ্রণ ব্যবস্থার প্রবর্তন। কিন্তু ১৭৭৮ সালে এদেশে যখন সর্বপ্রথম বাংলা পুস্তক ছাপার বন্দোবস্ত হয়েছিল তখন আমাদের সাহিত্যে গদ্যের প্রচলন বাড়া দূরের কথা, যাকে সাহিত্য বলা যায় এমন গদ্য রচনার আদর্শই ছিল না। বাংলা সাহিত্যের এ অভাব দূর হ'তে আরম্ভ হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিক থেকে। এ শতাব্দীর আগে পর্যন্ত এদেশে সাহিত্যের ক্ষেত্রে পদ্য ছিল অপ্রতিদ্বন্দ্বী। গানের উপর সাহিত্যকে নির্ভর করতে হ'ত ব'লেই তখন পদ্যের ছিল একচ্ছত্র প্রভাব। এখনকার মত প্রাচীন বাংলার লেখকেরাও মুখ্যত যশঃপ্রার্থী হয়েই বই লিখতেন। এই যশ আদায় করতে হ'লে আগে চাই গ্রন্থের বহুল প্রচার। কিন্তু প্রচারের জন্য তখন ছাপাখানা ছিল না। তাই লেখককে সুরের সাহায্য নেওয়ার কথা ভেবে রচনায় হাত দিতে হ'ত। কারণ সঙ্গীতের আবেদন সর্বজনীন। এই সুরে চড়াবার সুবিধার জন্যেই লেখকেরা বিষয়বস্তুকে চলনসই ছন্দে গেঁথে তুলতেন। আর এই প্রচারের সুবিধা হবে ব'লেই নানা সুপরিচিত লৌকিক দেবদেবীর মহিমা নিয়ে লেখা হ'ত তাঁদের কাব্য। কারণ কবি বা কাব্যের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ না থাকলেও কেবল দেবদেবীর কোপ এড়াবার জন্যে বা তাঁদের অনুগ্রহ-লাভের আশায় লোকে সুর-লয় সহকারে সংকীর্তিত ঐ কাব্য-কথা শুনতে বাধ্য হ'ত। প্রাচীন বাংলা-সাহিত্যের পদ্য-সর্বস্বতার এই হ'ল মোটামুটি কারণ। পদ্যবহুল সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাবও হয়ত এই কারণের অঙ্গীভূত। সে যাই হোক, বিবিধ গ্রন্থে নিরন্তর পদ্য ব্যবহারে লোকে এত অভ্যস্ত হয়েছিল যে, গদ্যকে কেউ সহজে সাহিত্যিকের কলমের উপযোগী ভাষা ব'লে ভাবতে পারে নি। সেই হেতু বাংলা গদ্য-সাহিত্যের নিদর্শন আদি যুগের রচনায় একেবারেই অলভ্য, কিন্তু তাই ব'লে সেকালে গদ্য সাহিত্যের অস্তিত্ব মোটেই ছিল না এমন অনুমান অসঙ্গত হবে। অবশ্য এ সাহিত্য প্রচারিত ছিল মুখে মুখে; আর এর আশ্রয় ছিল চিরচঞ্চল লোকস্মৃতির পরম্পরা। আমাদের পূর্বপুরুষদের পিতামহ এবং

পিতামহীগণ যে সকল গল্প ও উপকথা শুনে বালসুলভ আনন্দে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠতেন তাই ছিল সেই প্রাচীন যুগের গদ্য সাহিত্য। জাতির সাহিত্যিক রসবোধকে সজীব ও পরিপুষ্ট রাখতে এ শ্রেণীর রচনাও কম সাহায্য করে নি। কিন্তু নিতান্ত আধুনিক কালের আগে এ সাহিত্য পুঁথির পাতায় কদাচিৎ ধরা পড়েছে।

কিন্তু পূর্বোক্ত অবস্থা সত্ত্বেও আধুনিক কালের আগে যে এদেশে গদ্য লেখার প্রচলন একেবারেই ছিল না তা নয়। চিঠিপত্রে, হুকুমনামায় ও দলিল-দস্তাবেজে, সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মতত্ত্বে, চিকিৎসা ও দর্শনশাস্ত্রে এবং নাট্য ও কথকতার প্রসঙ্গে অল্পবিস্তর গদ্যের ব্যবহার ছিল। আধুনিক গদ্য সাহিত্য গড়ে ওঠার ব্যাপারে এ সকলের কোন প্রত্যক্ষ প্রভাব না থাকলেও, কেমন অবস্থার ভিতর দিয়ে বাংলা গদ্য ধীরে ধীরে তার সাহিত্যিক রূপটি নিয়েছে এগুলি সে সম্বন্ধে কিয়ৎপরিমাণে সাক্ষ্য দেয়। কাজেই আমাদের আধুনিক গদ্যের ক্রমবিকাশ সম্পর্কিত অনুসন্ধানের প্রারম্ভে প্রাচীন যুগের গদ্য সম্বন্ধে কিছু যথাসম্ভব কালানুক্রমিক আলোচনা প্রয়োজন।

বাংলা গদ্যের ক্রম-পরিণতির ইতিবৃত্ত আলোচনা করলে দেখা যায় যে, ঐ পরিণতি স্থূলত চারটি সুবিভাজ্য অংশে ঘটেছে এবং সেই চার অংশ, যে যে কাল জুড়ে বর্তমান ছিল সে সে কালপরিমাণকে বাংলা গদ্যের ইতিহাসের এক একটি যুগ ব'লে গণ্য করা যেতে পারে। যেমন, **(১) রামমোহন যুগ (১৮০১-১৮৪৩), (২) তত্ত্ববোধিনী যুগ (১৮৪৩-১৮৭২), (৩) বঙ্কিম যুগ (১৮৭২-১৮৯২)** এবং **রবীন্দ্র যুগ (১৮৯২—বর্তমান কাল)।**

ঊনবিংশ শতাব্দীর আগে বাংলা গদ্যে এমন কোন গ্রন্থ লেখা হয়নি যাকে নিঃসঙ্কোচে সাহিত্য বলা যেতে পারে। তবু তখন নানা ভাবে এ গদ্যের অস্তিত্ব ও ব্যবহার ছিল। বলা বাহুল্য, মুখের কথাতেই সে সময় ছিল বাংলা গদ্যের প্রধান আশ্রয়। কেবল জনসাধারণের দৈনন্দিন সংসারযাত্রার অপরিহার্য কথাবার্তা নয়, ভক্তমণ্ডলীতে পুরাণাদির কথকতায়, ব্রতকথায়, টোলে-চতুষ্পাঠীতে, বিদ্যার্থীসমাজে এবং চণ্ডী-

মণ্ডপের বৈঠকী আলোচনায়, শিশুগণের সান্ধ্যসভায় বিশেষভাবেই গদ্যের ব্যবহার হ'ত, কিন্তু তা সত্ত্বেও নানা প্রতিকূল কারণে উনবিংশ শতাব্দীর আগে বাংলা গদ্যে, সাহিত্য গ'ড়ে ওঠে নি। যাকে সাহিত্য বলা যেতে পারে বাংলা গদ্যে এমন পুস্তক রচনার শুরু যে এ শতাব্দীর প্রারম্ভেই হল তার পেছনে ছিল দুটি গুরুত্বপূর্ণ কারণঃ এক, **ইংরাজ শাসনের আরম্ভ**, আর **রামমোহন রায়ের অভ্যুদয়**। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বাংলা গদ্যের বর্তমান রূপটির সুনিশ্চিত ও সর্বপ্রথম সূচনা হয়েছিল রামমোহন রায়েরই হাতে। অতএব লৌকিক দৃষ্টিতে রামমোহনকেই আধুনিক বাংলা গদ্যের আদি প্রবর্তক বলা চলে। এই কারণেই গদ্যচর্চার প্রথম যুগের নাম দেওয়া যেতে পারে রামমোহন যুগ। এ যুগের আদি পর্বে বা **ফোর্ট উইলিয়ম পর্বে (১৮০১-১৮১৫)** যে সর্বপ্রথম মৌলিক গদ্য পুস্তক রচিত হয়েছিল তারও মূলে ছিল রামমোহনের প্রেরণা ও সাহায্য। এ সময়ে মোট তেরো খানি গদ্য পুস্তক প্রকাশিত হলেও তাদের মধ্যে সব কাজের উপযোগী গদ্যের আদর্শটি আবিষ্কৃত হয় নি এবং তা ছাড়াও অন্যান্য কারণে বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশের ব্যাপারে এ যুগপর্বের প্রভাব বেশি নয়। সে দিক দিয়ে দ্বিতীয় পর্বের বা **সংস্কার উদ্যোগ পর্বের (১৮১৫-১৮২৯)** রচনানিচয় বিশেষ ফলদায়ক হয়েছিল। এই সফলতার প্রথম ও প্রধান কারণ, মহামনা রামমোহনের অসামান্য ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভা।

১৮১৫ সাল থেকে ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত তাঁর পুস্তক ও পুস্তিকা সমূহ তাঁরই প্রবর্তিত প্রবল সংস্কার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাংলা গদ্যকে অত্যন্ত সার্থকভাবে প্রচার করেছিল। ১৮১৮ সালে প্রতিষ্ঠিত স্কুলবুক সোসাইটিও এদিকে রামমোহনের চেষ্টাকে প্রশংসনীয় রূপে সাহায্য করেছে। আর এরই প্রায় সমকালে প্রকাশিত বিবিধ সাময়িক পত্রও বাংলা গদ্যপ্রচারের বিশেষ আনুকূল্য করেছে। এ তিনটি ধারাতেই সে পর্বে সাহিত্যিক গদ্যের পরিপুষ্টির কাজ চলেছিল। এ কথা বলা বাহুল্য যে, শেষোক্ত দুটি প্রতিষ্ঠানই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রামমোহন প্রবর্তিত সংস্কার আন্দোলনের দ্বারা যথেষ্ট উপকৃত হয়েছিল

এবং মুখ্যত রামমোহনের রচনাদির মধ্য দিয়েই এ সময়ে বাংলা গদ্যের সেই মূলগত আদর্শ টি আবিষ্কৃত হয়েছিল যাকে আশ্রয় ক'রে আজকালকার সর্বকার্যের উপযোগী গদ্যরীতি ক্রমশ গ'ড়ে উঠতে পেরেছে। কিন্তু গদ্য-রীতির মূলগত আদর্শটি ধরা পড়লেও এ যুগপর্বে তার বাহ্যরূপটি সাহিত্য-রচনার পক্ষে তত উপযোগী হয়ে ওঠে নি। এই গদ্যের সাহায্যে নানা তথ্য-প্রচার কিয়ৎপরিমাণে সুসাধ্য হলেও কোনও প্রকারের রসসৃষ্টি এতে প্রায় অসম্ভব ছিল।

রামমোহন যুগের তৃতীয় পর্বে বা **সাময়িকপত্র পর্বের (১৮২৯-১৮৪৩)** শেষের দিকেই বাংলা গদ্যে ক্রমশ দেখা দিতে লাগল সাহিত্যের বাহন হওয়ার যোগ্যতার লক্ষণ। সাধারণের কৌতূহল ও জ্ঞানপিপাসা নিবারণ এবং ধর্মাদি আন্দোলনের সহায়তাদানের মধ্য দিয়ে সাময়িক-পত্রসমূহ বাংলা গদ্যকে সুপ্রচারিত করবার বিশেষ সাহায্য করেছে। সাময়িক পত্রের সঙ্গে সঙ্গে নানা তথ্য ও উপদেশপূর্ণ পুস্তক পুস্তিকাদিও এদিকে বহুল পরিমাণে কার্যকরী হযেছে। এরূপে নানা দিক দিয়ে গদ্যের প্রচার এবং প্রসার বৃদ্ধি হলেও, মনে হয় ১৮৪০ সালের বেশি আগে বাংলা গদ্যের মধ্যে উচ্চাঙ্গ রসসৃষ্টির অনুকূল রীতিক্রমের আবির্ভাব-চিহ্ন ভালোভাবে দেখা যায় নি। এই অবস্থার মধ্যেই হ'ল রামমোহনের পরম ভক্ত এবং অনুগামী দেবেন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমারের অভ্যুদয় এবং তৎপরে ঘটল **তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার** প্রতিষ্ঠা (১৮৪৩)। তখন থেকেই আরম্ভ হ'ল বাংলা গদ্যের দ্বিতীয় যুগ বা তত্ত্ববোধিনী যুগ। এ যুগের আদি পর্বের নাম **দেবেন্দ্র-অক্ষয় পর্ব (১৮৪৩-১৮৫৭)**। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিচালনায় এবং অক্ষয়কুমার দত্তের সম্পাদকতায় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা এ পর্বে বাংলা গদ্যকে মোটামুটিভাবে সাহিত্যের বাহন হওয়ায় মত রূপ দিল। একাজে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরও প্রচুর সহযোগিতা করেছেন এবং গদ্যকে সাহিত্যশিল্পের কাজে লাগাবার পথ বোধ হয় তিনিই দেখালেন সর্বপ্রথমে। সে যাই হোক্ তত্ত্ববোধিনী থেকে দেশের যে নানা উপকার হয়েছিল তার মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ইংরেজী-শিক্ষিতগণকে বাংলা গদ্যের চর্চায় এবং অধ্যয়নে প্রবর্তনা দান।

দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার ও বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় বাংলা গদ্য তার বর্তমান রূপটির প্রায় আটআনা পরিমাণ লাভ করেছিল। এমন সময়ে ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে কেউ কেউ বাংলা গদ্য লেখায় হাত দিলেন। তারি ফলে আরম্ভ হ'ল তত্ত্ববোধিনী যুগের দ্বিতীয় পর্ব বা **রাজেন্দ্রলাল প্যারীচাঁদ পর্ব** (১৮৫৭-১৮৭২)। এ পর্বের মুখ্য গদ্য লেখক রাজেন্দ্রলাল ও প্যারীচাঁদ মিত্র এবং ভূদেব মুখোপাধ্যায়। তত্ত্ববোধিনীর গদ্য এদের হাতে যে নূতনরূপে বিকশিত হ'ল তারই প্রভাবে সম্ভব হয়েছে বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্য। কিন্তু ১৮৭২ সালের আগে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর নিজস্ব রীতিটির উদ্ভাবন করতে পারেন নি। তাই সে সাল থেকে বা বঙ্গদর্শনের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে ধরা হবে বাংলা গদ্যে বঙ্কিমযুগের আরম্ভ।

বঙ্কিমযুগের মোটামুটি পর্ববিভাগ সম্ভবপর নয়। এ যুগের গদ্যের (উপন্যাসাদিতে ব্যবহৃত) অদ্বিতীয় স্রষ্টারূপে তিনি অপর সকল লোককে ফেলে রেখেছেন তাঁর অতিমানুষী প্রতিভা অন্তরালে। তাঁর যুগে তাঁরই রীতি স্বল্পবিস্তর বিভিন্নধারায় লেখক ও পাঠকদের মনোজগৎকে অধিকার ক'রে বিদ্যমান ছিল। সে সকল ধারার সঙ্গে তাঁর অনুবর্তীদের রচনাশৈলীর আলোচনা করলেই বুঝতে পারা যাবে সে কৃতিত্বের ব্যাপকতা ও গভীরত্ব। বঙ্কিমচন্দ্রের এই অসাধারণ প্রতিভার ফলে তাঁর যুগাবসানের পূর্বেই বর্তমান বাংলা সাহিত্যিক গদ্য তার প্রায় দশ আনা আন্দাজ রূপটি প্রাপ্ত হয়েছিল। তাঁর পরে বাংলা গদ্যে অতুলনীয় অভিনব শ্রী আনয়ন করলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর যুগের আদি পর্বে বা **সাধনা-বঙ্গদর্শন পর্বে** **(১৮৯২-১৯১৫)** তিনি সাধুভাষার গদ্যে বহুমুখী সৌন্দর্য এবং শক্তির সঞ্চার করেন। এই পর্বেই বাংলা গদ্য একটি প্রথমশ্রেণীর সাহিত্যের বাহন হওয়ার যোগ্যতা লাভ করল। এতে কোন প্রকার উচ্চাঙ্গের রস বা ভাব প্রকাশের বাধা বড় একটা রইল না। রবীন্দ্রযুগের দ্বিতীয় বা **সবুজপত্র পর্বে** (**১৯১৫—বর্তমান কাল**) চলতি ভাষাও ধীরে ধীরে সাহিত্যক্ষেত্রে তার যথাযোগ্য আসনটি লাভ করল। বলা বাহুল্য রবীন্দ্রনাথের লোকোত্তর সাহিত্য-সাধনার মধ্য দিয়েই ঘটল বাংলা

গন্থের সর্বোত্তম বিকাশ। এখানেই যে, বাংলা গদ্যের সমুদয় ভবিষ্যৎ সম্ভাব্যতার পরিসমাপ্তি ঘটল, এমন কথা মনে না ক'রেও বলা চলে যে, বাংলা গদ্য এখন যেখানে দাঁড়িয়েছে সেখান থেকে গদ্যসৌন্দর্যের কল্পিত শ্রেষ্ঠ আদর্শ অত্যন্ত দূরে নয়, যদিও এ দূরত্বকে কিয়দংশেও অতিক্রম করা কেবল বহুল আয়াসে এবং উচ্চশ্রেণীর প্রতিভার ফলেই সম্ভব। এখন থেকে গদ্য লেখকদের অন্যতম সাধনার বিষয় হবে এ দূরত্ব অতিক্রমের চেষ্টা। এ চেষ্টা শীঘ্র সফল হওয়ার সম্ভাবনা না থাকলেও এরই ফলে বহুকাল যাবৎ চল্‌বে বাংলা গদ্যের ভবিষ্যৎ অগ্রগতি, যতদিন না রবীন্দ্রনাথের মত কোন উচ্চশ্রেণীর গদ্যশিল্পীর আবির্ভাব ঘটে।

এই হ'ল বাংলা গদ্যের ক্রমোন্নতির ইতিহাসের একটা মোটামুটি রেখা-চিত্র। কিন্তু এ ইতিহাসকে সুস্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তোলার উপায় কি? বিগত সওয়াশ' বছরের উপর ধ'রে বহু ব্যক্তি ছোট-বড়ো নানারকমের গদ্য পুস্তক লিখে গেছেন। এঁদের মধ্যে যে-সকল লেখকের রচনাবলি দুষ্প্রাপ্য হয়ে ওঠেনি তাঁদের সকলের রীতি-কৌশল নিয়ে কালানুক্রমিক আলোচনা দূরের কথা, সুপ্রসিদ্ধ কয়েকজনকে বেছে নিয়ে ঐভাবে সে সকল প্রধান লেখকের রচনারীতির পুংখানুপুংখ বিচার করাও বিশেষ সুসাধ্য নয়। সাহিত্যের কোন ঐতিহাসিকই বোধ হয় এ পদ্ধতিতে কর্তব্য সম্পাদনে ব্রতী হতে পারেন না। নিজের দেশ-কালে কার কতখানি প্রভাব প্রতিপত্তি, বা কার লেখার বর্তমান মূল্যাদি কেমন সে সকল বিচার ক'রেই ঐতিহাসিক, আলোচ্য লেখকদের প্রতি মনোযোগের তারতম্য করেন। বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশের ইতিহাস আলোচনায়ও এ প্রণালী যথাযোগ্য পরিমাণে অনুসৃত হবে।

যুগের (বা যুগপর্বের) সঙ্গে যুগের (বা যুগপর্বের), বা লেখকের সঙ্গে লেখকের সম্বন্ধ আবিষ্কার করাই হ'ল গদ্যরচনার ঐতিহাসিকের কর্তব্য। কিন্তু এ কর্তব্য সম্পাদন অনায়াসসাধ্য নয়। যেহেতু আধুনিক বাংলা গদ্যের সমগ্র ইতিহাসকে যে চার যুগে (ও তাদের অন্তর্গত যুগপর্বে) বিভক্ত করা গেছে সেরূপ বিভাগ সূক্ষ্মদৃষ্টিতে সম্ভবপর নয়। কারণ এক যুগের

অবসানের আগেই ( নিতান্ত ক্ষীণভাবে হলেও তার পূর্ববর্তী ) যুগের সূচনা হয়ে থাকে, অথবা এক যুগ শুরু হলেই তার পূর্বযুগের অকস্মাৎ পরিসমাপ্তি ঘটে না। দৃষ্টান্তস্বরূপে উল্লেখ করা যায় যে তত্ত্ববোধিনী যুগের নিঃশেষ সমাপ্তির আগেই বঙ্কিমযুগের সূত্রপাত হয়েছিল, অথবা রবীন্দ্রযুগের আরম্ভ হওয়ার পরেও বঙ্কিম যুগের ঐকান্তিক অবসান ঘটেনি, একাধিক লেখক ( তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ শক্তিমান ) তখনো বঙ্গদর্শনের প্রদর্শিত রীতির অনুসরণে গদ্য রচনা ক'রে যাচ্ছিলেন এবং এখনো হয়ত সেই রীতির অনুরাগীদের সংখ্যা নগণ্য নয়। এ সকল দেখে কেউকেউ হয়ত বলবেন, যদি ইতিহাসের যুগবিভাগ এতই দুঃসাধ্য তবে সে চেষ্টা ক'রে লাভ কি ?

এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, সূক্ষ্মদৃষ্টিতে যুগবিভাগ প্রায় অসম্ভব হ'লেও এরূপ যুগ-কল্পনার ফলে সমগ্র ইতিহাসের গতিভঙ্গীটি অপেক্ষাকৃত সহজবোধ্য হয়। এজন্যেই, কি রাষ্ট্রীয় কি সামাজিক কি সাহিত্যিক বা অপর সর্ববিধ ইতিহাসের লেখকগণ যুগবিভাগ কল্পনা ক'রে বক্তব্য বিষয়কে পরিস্ফুট করবার চেষ্টা ক'রে থাকেন। বাংলা সাহিত্যিক গদ্যের ক্রমবিকাশের ধারাটিকে সুপরিব্যক্ত করতে গিয়ে সকল লেখকের রচনারীতি সম্বন্ধে যাবতীয় জ্ঞাতব্য তথ্যের পুংখানুপুংখ আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হবে। তবে যে সব লেখকের সমসাময়িক প্রভাব অত্যন্ত ব্যাপক মনে করা হয় তাঁদের প্রভাবের গুরুত্বকে বোঝাবার জন্যে এরূপ খুঁটিনাটি বিচারের দরকার হতে পারে। অন্যথায়, সকল ক্ষেত্রে এরূপ খুঁটিনাটির অনুসন্ধান করতে গেলে ইতিহাসের মূল সূত্রটি দুর্লক্ষ্য হয়ে উঠে বর্তমান গ্রন্থের উদ্দেশ্য নিষ্ফল হবার আশংকা আছে। যে খুঁটিনাটির কথা এখানে বলা হ'ল সে হচ্ছে গদ্যরীতির উৎকর্ষ বা অপকর্ষ সম্পর্কিত। রচনার ব্যাকরণগত প্রাচীনত্ব বা নবীনত্বের বিচারের সঙ্গে রীতির ক্রমবিকাশের ইতিহাসের সম্পর্ক অপরিহার্য নয়। ব্যাকরণগত প্রাচীনত্ব সত্বেও রচনা উপাদেয় হতে পারে, যদি তা না হ'ত, তবে বাংলা মধ্যযুগের সাহিত্য ( যেমন চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাসাদি ) এত সমাদর লাভ করত না। যেহেতু এগুলির ব্যাকরণের প্রাচীনত্ব খুবই সুস্পষ্ট।

কিন্তু কেবল কালানুক্রমিক লেখকদের রীতিসংস্পৃষ্টভাবে খুঁটিনাটির বিশ্লেষণ ক'রে সে সকলের উপর মন্তব্য ক'রে গেলেই গল্পরচনার ক্রমবিকাশের ইতিহাস সম্পূর্ণ হবে না। কারণ, বিশ্লেষণ একটা অল্পবিস্তর ভাবগত ( abstract ) ব্যাপার মাত্র। সঙ্গে সঙ্গে উদাহরণ না থাকলে সে গুলি সম্পূর্ণভাবে বোধগম্য না হওয়ার কথা। তাই বিশ্লেষণের সঙ্গে সঙ্গে যথাযোগ্য পরিমাণে দৃষ্টান্তের উল্লেখ থাকা প্রয়োজন। এরূপ করলেই তবে গল্পরচনার ক্রমবিকাশের ইতিহাস কথঞ্চিদ্‌ভাবে রচিত হতে পারে। উপস্থিত গ্রন্থে উপরের বর্ণিত পদ্ধতিই মোটামুটিভাবে অনুসৃত হবে।

# দ্বিতীয় অধ্যায়

## প্রাগ্‌-আধুনিক বাংলা গদ্য ( ১৫৫০—১৭৫০ )

বর্তমান কালের আগে লিখিত গদ্যের যে সকল নিদর্শন পাওয়া গেছে তাদের মধ্যে কুচবিহারের মহারাজার একখানি চিঠি সবচেয়ে প্রাচীন। ১৫৫৫ সালে ( ১৪৭৭ শক ) **মহারাজা নরনারায়ণ** এ পত্রখানি তাঁর সমসাময়িক অহোমরাজকে লেখেন। এর মাঝে মাঝে প্রাদেশিকতা থাকলেও বাংলা গদ্যের ইতিহাস সম্পর্কে এ চিঠিখানি অমূল্য। নিচে এর কিয়দংশ উদ্ধৃত করা যাচ্ছে :—

"এথা আমার কুশল। তোমার কুশল নিরন্তরে বাঞ্ছা করি। তখন তোমার আমার সন্তোষ সম্পাদক পত্রাপত্রি গতায়াত হইলে উভয়ানুকূল প্রীতির বীজ অঙ্কুরিত হইতে রহে। তোমার আমার কর্ত্তব্যে সে বর্দ্ধতাক পাই পুষ্পিত ফলিত হইবেক। আমরা সেই উদ্যোগত আছি।"

এ পত্রখানির ভাষা দেখে মনে হয় যে খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝিতে বাংলা সাধুভাষার গদ্য তার নিজস্ব রূপটি প্রাপ্ত হয়েছে। পরবর্তী শতাব্দীর চিঠিপত্রে ও দলিলাদিতে পারশী আরবী কথা দেখা গেলেও এ চিঠিখানায় সে সব কিছুই নেই। লেখক বঙ্গদেশস্থ তুর্ক প্রভাবের পরিমণ্ডল থেকে দূরে থাকার জন্যেই এ পত্রে বৈদেশিক শব্দের প্রবেশলাভ সম্ভব হয় নি, এমন কথা মনে করবার কারণ নেই। যেহেতু সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে ঢাকার নিকটবর্তী ভাওয়ালে লিখিত **দোম আন্তনিওর** ( Dom Antonio ) পুস্তকেও পারশী শব্দ একান্ত বিরল। অথচ ঢাকা তখন মুসলমান অধিকারের প্রায় কেন্দ্রস্থলে।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে পর্তুগালদেশীয় রোমান কাথলিক পাদরীগণ খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারের জন্যে বাংলায় প্রবেশ করেন। প্রচারের

সুবিধা হবে ব'লে তাঁদের মধ্যে **ফার্নান্দেজ** ( Francio Fernandez ) **ও সোসা** ( Dominic de Souza ) নামে দু'ব্যক্তি বাংলা ভাল ক'রে শিখেছিলেন। তাঁদের লেখা দুখানি চটি বইয়ের কথা জানা যায়। বই দুখানি সম্ভবত ১৫৯৯ সালে বা তার কিছু আগে রচিত হয়েছিল; কিন্তু এদের বাংলা বা রচনারীতি কেমন ছিল তা জানবার কোন উপায় নেই, যেহেতু কুত্রাপি এ দুখানি এ দুখানি বইয়ের সন্ধান মেলে নি। তবে এদের প্রবর্তিত রচনা-পদ্ধতি যে পরবর্তীকালের দোম আন্তনিও এবং **মনোএল দা আসুম্পসাও** ( Manoel da Assumpcam ) এর পুস্তকে কিয়দংশ অনুসৃত হয়েছিল এমন অনুমান অসঙ্গত না হতে পারে।

উল্লিখিত খ্রীষ্টানী গদ্য ছাড়াও উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে নানা প্রয়োজনে দেশের লোকে গদ্যের ব্যবহার করত। ব্যক্তিগত ও বৈষয়িক চিঠি পত্রাদিতে কেবল যে গদ্যেরই ব্যবহার হ'ত তা ভাববার যথেষ্ট কারণ আছে ব'লে মনে হয়, যেহেতু এরূপ প্রচুর-সংখ্যক চিঠিপত্র ও দলিল দস্তাবেজ আবিষ্কৃত হয়েছে। এ সকলের মধ্যে লক্ষণীয় কয়েকখানিকে বেছে নিয়ে তাদের ভাষার নমুনা এখানে উদ্ধার করব।

১৬৭২ সালে লিখিত একখানি দেববিগ্রহ চুরির অভিযোগ পত্রে আছে :—

> "শ্রীজসোমাধব ঠাকুর কুমড়াল গ্রামে দেবালয়ত আছিলা। রামসর্মা ভগীরথ সর্মা ও গয়রহ সেবকেরা আপনার ২ ওয়াদামামির সেবা করিতেছিল। রাত্রিদিন চৌকী দিতেছিল। শ্রীরামজীবন মৌলিক সেবার সরবরাহ পুরুসানুক্রমে করিতেছেন। ইহার মৈধ্যে পরগণা পরগণাতে দেওতা ও মুরূত তোড়িবার আহাদে···থাকিয়া পরোয়ানা লইয়া আর আর পরগণাতে দেওতা ও মুরূত তোড়িতে আসীল।

১। অপেক্ষাকৃত সহজে অর্থবোধ হ'তে পারবে মুখ্যত এই ভেবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ের উদ্ধৃতাংশ গুলির বানান স্থানে স্থানে পরিবর্তিত ক'রে দেওয়া হয়েছে এবং সে উদ্দেশ্যে নূতন বিরাম চিহ্নও দেওয়া হ'ল।

এ বার্তা শুনিয়া ঠাকুর ( ঠাকুর ) রামজীবন মৌলিকের বাড়ীতে বাহির বাড়ীতে আসিয়া রহিলা। রামসর্মা ও ভগীরথসর্মা ও গয়রহ ঠাকুরের সেবা ও চৌকীপহারা রাত্রিদিন নিযুক্ত আছিল। তাহারা পর ২৭ মহরম মাহে ১৮ জৈষ্ঠ ঠাকুর দেখিবার প্রাতেঃকালে সকল লোক গেল। ঠাকুর সেখানে না দেখিল। রামসর্মা ও ভগীরথসর্মা ও গয়রহ সেবা করিতেছিল। তারায় সেখানে নাহি। তদবধি রামজীবন মৌলিকের বাড়ীতে ঠাকুর ও রামসর্মা ও গয়রহ কেহো নাহি।"

এ দলিলখানিতে পারশী শব্দগুলির সন্নিবেশ বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার মত। এতে উপভাষার প্রয়োগ এবং পদ বিন্যাসের প্রাচীনত্ব থাকলেও এ দলিলের গদ্যকে মোটামুটিভাবে সরল বলা যায়। পারশী শব্দগুলির প্রয়োগ বাদ দিলে, এ ধরণের গদ্য সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে লিখিত নেপালে প্রাপ্ত নাটকের বাংলা অংশেও মেলে। নিচে তার দৃষ্টান্ত দেওয়া যাচ্ছে :—

"আহা মাতা, তুমার রাজা আমাকে ডাকিতেছিলো। তুমার রাজা সনে আমাকে কার্য না হয়। তুমার রাজা সনে বেদা ( = বিদা, বিদায় ) মাগিয়া আমী জাইবো। আহা মহারাজেশ্বর গোপীচন্দ্র, তুমি মায়া এড়িতে না পারো, তুমী উদনা পতুনার সঙ্গে সুখে রাজ্য করিয়া থাকো। তুমার সনে আমার কার্য না হয়।"

এর পরেই উল্লেখযোগ্য দোম আন্তনিও নামক বাঙালী খ্রীষ্টানের লেখা পুস্তক। ১৬৬৩ সালে মগেরা ভূষণার রাজকুমারকে বন্দী ক'রে আরাকানে নিয়ে যায়। তখন কোনও রোমান কাথলিক পাদরী টাকা দিয়ে তাঁর মুক্ত ক'রে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা এবং আন্তনিও এই নাম দিয়েছিলেন। তাঁর বই সম্ভবতঃ ১৬৭৫ সালের কিছু আগে রচিত হয়। এ বইতে একজন ব্রাহ্মণ ও একজন রোমান কাথলিকের কথাবার্তার মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টধর্মের উৎকর্ষ প্রমাণের চেষ্টা করা হয়েছে। এর কিছু নমুনা নিচে দেওয়া হ'ল :—

"কতবার পরমেশর সাকার ধরিয়াছিলেন, তোমরা কহ।" "কেবল একবার, নরমুক্তি কারণ।" "কোন দেশে জন্মিয়াছিলেন ?" কার ঘরে ? কার গর্ভে ? কোন দিনে ?" "নাজারে, বেলেমতে, স্থানে,

কূলে সিধা জোসেফ ঘরে, নির্মল অকুমারী জিতেন্দ্রিও মারিয়ার গর্ভে জন্মিয়াছিলেন সম্পূর্ণ দয়াময় ক্রেপাতে পরমো আত্যাম (=আত্মা) সমেতে পরমেশর।" "কত বছর শরীরধারী হইয়াছিলেন প্রথিবীতে? কি কাজ করিলেন? কেন আসিয়াছিলেন? শেষে কোথাএ গেলেন?" "তেতিশ বছর প্রথিবীতে ছিলেন। উত্তম কাজা করিয়া ছিলেন। নরমুক্তি করিতে আসিয়া ছিলেন, শেষে পরমো স্বর্গে শরীর সমেত গেলেন…"

উদ্ধৃতাংশের রচনায় তৎকালে প্রচলিত সাধুভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। এতে পারশী আরবী শব্দের অভাবও বিশেষ লক্ষণীয়। কিন্তু শব্দপ্রয়োগের বিশুদ্ধি সত্ত্বেও আন্তনিওর পুস্তকে খুব স্বল্প পরিমাণে পূর্ববঙ্গের উপভাষার প্রভাব বিদ্যমান। যেমন 'এই নি উচিত' (=এই কি উচিত)?

**রামাই পণ্ডিত** কর্তৃক পদ্যে রচিত 'শূ ন্য পু রা ণে'র স্থানে স্থানে গদ্য লক্ষণাক্রান্ত রচনা পাওয়া যায়। কোন কোন লেখক এ বইখানিকে ত্রয়োদশ শতকের পূর্ববর্তী কালের মনে করলেও একে সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের দিকে ফেলাই উচিত মনে হয়। পদ্যের সঙ্গে গ্রথিত এই গদ্যাংশগুলি অনেকটা পদ্যধর্মাক্রান্ত, এবং হয়ত এগুলিও পদ্যাংশের মত সুরলয় সহকারে গান করা হ'ত। এর কিছু নমুনা নিচে উদ্ধার করা গেল :—

"……সচল অচল সৃষ্টি সৃজিলেন গোসাঞি ভকত-বৎসল। সুবর্ণের কোদাল রূপার বাঁট। মহাদেব কুদালেন স্বর্গ মর্ত পাতাল। জটার কুলে পেলেন নীর। সে নীর লইয়া দসমন্ত গতি বাথানি। ব্রহ্মা হইলেন পণ্ডিত। বিষ্ণু হইলেন কম্মি। মহাদেব মেলি করেন জলপাবন। মূলপাবন স্থলপাবন গোষ্ঠীপাবন……। কায়াপাবন মুণ্ডপাবন ধড়পাবন। সুবন্নর পুস্কণি রূপার ঘাট। এই ফুল জলে স্নান করেন শ্রীদেব করতার। আদ্দপতি অনাদ্দপতি করিব সার। এহি সুদ্ধপাটে ধর্মের আগুসার। অস্‌সথ বেল পলাস মোউলর পাত। মিনল করেন পরভু তিদসর নাথ।"

'শূন্যপুরাণে'র গদ্যের নমুনা দেখে মনে হয় যে, প্রায় সপ্তদশ শতকের

শেষভাগে লেখকদের সৃষ্টি পদ্য থেকে ধীরে ধীরে গদ্যের দিকে যাচ্ছিল। কিন্তু এ অভিনব গদ্যরীতি পরবর্তীকালে অনুসৃত হয়েছিল কি না তার কোন প্রমাণ মেলে না।

**চণ্ডীদাসের** উপর আরোপিত 'চৈ ত্য রূপ প্রা প্তি' এবং **নরোত্তম ঠাকুরের** ব'লে পরিচিত 'দে হ-ক ড় চা' নামক গ্রন্থদ্বয়ও হয়ত সপ্তদশ শতাব্দের শেষপাদের কিঞ্চিৎ পূর্বে রচিত। চৈত্যরূপ প্রাপ্তির'র গদ্যরচনা খুবই অমসৃণ। হেঁয়ালিমূলক ভাষাতে সাধনতত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লেখক যে, গদ্যকে অদ্ভুত ক'রে তুলেছেন তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই। 'দেহকড়চা'র গদ্যও নিতান্ত সাধাসিধে। এতে সাহিত্যের গন্ধও একান্ত অনুপস্থিত। এর কিঞ্চিৎ নমুনা নিচে দেওয়া হ'ল :—

> "অথ আপ্ত জিজ্ঞাসা। তুমি কে? আমি জীব। তুমি কোন জীব? আমি তটস্থ জীব। থাক কোথা? ভাণ্ডে। ভাণ্ড কীরূপে হইল? তত্ত্ববস্তু হৈতে। তত্ত্ববস্তু কি কি? পঞ্চভূত আত্মা, একাদশ ইন্দ্রিয ছয় রিপু ইচ্ছা এই সকল একযোগে ভাণ্ড হৈল। পঞ্চভূত আত্মা কাকে বলি? পৃথিবী আপ তেজঃ বায়ু আকাশ। একাদশ ইন্দ্রিয় কে কে? কর্ম ইন্দ্রিয় পাঁচ। জ্ঞান ইন্দ্রিয় পাঁচ। আর মন এই একাদশ ইন্দ্রিয়।"

সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত সহজিয়া সম্প্রদায়ের গদ্য গ্রন্থগুলির ভাষাও অনেকটা এই 'দেহকড়চার' গদ্যেরই মত।

এ সকল পুস্তকের পরেই উল্লেখযোগ্য ১৭০৮ সালে শ্রীহট্টের ফৌজদারকে লিখিত একখানি পত্র। এর কিয়দংশ নিচে উদ্ধৃত হ'ল :—

> "তোমার পত্র সমাচার পহুছিল। তাহার (?) শুনিয়া পরম প্রসন্ন হৈলাম। আর তোমার পিতা সমেতে পূর্বপ্রীতি স্মরিয়া এই ক্রমে অধিক প্রীতি হৈবে হেন যে লিখিছা এ বিশেষ, কিন্তু পরস্পর যেমতে প্রীতি হয় তেমন করিবা। জয়ন্তা ও কাছারিও আমার ঠাই নিমক-হারাম করিলেক। তার কারণ ঈশ্বরে তারে যে অবস্থা করিলেন্ তাহাক তুমি দেখিয়াছ। অতএব তোমার মাঝে বিগড়ি নয় সেই করিবা।"

এই সংস্কৃত বহুল রীতিতে লেখা পত্রের সঙ্গে তুলনার জন্য ১৭০৭ সালে লিখিত একখানি পারশীবহুল হুকুমনামার কিয়দংশ নিচে দেওয়া গেল :—

"আগে তরফ খএরাত সেখ আবদুল্লার ও সেখ আবদুল মোমেন সাং দুর্গাপুর আরজ হইলা জাহির করিলেন জে পরগণা খটঙ্গা দুর্গাপুরে খএরাত জমী সালি দষ বিঘা পাই ভোগ করিতেছি সনন্দ রাখি। সীকদার সনন্দ তলব করে। যে হুকুম হয়। তাহার আরজ মুনিঞা হুকুম করিল—সনন্দ তহকীব করহ। জদি মো° স নন্দ ভোগ প্রমাণ খএরাত মনযুর রাখিল, সনন্দ করিয়া দেহ…।"

১৭১৯ সালে লিখিত একখানি মনুষ্যবিক্রয় পত্রের গদ্য এই দলিলের চেয়ে পারশীবহুল। ইহার কিছু অংশ নিচে উদ্ধার করা হ'ল :—

"আমি আপনা খুসরজ ও রসবাত পুরাকত আকাম বিনা ওজর ইতবারে তোমার পান হনে বেআজি তিন রুপায়া লৈয়া, আমার বেটি যার উমর এগার বরিস তুমার স্থানে আকির খাস করিয়া দিলাম। লআজীমা খুরাক পুষাক খাইয়া পীন্দিয়া মুদ্দত সর্ত্তের বরস খেদমত আবকসী তুমাহর করিব।

১৬১৯ সালের লেখা একখানি জয়পত্রের ভাষা সংস্কৃতবহুল হলেও একেবারে পারশীবর্জিত নয়। তার একাংশ নিচে দেওয়া যাচ্ছে :—

"তাহাতে শ্রীশ্রী৺আচার্য প্রভুর সন্তান শ্রীশ্রী৺রাধামোহন ঠাকুরকে পরাভব করিতে পারিলেক তা, অতএব শ্রীদিগবিজয় ভট্টাচার্য পরাভব হইয়া অজয়পত্র লিখিয়া ঠাকুরের স্থানে শীষ্য হইয়া পরকীয়া ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেক এবং দস্তখত পরকীয়ায় ধর্ম্মের পর করিয়া দেসকে গেলেন। এথানে জে সকল সাস্ত গ্রেন্থ লইয়া বিচার হইল সেই সাস্ত ( লইয়া ) শ্রীদিগবিজয় শ্রীযুত মহারাজার নিকট গেলেন। পুন পুন সভা শ্রীযুত রাজার সভাসতে বিচার হইল। বিচায়ে পরকীয়া ধর্ম্ম মোক্ষ হইল।

১৭২৮ সালে একটি আত্মবিক্রয় পত্রের ভাষাও এই দলিলের ভাষার সঙ্গে তুলনীয়। নিচে তার অংশবিশেষ উদ্ধৃত হ'ল :—

"আমরা সপরিবারে অন্নরিণ উপহতি ক্রেমে নগদ মূল্য তোমার স্থানে এগার রূপাইযা পাইযা স্বইচ্ছা পূর্ব্বক আপ্তবিক্রি হইলাম তোমার পুত্র পৌত্র আদি ক্রেমে আমার পুত্র পৌত্র আদি ক্রেমে গোলামি করিব, এহি করারে আপ্তবিক্রয পত্র দিলাম।"

এ সকল দলিলপত্রের পরে ১৭৩৪ সালে রচিত হযেছিল 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ।' মানোএল দা আস্সুম্পসাওঁ নামে জনৈক পোর্তুগীজ পাদরী খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের জন্য এ বই লিখেছিলেন। ১৪৩৪ সলে বইখানি লিসবন নগরে রোমান বা তথাকথিত ইংরেজী অক্ষরে ছাপা হয়। এ বইতে প্রশ্নোত্তরের মধ্য দিযে রোমান কাথলিক ধর্মের তত্ত্ব ও অনুষ্ঠান পদ্ধতি বিবৃত করা হযেছে। পূর্ববঙ্গের যে স্থানে পোর্তুগীজ পাদরীরা তাঁদের প্রচারের কেন্দ্র করেছিলেন বইখানিতে সেই অঞ্চলের ( ঢাকার ) উপভাষার প্রভাব বিদ্যমান। এছাড়া ততে পারশী শব্দের ব্যবহারও বেশ সুলভ। এ দুটি ব্যাপার ছাড়া আস্সুম্পসাওঁর ভাষা আন্তনিওর ভাষার চেযে বিশেষ ভিন্ন প্রকারের নয। তবে স্থানে স্থানে বিদেশী লেখকেব নিজ মাতৃভাষার প্রভাব হযত একটু আধটু পড়েছে। নিচে এই পুস্তক থেকে কিছু অংশ উদ্ধার করা হ'ল ঃ—

"সিদ্ধা পালাদিও বনের মৈধে বসত করিতেন। সেই বনের নজদিক এক শহর আছিল। সেই শহরে অনেক বেপারী বেপার করিত। একদিত একটা বেপারী জিনিষ কিনিযা আপনের দেশে যাইতে চাহিত। আর বেপারীর ঠায কহিত এহি দেশে অনেক ডাকাইত আছে, এ কারণ আমারে বিদাএ দিও। আমি রাইত্রে থাকিতে জাইব। * * দুই পহর রাইত্রে বেপারীএ মেলা করিল বনের মৈধে ডাকাইতে তাহার লাগাল পাইল। পালাদিওর ঘরের কাছে তাহারে ধরিযা বধিল। জিনিষ ডাকাতি করিয়া নিল। এবং মরা শরীর পালাদিএর বাড়ীতে ফালাইআ দিল। তাহার পরে হাকিমের স্থানে আরজ করিল। কহিল, ঠাকুর, দোহাই পাতশাহের, যদি তুমি তজবিজ না কর। পালাদিও যে সাধু সে ডাকাইত হইল, এক বেপারীকে বধিল।"

আস্‌সুম্পসাঁওর রচনার পরেই উল্লেখযোগ্য ১৭৪৯ সালে লিখিত **মহারাজ নন্দকুমারের** একখানি পত্র। সরল সাধুভাষায় রচিত হলেও এর স্থানে স্থানে পারশীর প্রক্ষেপ আছে। চিঠিখানির রচনা বেশ প্রাঞ্জল। নিচে এর কিয়দংশ উদ্ধার করা গেল :—

"তোমার মঙ্গল সর্বদা শ্রীশ্রী৺ স্থানে প্রার্থনা করিতেছি। তাহাতে প্রাণরক্ষা পাইতেছে। পরং সকল সমাচার শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ মজুমদার দ্বারায় পূর্বপত্রে লিখিয়াছি। তাহাতে জ্ঞাত হইয়া থাকিবে অদ্য চারি রোজ এথা পৌঁছিয়াছি। ইহার মধ্যে একটি অন্ন যদি দেখিয়া থাকি তবে সে অভক্ষ্য। মুখপ্রক্ষালনাদি কিছুই করিতে পারি নাই। নাসাগ্রে প্রাণ হইল। ফজীহৎ যত যত পাইলাম তাহা কত লিখিব। তবে প্রাণধারণ করিয়া আছি সে কেবল তোমার রোকা খোসবাগে পাইয়া ছিলাম, সেই ক্রমে জীবিত আছি। সংপ্রতি যদি আমার প্রাণ রক্ষা করার ইচ্ছা থাকে তবে এই পত্র পাঠ করিবামাত্র শ্রীসূর্যনারায়ণ মজুমদারের নিকট তুমি এবং…সকলে যাইয়া…তাহার লিখন করিয়া পাঠাইবা…তবে যে আমার প্রাণ বাঁচিতে পারে নতুবা ব্যাজ হইলে এ জন্মের মত বিদায় গ্রহণ হইলাম ইহা নিশ্চয় জানিবা।"

উপরে উদ্ধৃত চিঠির ভাষায় পারশী শব্দের ব্যবহার থাকলেও সেকালের গদ্য হিসাবে একে নিন্দনীয় বলা চলে না। আনুমানিক ১৭৫০ অব্দের কিছু আগে সংস্কৃতমূলক সাধুভাষায় রচিত 'জ্ঞা ন মা র্জ নী গ্রন্থ' নামক বৈষ্ণব সাধনতত্ত্বের পুস্তকে যে গদ্যের নমুনা পাওয়া যায়, তা এর মত সুন্দর নয়। বইখানি শ্রীযুক্ত **সুধীর কুমার সেন** এম, এ, মহাশয়ের সৌজন্যে পাওয়া গিয়েছে। নিচে এর কিছু নমুনা দেওয়া গেল :—

"শ্রীগুরু শিষ্যকে কৃপা করিয়া দেহের মধ্যে পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত সহিত আত্মা চৈতন্য রূপ ঈশ্বরকে প্রতক্ষ্য দেখাইয়া তত্ত্বজ্ঞান জন্মাইয়া পরে নিত্য বৃন্দাবনে** শ্রীরাধাকৃষ্ণকে প্রত্যক্ষ দেখাইয়া পরে শিষ্যেরে অগ্যান দুর হইয়া গ্যান জন্মাইয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণাদিকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াছে

কি, না দেখিয়াছে তাহার জিবার ( —জানিবার ? ) কারন জিগ্যাসেন, তোমার নাম কি। শিষ্যে কহেন আমি শ্রীগুরুর দাস। শ্রীগুরু জিগ্যাসেন, তোমার শ্রীগুরু কে তাহা কহ। শিষ্যে কহেন, আমার শ্রীগুরু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু। শ্রীগুরু জিগ্যাসেন, তোমার শ্রীগুরু তোমাকে কি দেখাইয়া ( শুনা ) ইয়া তোমার শ্রীগুরু হইয়াছেন তাহা কহ।''

উল্লিখিত স্থানটিতে বাক্যগ্রন্থনের দোষে যে শ্রুতিকটুতা জন্মেছে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমপাদের রচনায়ও সে শ্রেণীর ত্রুটি কদাচিৎ দেখা যেত। কিন্তু মনে হয় যে অষ্টাদশ শতাব্দের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বাংলা গদ্যের প্রকৃতি কিয়ৎপরিমাণে শোভা ও সৌষ্ঠবের দিকে চলতে শুরু করেছিল।

## তৃতীয় অধ্যায়

### প্রাগ্‌-আধুনিক বাংলা গদ্য ( ১৭৫০—১৯০১ )

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে লেখা একখানি দানপত্রের ভাষায় আরবী পারশী শব্দ থাকলেও তাতে প্রাঞ্জলতার অভাব নেই। এখানি নিচে দেওয়া গেল।

"আমার সন্তানরহিত। তুমি কন্যা, আর কেহ ক্রীয়া আদি আমার করে এমত নাই এই ক্ষণ। ক্রীযাকর্ত্তা তুমি, একারণ আমী স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আপন ভদ্রাসন ও জমী ও পুষ্করিণি সাকিম তপশীল মবলগে আঠান্ন বিঘা—ব্রহ্মত্তর পৈত্রীক ও স্বোপার্জ্জিত—ও শিস্ত-সেবক জেখানে জে আছে তাহা সমস্ত নিত্যকৃত্য তোমাকে দিলাম। জে তক জীবিত থাকিব তদবধী আমার ও আমার স্ত্রীর সেবা ও শুশ্রুষা আদি করিতেছ, করিয়া ধর্ম্ম কর্ম্ম জথাজোগ্‌গ করাইবা। অন্তেষ্টি ক্রীয়া আদি করিয়া সাকিম তপশীল জমি আবাদ তবদ্দুদ করিয়া ও শিস্যসেবক বহাল রাখিয়া পুত্র পৌত্রাদিক্রমে পরমসুখে ভোগ দখল করিয়া ইহার দান বিক্রয়ের সত্তাধিকার তোমার। আমী কিম্বা আর কেহ দাওয়া করে সে ঝুটা ও বাতিল। এতদর্থে দানত্তর দিল।"

উপরে অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা গদ্যের যে নানা শ্রেণীর নমুনা দেওয়া হ'ল তা ছাড়াও দুই শ্রেণীর গদ্য প্রচলিত ছিল। এক, গল্প উপকথার ভাষা, আর গৌড়ীয় বৈষ্ণব ও সহজিয়াদের সাধনপদ্ধতি সম্বন্ধে রচিত কোন কোন পুস্তকের ভাষা। গল্প ও রূপকথার প্রাচীন লিখিত রূপ খুব কদাচিৎ দেখতে পাওয়া যায়। কেবল 'ব্রিটিশ মিউজিয়মে'র বাংলা কাগজপত্রের মধ্যে এরূপ একটি গল্প আবিষ্কৃত হয়েছে। এ আবিষ্কারের জন্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত **সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়** মহাশয় ধন্যবাদার্হ। খুব সরল ভাষায় রচিত এ গল্পটির কিয়দংশ নিচে উদ্ধার করা গেল :—।

"একদেশে এক সওদাগর ছীল। সে বাণিজ্যতে গিয়াছীল। পরে তাহার জাহাজ ও নৌকা সকল ডুবিয়া গেল। একখানা তক্ত

ধরিয়া সওদাগর কীনারায় উঠিল। সেই দেশে এক মাযে (=মেয়ে) মানুষ জল আনিতে আসিয়াছিল। সে সওদাগরকে লইয়া আপনার বাটীতে গেল। বিস্তর সেবা করিয়া সওদাগরকে বাঁচাইলেক। কতক দিন তাকাদী সেইখানে থাকীল। পরে একদিন এক মালির মায়ে (=মেয়ে) বড় জাদুগীর। তার সঙ্গে আর সওদাগরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। সে মালিনী এক ঔসধ সওদাগরের গায়ে ফেলিয়া মারিলেক। সে ঔসধ তার গায়ে লাগিতে ভেড়া হইল।** রাত্রে এক ঔসধ গায়ে ছোঁয়াইয়া মানুষ করে, দিনে আরবার ভেড়া করে।"

গল্পাংশটি প্রায়শ ছোট ছোট সরল বাক্যে পরিপূর্ণ ব'লে এর ভঙ্গীর মধ্যে এমন একটু হাল্কাভাব আছে যা পূর্বোল্লিখিত দলিল দস্তাবেজ বা চিঠি পত্রাদির ভাষায় খুব বিরল। বৈষ্ণবদের তত্ত্ব বা সাধন পদ্ধতি সম্বন্ধীয় কোন কোন গ্রন্থের ভাষা অনেকটা এরকমের হাল্কা। নিচে এর একটি নমুনা উদ্ধার করা যাচ্ছে :—

ঈশ্বরের শক্তি সত্ত্বরজস্তম। তিনে এক হয়্যা থাকে। মানুষের আচার ব্যবহার ছাড়িলে ঈশ্বর ছাড়া হয়। তবে ঈশ্বর মানুষের আশ্রয় কয়। ঈশ্বর সে মানুষের বশ। ইহা কেহো নাই জানে। 'মানুষ ঈশ্বরতনু জানে সর্ব্বজনে।' মানুষ ঈশ্বর ছাড়া হয় এইরূপে কহি যে শুন। তাহার প্রমাণ গোপীজন যান তৈল হরিদ্রা মাখিয়া যমুনাতে স্নান করে যেন। গোপী আর সখী যেন তাতে অঙ্গের মলা যায় ক্ষয়। তেমতি সে গতাগতি হইয়া থাকে। সদাই প্রকট সে। কেহ নাই দেখে।

এ নমুনার ভাষার চেয়ে গুরু গম্ভীর সাধু ভাষা সহজিয়াদের লেখার মধ্যে আছে। নিচে ১৭৫০ সালে লিখিত কোন পুঁথি থেকে তার খানিক উদ্ধার করা গেল :—

"যখন মনের সহিত কর্ণাদি জ্ঞান ইন্দ্রিয়ের যোগ হয় তখন আকাশ ভূতের শব্দগুণ জ্ঞান করেন। অতএব কর্ণ জ্ঞান-ইন্দ্রিয়ে পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে জ্ঞান করিতে পারে না এবং যখন মনের সহিত চর্ম্ম জ্ঞান ইন্দ্রিয়ের যোগ হএ তখন বায়ু ভূতের স্পর্শগুণ

জ্ঞান করেন। অতএব চর্ম্ম জ্ঞান-ইন্দ্রিয়ের পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে জ্ঞান করিতে পারে না। *** অতএব বুঝিলাম আমি অজ্ঞানী, আমার ঠাঞী ঈশ্বর মিথ্যা। আরবার সাধু জিজ্ঞাসেন যে জন মাতার গর্ভ হইতে জন্মিয়া কর্ণে শুনে না ঐ জন পঁচিশ বৎসর বড় হইয়াছে, কোন কালেহ কর্ণে শুনে না সেই জনে কোন দিন ক খ গ ঘ ঙ ইত্যাদি পঠন করিতে পারে কি না এবং সেইজনে পিতা মাতা করিয়া ডাকিতে পারে কি না তাহা কহ। আর জিজ্ঞাসি জন্মঅন্ধ জনে নবীন নীরদবর্ণ শ্রীকৃষ্ণের শরীরের রূপ চিন্তা করিতে পারে কিনা তাহা কহ।"

আনুমানিক ১৭৭৫ সালে লিখিত, 'ভা ষা প রি চ্ছে দ' নামক সংস্কৃত দার্শনিক গ্রন্থের অনুবাদে যে গদ্য ব্যবহৃত হয়েছে সেটি তৎকালীন সাধু ভাষার এক উত্তম দৃষ্টান্ত। নিচে তার কিয়দংশ উদ্ধৃত করা যাচ্ছে :—

"* * * ব্যাপারবৎ কারণের নাম করণ। কারণজন্য হইয়া কার্য্যজনক যে হয় তাহার নাম ব্যাপার। * * অনুমিতির অপর কারণ পক্ষতা আছে। ইহাতে প্রাচীন পণ্ডিতেরা কহেন পর্ব্বতে বহ্নি সন্দেহের নাম পক্ষতা। একথা ভালো নহে, কারণ যে হয় সে অবশ্য কার্য্যের অব্যবহিত পূর্ব্বে ক্ষণেতে থাকে। প্রথম ক্ষণে সাধ্য সংশয়, পরে ব্যাপ্তির স্মৃতি, পরে পরামর্শ। তবে পরামর্শকালে সংশয় নষ্ট হইলে অনুমিতির পূর্ব্বক্ষণ পরামর্শক্ষণ, সে ক্ষণে সংশয় থাকিল না।"

পূর্বোল্লিখিত প্রাচীন গদ্যের নিদর্শনগুলিতে আর যে কোন গুণই থাক, তাদের মধ্যে সাহিত্যিক ভঙ্গী একান্ত দুর্লভ। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের পূর্ব পর্যন্ত রচিত সকল গদ্য সম্বন্ধেই হয়ত একথা বলা যেতে পারে; কিন্তু খুব সম্ভব এই শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে এ দৈন্য দূর হ'তে থাকে। আনুমানিক এ সময়ের কাছাকাছিতে লেখা একখানি কথকতার পুঁথিতে যুদ্ধোত্তম বর্ণনায় আছে :—

"* * ভোগবান ভগবান যোগবান লক্ষ্মীবান বিদ্যাবান সত্যবান

দয়াবান এবম্ভূত রাজার প্রতাপে সপ্তসাগর পর্য্যন্ত আন্দোলায়মানা। অতি চমৎকৃত গাঢ় পরিপূর্ণ রঙ্গ ধুলি অঙ্গে লেপনকে করে বাহু আস্ফালনেতে পর্ব্বত সকল চূর্ণায়মান করিতেছেন। পশ্চাতে ঢালি সকলেতে লম্ফঝম্ফ খড়্গাবলম্বন পূর্ব্বক মার মার শব্দ উচ্চারণ ক'রে গমনকে করিতেছেন ও খড়্গি চর্ম্মি রক্ষি রথা শূলি ত্রিসূলী ধারি পুরবর্ত্তি নানা অস্ত্র ধারণকে করে সৈন্য সকল গমন করিতেছেন।"

এ বর্ণনায় যে আড়ম্বরপূর্ণ সাধুভাষা ব্যবহৃত হয়েছে, তাকে কিয়দংশে পরবর্তী সংস্কৃতপন্থী পণ্ডিতী ভাষার আদর্শস্থল বলা যেতে পারে। এই কথকতার পুঁথির সমকালে বা কিঞ্চিৎ পরে রচিত 'আ ন ন্দ ল হ রী'র বঙ্গানুবাদেও এ শ্রেণীর সাধুভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। নিচে তার কিছু নমুনা উদ্ধার করা গেল :—

"হে জননী ত্রিপুরসুন্দরী, শিব (পুরুষ) যদি শক্তিযুক্ত হন তবে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করিতে পারেন ও নতুবা নড়িতে পারেন না। অতএব হরিহর ব্রহ্মা প্রভৃতির আরাধনীয় যে তুমি, তোমাকে প্রণাম করিতে বা স্তব করিতে পুণ্যহীন জন কি প্রকারে যোগ্য হইবেন। * * * *

হে মাত, কবে তোমার চরণারবিন্দের জল পান করিব তাহা আজ্ঞা কর। সে চরণক্ষালন জল কেমন অনন্তরসযুক্ত রক্তবর্ণ, বাণী যে সরস্বতী তিনি অজ্ঞানদিগের পণ্ডিত করিবার কারণ, নিজ মুখকমলের তাম্বুলরসছলে জে চরণ-ক্ষালন জল গ্রহণ করিতেছেন।"

বাংলা গদ্যের উল্লিখিত নিদর্শনগুলির সঙ্গে নাম করা যেতে পারে 'বৃ ন্দা ব ন লী লা' নামক গ্রন্থের। এ পুস্তক সম্ভবত অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে রচিত। বৃন্দাবনধামের নানা কুঞ্জ ও মন্দিরাদির বর্ণনা ক'রে জনৈক ভক্ত বৈষ্ণব এ গ্রন্থ লিখেছেন। অন্য সাহিত্যিক গুণ না থাকলেও এ গদ্য বর্ণনাকার্যের খুব অনুপযোগী হয় নি। এতে সমাসবিরল শব্দসমূহ যেমন মানানসই ভাবে বিন্যস্ত, এবং ছোটবড় বাক্যগুলি যেমন যথাযোগ্য ভাবে ব্যবহৃত, তাতে এর রচনায় বেশ একটা সুসঙ্গতির আভাস ফুটে উঠেছে। নিচে এর কিয়দংশ উদ্ধৃত করা গেল :—

"***শ্রীশ্রীবৃন্দাবনে শ্রীশ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ মদনমোহন**** গোপীজনবল্লভ এবং অনেক অনেক বিগ্রহ আছেন অসংখ্য, সংখ্যা কে করিবেক। প্রতি ব্রজবাসীর ঘরে ঘরে সেবা, অসংখ্য আছেন অতিথি, কেহ চুটকি করেন, কেহ মাধুকরি, বিরক্ত ঠাকুরেরা ব্রহ্ম-কুণ্ডে কেশি ঘাটে পুলিন বটে * * * এবং আর আর অনেক অনেক স্থানে আছেন। ইহারদিগের বিনা আওভানে ( =আহ্বানে ) কোথাও কোথাও গমনাগমন নাই। যদ্যপি বা মহোৎসব করিয়া কেহ সামিগ্রী আনিঞা নিকটে দেন তাহা দৈবে লয়েন, নতুবা ইহারদিগের ভিক্ষাকরণ নাঞি। ইহারা অযাচক হয়েন, আটদয দিন উপবাস হয়, কেবল জমুনাজীর জল আহার, তথাচ কান্তির সৌন্দর্য্য বড়ই।"

"পুনশ্চ মথুরায অনেক মহাজন আছেন, আট দশ হাজার গুজ-রাতি ব্রাহ্মণ আছেন। সন্ধ্যাকালে বিশ্রান্ত ঘাটে যমুনাজীর আরতি হয়েন,সহস্র সহস্র লোক জমা হয়েন, দুই প্রহর রাত্রিতক নাম সঙ্কির্ত্তন হয়েন। মথুরার উত্তর তিন ক্রোশ***অট্টালিকা অতি গোপনীয় স্থান। বাঙ্গলাবন্দ মন্দির সুন্দর বড়ই। নিধুবনের রক্ষক সহস্র সহস্র বানর বানরি সকল আছেন। নানান বর্ণে বৃক্ষপত্র পল্লবাদি অতি কোমল,নানান পুষ্পসকল বিকসিত, কোকিলাদি নানান পক্ষি নানান মত ধ্বনি করিতেছেন, বনের সৌন্দর্য্য কে বর্ণন করিবেক।"

ষোড়শ থেকে আরম্ভ ক'রে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সময়ের মধ্যে লিখিত গদ্যের যে সকল নমুনা উপরে আলোচিত হ'ল সে গুলি থেকে বেশ স্পষ্ট বোঝা যায় যে :—

**( ১ ) ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত নানা প্রয়োজনে যে সকল গদ্য লেখা হয়েছিল তাদের মধ্যে সুস্পষ্ট সাহিত্যিক রীতি ব'লে কিছুর অস্তিত্ব নেই ; (২) এবং এসব রচনাকে মুখ্যত দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায় : এক, বিশুদ্ধ সংস্কৃতশব্দমূলক রচনা, আর বহু পারশী-আরবী-শব্দযুক্ত রচনা ; ( ৩ ) সাহিত্যের আরম্ভকাল থেকে পদ্যচর্চা চ'লে এলেও গদ্য রচনা একেবারে নিতান্ত আধুনিক কালের সৃষ্টি নয়।**

ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝিতে লিখিত বাংলা গদ্যের যে সুপ্রাচীন নিদর্শনটি সর্বাগ্রে দেওয়া হয়েছে তার থেকে মনে হয় যে, এ শ্রেণীর গদ্য লেখার সূত্রপাত হয়েছিল আরো কয়েক শতাব্দী আগে ; কিন্তু গদ্যেও যে, সাহিত্য রচিত হতে পারে, অত আগে এ কথা লোকে ভাবতে পারে নি। কি কারণে সাহিত্যক্ষেত্রে গদ্যের চর্চায় বাধা পড়েছিল তা আরম্ভেই উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বলতে পারা যায় যে, উনবিংশ শতাব্দীর আগেই বাংলাদেশে সাহিত্যিক গদ্য গ'ড়ে উঠবার কিছু কিছু সম্ভাবনা দেখা গিয়েছিল। 'আনন্দলহরী'র অনুবাদ ও'বৃন্দাবনলীলা'র রচনা দে'খে, যদি কেউ তার সঙ্গে আধুনিক যুগের সর্বপ্রাচীন গদ্যের জ্ঞাতিত্ব কল্পনা করেন তবে তাঁকে বিশেষ দোষ দেওয়া চলবে না। দীর্ঘকাল পদ্য চর্চার পরে স্বাভাবিক পরিণতির নিয়মেই বাংলার আবহাওয়া ক্রমশ গদ্য সাহিত্য সৃষ্টির অনুকূল হ'যে আসছিল, এমন সময়ে ১৭৫৭ সালে বাংলাদেশে স্থাপিত হ'ল ইংরেজ বণিক কোম্পানীর প্রভুত্ব। তাতেই হ'ল নবযুগের ত্বরিত সূত্রপাত।

## নবযুগের সূত্রপাত

নবলব্ধ রাজত্বের সুব্যবস্থার জন্যে কোম্পানীর কর্ম্মচারীগণ ধীরে ধীরে বাংলা ভাষা ও বাংলা গদ্য রচনার দিকে মন দিলেন। এ মনোযোগের ফলে ক্রমশ বাংলাতে বই ছাপাবার বন্দোবস্ত হ'ল। **উইলকিনস্** (Charles Wilkins ১৭৫০-১৮৩৬) সর্বপ্রথমে বাংলা ছাপার অক্ষর তৈরী করালেন (১৭৭৮)। এই বাংলা ছাপায় ব্যবস্থার সঙ্গে বাংলা গদ্যের প্রচার ও প্রসার, এবং অচিরাৎ সাহিত্যিক রূপ গ্রহণের সম্ভাবনা বিশেষ ভাবে বেড়ে গেল। নতুন বাংলা হরফ সর্বপ্রথমে ব্যবহৃত হ'ল **হালহেড্** Nathaniel Brassey Halhed, ১৭৫১-১৮৩০) কৃত বাংলা ব্যাকরণে। এর পরে ছাপা হ'ল (১৭৮৫) **ডনকান্** ( Jonathan Duncan ) অনু-বাদিত 'ইম্পে আইন' Impay Code )। রাজ্যশাসনের জন্যে যে

বাংলা গদ্য কত প্রয়োজনীয় 'ইম্পে আইন' প্রচারের পর তা ভালো ক'রে বোঝা গেল। ডনকানের প্রদর্শিত পথে **এডমনষ্টোন্** (N B. Edmonstone) দুখানি রেগুলেশনের বই বাংলায় তর্জমা করেন (১৭৯০, ১৭৯২)। তারপর **ফর্ষ্টার** (H. P. Forster) অনুবাদ করলেন সুবিখ্যাত 'ক র্ণ ও য়া লি স্ কৃ ত আ ই নে' র (Cornwallis Code)। এ বই ১৭৯৩ সালে প্রকাশিত হয়েছিল।

বিষয়ের জটিলতা এবং বিদেশী অনুবাদকের অসম্পূর্ণ ভাষাজ্ঞান মিলে এ সকল পুস্তকের গদ্যকে একটু অস্বাভাবিক ক'রে তুলেছিল। তারি ফলে হয়ত বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশের ব্যাপারে এ সকল পুস্তকের কোন প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ে নি। কিন্তু এ সত্ত্বেও এ সকল আইন গ্রন্থের প্রচারের ফলে এক বিশেষ লাভ এই দাঁড়াল যে, রাষ্ট্র-ব্যবস্থার সৌকর্যের জন্য বাংলা গদ্যের প্রয়োজন আপামর সাধারণে স্বীকার করতে বাধ্য হ'ল। সেই হেতু বহু যোগ্য বাঙালী ও ইংরেজের দৃষ্টি পড়ল বাংলা গদ্য রচনার দিকে। পরবর্তীকালের ইতিহাস থেকে মনে হয় যে, এ দৃষ্টি বিশেষ ফলপ্রসূ হয়েছিল।

একদল লোক যখন রাজকার্যের সুব্যবস্থার জন্যে বাংলা গদ্যের চর্চা করছিলেন, তখন আর একদল নিতান্ত ভিন্ন উদ্দেশ্য দিয়ে ঐ গদ্যের অনুশীলন শুরু করলেন। এঁরা হচ্ছেন খ্রীষ্টধর্মের প্রচারকামী মহাশয়গণ। গোড়ায় **এলারটন্** (Ellerton ১৭৬৮-১৮২০) ও **টমাস্** (John Thomas) নামক দুইজন ইংরেজ 'বা ই বে লে' র নূতন ও পুরাতন পুস্তকের কিয়দংশ অনুবাদ করেন। কিন্তু এ সকল অনুবাদ তখনি ছাপা হয় নি। সর্বপ্রথম বাংলা 'বাইবেল' প্রকাশ করার গৌরব **উইলিয়ম কেরীর** (William Carey ১৭৬১-১৮৩৪)। তাঁর কৃত 'বাইবেল' অনুবাদের ভাষাকে কেউ কেউ ভ্রমবশত আধুনিক বাংলা গদ্যের পথ-প্রদর্শক মনে করেছেন। নিচে এর কিছু নমুনা দেওয়া গেল :—

"দুই বৎসর পূর্ণ হইলে এই মত হইলে ফারোণ্ডা স্বপ্ন দেখিল। দেখ সে ডাণ্ডাইয়াছে নদীর কিনারায়; দেখ নদী হইতে উঠিল

সুন্দর হিষ্টপুষ্ট শাতটা গাভী ও চরিতে লাগিল ধারের উপর; তাহার পরে আর সাতটা গাভী উঠিল নদী হইতে বড় কুচ্ছিত ও কৃষা, পরে নদিতীরে দাণ্ডাইল আর সকল গাভীর কাছে; অতঃপর কুচ্ছিত কৃষা গাভীরা খাইয়া ফেলাইল সেই সাতটা সুন্দর হৃষ্টপুষ্ট গাভীর দিগকে। তখন ফরোঙার চৈতন্য হইল।”

কেরীর লিখিত এই গদ্য যে কেবল অপূর্ণাঙ্গ ও অমার্জিত তা নয় এতে বাংলার বাক্যগ্রন্থনরীতির বৈশিষ্ট্যও পদে পদে লঙ্ঘিত হয়েছে। এ হেতু উক্ত গদ্যকে নিতান্ত কৃত্রিম বা বিদেশী বস্তু ব'লে মনে হয়। সে জন্যে বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশের ধারায় এর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোন প্রভাব হয়ত পড়ে নি। কেরীর প্রথম লিখিত বাংলা গদ্য এরূপে ব্যর্থ হলেও, আধুনিক যুগের পুরোভাগে গদ্য রচনার প্রবর্তক হিসাবে তাঁর নাম চিরস্মরণীয়। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা ভাষার অধ্যাপকরূপে তিনি বাংলা গদ্যের অশেষ উপকার করেছেন। তাঁর কৃত এ উপকার সত্ত্বেও বাংলা গদ্যরীতির সর্বপ্রথম কৃতী সংস্কারক হলেন রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩)। কেরীর লেখা থেকে জানা যায় যে ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি একেশ্বরবাদ সম্বন্ধে এক বাংলা পুস্তক রচনা করেছিলেন।[১] সে পুস্তক মুদ্রিত না হলেও হাতের লেখায় বন্ধুজন মধ্যে প্রচারিত হয়েছিল। তারি ফলে গদ্য লেখক হিসাবে রামমোহনের খ্যাতি হয়ত তৎকালীন শিক্ষিত সমাজের অজ্ঞাত ছিল না। কারণ, কেরীর উক্তি থেকে জানা যায় যে, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের জন্য সর্বপ্রথম যে গদ্যপুস্তক প্রকাশিত হয়েছিল তার লেখক **রাম রাম বসু** নিজ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি রামমোহনকে দিয়ে সংশোধন করিয়ে নিয়েছিলেন।[২] উক্ত কলেজের জন্য প্রকাশিত গোড়ার দিকের সব কখানি গদ্যপুস্তকের রচনায় রাম বসুর আদর্শ যে অল্পবিস্তর কার্য্যকরী হয়েছিল একথা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে। এদিক দিয়ে বিচার করলেও রামমোহন বাংলার সাহিত্যিক গদ্যরীতির অদ্বিতীয় স্রষ্টা, এবং বাংলা গদ্যের প্রথম যুগ তাঁরই যুগ।

---

১-২। নিখিলনাথ রায়—'প্রতাপাদিত্য', কলিকাতা, ১৩১৩ বাং, পৃঃ ১৮৪-১৮৮। 'প্রবাসী', ১৩৪৭, পৃঃ ৭৫১-৭৫২; ১৩৪৮, পৃঃ ৪৪৮।

# চতুর্থ অধ্যায়

## রামমোহন যুগ ( ১৮০১—১৮৪৩ )

### ফোর্ট উইলিয়ম পর্ব ( ১৮০১-১৮১৫ )

১৮০০ অব্দে প্রতিষ্ঠিত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাংলা পড়াতে গিয়ে কেরী দেখলেন যে পড়াবার মত গদ্যপুস্তক পাওয়া ভার। তাই তিনি এবং তাঁর আটজন সহকর্ম্মী মিলে পনেরো বছরের মধ্যে তেরোখানি গদ্যপুস্তক ( =**ফোর্ট উইলিয়ম গ্রন্থমালা** ) রচনা করলেন। এখানেই হয়েছিল বাংলা গদ্য রচনার সর্বপ্রথম ব্যাপক চেষ্টা। এজন্যেই রামমোহন যুগের প্রথম পনেরো বছরকে এ যুগের **ফোর্ট উইলিয়ম পর্ব** নাম দেওয়া যেতে পারে। এই তেরোখানি বইএর মধ্যে 'রা জা প্র তা পা-দি ত্য চ রি ত্র' সকলের আগে প্রকাশিত হয ( ১৮০১ )। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, এর রচয়িতা রাম রাম বসু রামমোহন রায়কে দিয়ে বইখানি সংশোধন করিয়ে নিয়েছিলেন, কিন্তু সংশোধন করতে গিয়ে রামমোহন যে, গ্রন্থকর্তার নিজস্ব রীতিকে লুপ্ত করে দেন নি তা সহজেই অনুমেয়। কারণ, 'প্রতাপাদিত্য চরিত্রে'র ভাষার সঙ্গে রামমোহনের বিভিন্ন রচনার ভাষার পার্থক্য বেশ সুস্পষ্ট। রামরাম বসুর অবলম্বিত রীতিমুখ্যত সেকালের চিঠি ও দলিলপত্রাদির ভাষা থেকেই উদ্ভূত ব'লে মনে হয়। আর তাঁর রচনারীতির উপর সেকালের কথ্যভাষায় প্রভাব ছিল যথেষ্ট, এবং স্থানে স্থানে কথকতার প্রভাবও অনুমান করা যায়। উন-বিংশ শতাব্দীর পূর্বকালীন গদ্যের যে সকল নমুনা ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে, সেগুলি এ অনুমানের পোষকতা করে। কিন্তু কিয়দংশে পারশী আরবী শব্দে পূর্ণ দলিলদস্তাবেজের ভাষার অনুসরণে লিখলেও রামরাম

বসুর রচনা বেশ প্রাঞ্জল ও সহজবোধ্য, এবং এর মধ্যে ভাষার একটা স্বাভাবিক গতি রয়েছে। অনুমান করা যেতে পারে যে, অন্তত কিছু পরিমাণেও রামমোহনের হস্তক্ষেপের ফলে রাম বসুর রচনার এরূপ উৎকর্ষ ঘটেছে। রামমোহনের নিজের রচনায় আরবী পারশী শব্দ যে সুদুর্লভ, সে হয়ত তাঁর আলোচিত বিষয়বস্তুর জন্যে ঘটেছে। নচেৎ এসকল বিদেশী ভাষায় তিনি বেশ সুপণ্ডিত ছিলেন ব'লে তাঁর রচনায়ও এসমস্ত ভাষার শব্দ দেখা যেতে পারত। অবশ্য রামমোহনের সংস্কৃতে পারদর্শিতা এবং শিল্পিসুলভ মাত্রাজ্ঞানও হয়ত এ বিষয়ে প্রতিবন্ধক হয়েছিল। সে যাই হোক 'প্রতাপাদিত্য চরিত্রে'র স্থানে স্থানে প্রচুর পারশী আরবী শব্দ থাকলেও একে প্রশংসাই করতে হয়। এর বর্ণনা সকল বেশ স্বভাবানুগত ও চিত্তাকর্ষক, এবং আধুনিক বাংলা গদ্যের যে প্রধান লক্ষণ সমাস-বিরলতা, এ বইতে তাও বিশেষ ক'রে দেখা দিয়েছে। তার ফলে রচনা অনাবশ্যক ভাবে জটিল হয়ে ওঠে নি। এ সকল গুণ সত্ত্বেও আধুনিক সমালোচকদের কেউ কেউ বইখানির অনাদর করেছেন। তার কারণ, সেকালে প্রকাশিত অন্যান্য বইএর মত এ পুস্তকে যথোপযুক্ত বিরাম চিহ্নের অভাব। এ অভাবের জন্যেও পুস্তকখানি অনেকাংশে দুষ্পাঠ্য হয়েছে সন্দেহ নেই। উপযুক্ত বিরামচিহ্ন দিয়ে পড়লে বইখানি হয়ত তত নীরস বিবেচিত হবে না।[১] আর ঐতিহাসিক রচনা হিসাবেও গ্রন্থখানি উপেক্ষার একান্ত অযোগ্য। এরূপে নানা দিক দিয়ে প্রশংসনীয় হলেও 'প্রতাপাদিত্য চরিত্রে'র ভাষায় ত্রুটি ছিল। এর পদবিন্যাস দুর্বোধ্য না হলেও স্থানে স্থানে একটু জটিল, এবং আরবী পারশী শব্দের বাহুল্যও এর ভাষাকে খানিকটা উৎকট করে তুলেছে। কিন্তু এজন্যে 'প্রতাপাদিত্য চরিত্রে'র ভাষাকে দোষ দেওয়া সঙ্গত মনে হয় না। কারণ, যুদ্ধ, রাজ্যশাসন বাদশাহী চরিত্র বর্ণন প্রসঙ্গে সে সময়কার যে সকল চলতি আরবী পারশী কথা রামরাম

---

১। বর্তমান অধ্যায়ে এবং তার পরের কয়েকটি অধ্যায়ে উল্লিখিত, বাংলা গদ্যের দৃষ্টান্তসমূহে যে যে স্থলে যথোচিত বিরাম চিহ্ন নেই, সে সে স্থলে বাক্যান্তে এবং (কখনো কখনো) বাক্যাংশগুলির অন্তে, পাঠের সুবিধার জন্যে তেরছা দাঁড়ি (/) দেওয়া গিয়েছে।

বসু ব্যবহার করেছেন, তা না করে তাদের বদলে সংস্কৃত কথা ব্যবহার করলে রচনা অস্বাভাবিক হয়ে পড়ত। কিন্তু এ ছাড়াও তিনি স্থানে স্থানে যে, বিদেশী শব্দের ব্যবহারে মাত্রাধিক্য ঘটিয়েছেন তা অস্বীকার করা যায় না ; তবে এজন্য দায়ী সেকালকার কথাবার্তায় প্রচুর ওরূপ শব্দ ব্যবহারের রেওয়াজ। এরূপে নানা দিক ভেবে বিচার করলে রামবসু রচিত প্রথম গদ্যপুস্তককে বিশেষ প্রশংসাই করতে হয়। নিচে এর ভাষার নমুনা দেওয়া হ'ল :—

> "সে স্থানের বৃত্তান্ত জানিলে তাহাই সকলের পছন্দ হইল। সে স্থানে লোক পাঠাইয়া দরোবস্ত জঙ্গল কাটাইলেন ও নদী নালার উপর স্থানে স্থানে পুলবন্দি করাইয়া রাস্তার নমুদ করিলেন / পাঁচ ছয় ক্রোশ দীর্ঘ প্রস্থ এ মত দিব্য স্থান তৈয়ার হইল। তাহার মধ্য স্থলে ক্রোশাধিক চারিদিগে আয়াতন গড় কাটাইয়া পুরি আরম্ভ হইল / সদর মফসল ক্রমে তিন চারি বেহন্দে এমারত সমস্ত তৈয়ার হইয়া দিব্য ব্যবস্থিত পুরি প্রস্তুত হইল।"

উল্লিখিত স্থলটিতে পারশী আরবী শব্দের প্রাচুর্য সহজেই চোখে পড়ে। কিন্তু রামরাম বসুর রচনায় এমন অংশও বিরল নয় যেখানে ওরূপ বিদেশী শব্দ খুবই অল্প। নিচে এরূপ একটি অংশ উদ্ধৃত হ'ল :—

> "শুভক্ষণানুসারে যশহর পুরীর সমস্ত রাণীগণেরা রত্নালঙ্কারে বিভূষিতা হইয়া দিব্য অম্লান বস্ত্র কেহ বা পট্ট বস্ত্র কেহ বা কামতাই কেহ বা লক্ষ্মীবিলাষ কেহ বা পিতাম্বর কেহ বা নীলাম্বর নানান প্রকার পরিচ্ছদে সকলে পরিচ্ছদান্বিতা হইয়া বেশ বিন্যাস করিয়া বহুবিধ সুগন্ধি আতর পৃভৃতিতে আমোদিতা হইয়া চতুর্দ্দোলে আরোহণে ঘুমঘাটের পুরীতে আগমন করিতেছেন।"

'প্রতাপাদিত্য চরিত্রে'র প্রায় এক মাস পরে কেরীর সংকলিত 'কথোপকথন' (Dialogues) প্রকাশিত হয় (১৮০১)। নানা শ্রেণীর লোকের কথ্যভাষার যথাযথ নিদর্শন হিসাবেই এর মূল্য, এবং বিদেশীয়দের দেশীয় কথ্য ভাষা শিক্ষাদানই ছিল এ পুস্তকের মুখ্য উদ্দেশ্য।

বাংলার সর্বজন-ব্যবহার্য গদ্যরীতির ক্রমবিকাশে এর প্রভাব খুব নগণ্য ব'লেই মনে হয়।

**গোলোকনাথ শর্মা** রচিত 'হি তো প দে শে' র অনুবাদও ১৮০১ সালেই প্রকাশিত হয়। এ পুস্তকে গোলোকনাথ যে ভাষা ব্যবহার করেছিলেন, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে অনুবাদিত 'ভাষা পরিচ্ছেদ' ও 'আনন্দলহরী'র অনুবাদ তার নিশ্চিত পূর্বাভাষ। 'হিতোপদেশে'র অনুবাদ যথাসম্ভব মূলানুগত ও সংস্কৃতঘেঁষা। তবু স্থানে স্থানে এ ভাষার আপেক্ষিক সরলতা দেখলে একে প্রশংসাই করতে হয়। নিচে এ ভাষার কিছু নমুনা উদ্ধার করা গেল :—

"কোন নদীর তীরেতে পাটলীপুত্র নামধেয় এক নগর আছে। সে স্থানে সর্ব্বস্বামীগুণোপেত সুদর্শন নামে রাজা ছিলেন। সেই রাজা এককালে কোন কাহার মুখে দুই শ্লোক শুনিলেন। তাহার অর্থ এই শাস্ত্র সকলের লোচন / অতএব যে শাস্ত্র না জানে সেই অন্ধ। আর যৌবন ধন সম্পত্তি প্রভুত্ব অবিবেক / ইহার যদি এক থাকে তবেই অনর্থ / সমুদায় থাকিলে না জানি কি হয়। ইহা শুনিয়া সেই রাজা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে / আমার পুত্রেরা অতি মূর্খ অতএব ইহারদের কি হবে। এমন পুত্র থাকা না থাকা তুল্য। যে পুত্র অবিদ্বান ও অধার্ম্মিক সে পুত্রের কি কার্য্য / যেমন কানার চক্ষু পীড়া মাত্র। যদি পুত্র হইয়া মরিত কিম্বা না হইত সে কেবল একবার দুঃখ / কিন্তু মূর্খ পুত্র প্রতিপদে ;"

১৮০২ সালে প্রকাশিত হয় রামরাম বসুর লিখিত 'লি পি মালা'। এখানি তাঁর রচিত দ্বিতীয় গদ্য পুস্তক। এর ভাষা বিষয়বস্তুর অনুরোধে সংস্কৃতবহুল, কিন্তু এর রচনা প্রণালীর সঙ্গে 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্রে'র রচনার পার্থক্য এই যে, গোড়ার দিকে এর বাক্যসমূহের মধ্যে পদান্বয়ের ক্লিষ্টতা অপেক্ষাকৃত বেশী। এই গোড়ার দিকের রচনায় গ্রন্থকার একটু ভাষাগত গাম্ভীর্য ও পারিপাট্য সৃষ্টির প্রয়াস করেছিলেন তা বেশ সুস্পষ্ট। মনে হয় এ চেষ্টা সফল করার মত শক্তি তাঁর ছিল না। নিচে এ রচনার একটি নমুনা উদ্ধৃত হ'ল :—

"পরম দেবতা ভগবানের গুণানুবাদ করণের পর পর যিনি পৃথিবীকে ব্যবস্থিত করিয়াছেন মানবকরণক / আর ২ পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ ইত্যাদি সমস্তই মানবের নিমিত্তক। তন্মধ্যে রাজাগণকে ঐশ্বর্য্যবন্ত করিয়া উদ্ভব করিয়াছেন আর ২ সমস্তের রক্ষার্থে। ইহাতে ইহারদের উচিত সর্ব্বতোভাবে সেই ভগবানের স্তাবক থাকিয়া তাহার অনুজ্ঞা পালন করেন / এবং দ্বেষী বিদ্বেষী না হইয়া অন্যোন্য বর্ণ ও ভিন্নবর্ণ সমস্ত আপন পরিবারের ন্যায় প্রতিপালন করেন। এতদর্থে দেখ আমি কথন কদাচিত ক্রমে এ সকল দ্বিবিধ লোকের দিগকে ভিন্ন ভাব না করিয়া সমভাবে প্রতিপালন করি / ইহাতেই দিনে ২ আমার ঐশ্বর্য্যের বাহুল্যতা। অতএব এই আমার পূর্ব্ব কথনের প্রমাণ।"

পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে, রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' রামমোহন রায়ের দ্বারা সংশোধিত হয়েছিল। 'লিপিমালার' এরূপ কোন সংশোধনের কথা জানা যায় না। খুব সম্ভব সংশোধকের অভাবেই, উক্ত পুস্তকে রচনাগত আড়ম্বর করতে গিয়ে গোড়াতে পদান্বয়ের ত্রুটি ঘটেছে ; কিন্তু এরূপ ত্রুটি সত্ত্বেও 'লিপিমালা'র শেষের দিকে যে প্রাঞ্জল রচনা দেখা যায়, তার কারণ বিষয়বস্তুর গুরুত্বহীনতা। নিচে তার একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হ'ল :—

''লিখিয়াছ আপনকার কন্যার বিবাহের সম্বন্ধ শ্রীযুত রাজনারায়ণ রায়ের পুত্রের সহিত হইয়াছে / তাহার কুলমর্য্যাদা একশত টাকা দিতে হইবেক / এ সম্বন্ধ ভাল বটে কিন্তু টাকার সাংগত্য বৃহত ব্যাপার / এক্ষণে তাহার সংস্থান কি / একশত টাকা পণ দিতে হইবেক / তদ্ভিন্ন আপনাদের ব্যয় তিন চারিশত টাকা ন্যূনে হইতে পারিবেক না। তাহার সকল সঙ্গতি এইক্ষণে হইতে পারিবেক না। আমার এখান হইতে একশত টাকার সুসার হইতে পারিবেক / ইহার অধিক কপর্দ্দক হইবে না / বক্রি চারশত অন্য কোন স্থান হইতে সঙ্গতি করিতে পার এমত স্থান আমি দেখিতে পাই না / অতএব সুতরাং এ সম্বন্ধ হইতে পারিবেক না......''

'লিপিমালা'র প্রায় সমকালেই প্রকাশিত হয় ( ১৮০২ ) **মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের** 'ব ত্রি শ সিং হা স ন'। এই বই সংস্কৃত 'দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকা' নামক গল্পগ্রন্থ অবলম্বনে রচিত। এর ভাষা সংস্কৃতশব্দবহুল হলেও 'প্রতাপাদিত্য চরিত্রে'র ভাষার মতই প্রাঞ্জল এবং সহজবোধ্য। এ উভয় পুস্তকের মোটামুটি বিভিন্নতা শুধু শব্দাবলীর ব্যবহারে। রামরাম বসুর গ্রন্থে পারশী আরবী শব্দ যে প্রচুর তা আগেই দেখা গিয়েছে। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠার কালে বা উনবিংশ শতকের গোড়ায় এদেশের লোকে কথাবার্তায় এবং চিঠিপত্রে ওরূপ বিদেশী শব্দ বহুলভাবে ব্যবহার করলেও, তখনি যে তার বিরুদ্ধে একটা প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল, এবং সে প্রতিক্রিয়ার ফলেই যে সংস্কৃত প্রভাবিত সাধুভাষার উৎপত্তি হয়েছে, এরূপ সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ নির্ভুল হবে না। কারণ, আগেই দেখা গিয়েছে যে উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বেও এদেশের ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরা এক রকমের সাধু-ভাষাই ব্যবহার করতেন। মৃত্যুঞ্জয়াদির লেখায় যে সংস্কৃত প্রভাবিত, বৈদেশিকশব্দবর্জিত গদ্যরীতি প্রকাশ পেল, তা উক্ত সাধুভাষারই স্বাভাবিক অনুবৃত্তি। এ সাধু ভাষা বঙ্কিমযুগের পূর্বে বেশ সতেজ ছিল।

মৃত্যুঞ্জয়ের রচিত 'বত্রিশ সিংহাসনে'র গদ্য তাঁর পরবর্তী রচনার গদ্যের চেয়ে কম কৃত্রিম এবং কম আড়ম্বরপূর্ণ। এ বই অনুবাদমূলক হ'লেও ঠিক অনুবাদ নয়। মৃত্যুঞ্জয় স্থানে স্থানে কথক ঠাকুরদের মত বর্ণনা জুড়ে দিয়ে বর্ণিত গল্পকে বেশ জমকালো ক'রে তুলেছেন। এতে অনুবাদসুলভ নীরস ভাব অনেকটা কেটে গিয়েছে। নিচে এর কিয়দংশ উদ্ধার করা গেল :—

> "দক্ষিণ দেশে ধারা নামে এক পুরী ছিল / সেই নগরের নিকটে সম্বদকর নামে এক শস্যক্ষেত্র থাকে / তাহার কৃষকের নাম যজ্ঞদত্ত। সেই কৃষক শস্যক্ষেত্রের চতুর্দিগে পরিখা করিয়া / শাল তাল তমাল পিয়াল হিন্তাল বকুল আম্র আম্রাতক···কুন্দ মল্লিকা দেবদারু প্রভৃতি নানান জাতীয় বৃক্ষ রোপণ করিয়া / এক উদ্যান করিয়া আপনি সেই উদ্যানের মধ্যে থাকেন। সেই উপবনের নিকট নিবড় (নিবিড় ?) ভয়ানক বন ছিল / সে বন হইতে হস্তী ব্যাঘ্র মহিষ গণ্ডার···হরিণ

আদি অনেক পশু জন্তু আসিযা সস্য নষ্ট প্রত্যহ করে। এজন্য যজ্ঞদত্ত উদ্বিগ্ন হইয়া সস্যরক্ষার কারণ ক্ষেত্রের মধ্যে এক মঞ্চ করিয়া আপনি তথাতে থাকিল / মঞ্চের যতক্ষণ বসিযা থাকে রাজাধিরাজের যেমত প্রতাপ ও শাসন মন্ত্রণা / সেই মত প্রতাপ ও শাসন মন্ত্রণা কৃষক করে / যখন মঞ্চ হইতে নামে তখন জড়ের প্রায থাকি (থাকে)। ইহা দেখিযা কৃষকের পরিজন লোকেরা বড়ই বিস্মিত হইযা কহে এ কি আশ্চর্য্য।"

উল্লিখিত অংশটির ভাষা এক হিসাবে গোলোকনাথ শর্মা রচিত হিতোপদেশের অনুবাদের ভাষার মত হলেও, এতে মৃত্যুঞ্জযের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে। এই বিশেষত্ব হচ্ছে ভাষার আড়ম্বর। রচনার মধ্যে শক্ত সংস্কৃত কথা ছড়িয়ে ভাষাকে সুন্দর করতে গিয়ে, দুরূহ করতেও তিনি পিছ-পা হন নি। সে যাই হোক, মৃত্যুঞ্জয়ের 'বত্রিশ সিংহাসনে'র রচনা বিশেষ নিন্দনীয নয। তাঁকে এক হিসাবে 'পণ্ডিতী' বা (পরবর্তীকালের) 'বিদ্যাসাগরী' গদ্যের রীতির আদি প্রবর্তক বলা যায়।

১৮০৩ সালে প্রকাশিত হয Oriental Fabulist এর অন্তর্গত তারিণীচরণ মিত্র কৃত 'ঈ শ পে র গ ল্পা ব লী'র অনুবাদ। গ্রন্থকার এ পুস্তকের স্থানে স্থানে বাক্যগঠনের ইংরেজী ও পারশী পদ্ধতি অনুসরণ করলেও তাঁর ভাষা বেশ সহজবোধ্য ও মার্জিত। এ ভাষার একটি নমুনা নিচে দেওয়া গেল :—

"এক খেঁকশিযালী দেখিলেক এক দাঁড়কাক ভাল এক টুকরা পোনীরের আপন মুখে লইয়া গাছের ডালের উপর বসিয়া রহিয়াছে, তৎক্ষণাৎ খেঁকশিয়ালী বিবেচনা করিতে লাগিল যে এমন সুস্বাদু গ্রাস কেমন করিয়া হাত করিতে পারিব। কহিলেক, হে প্রিয় কাক, আজি সকালে তোমাকে দেখিয়া আমি বড় সন্তুষ্ট হইয়াছি ; তোমার সুন্দর মূর্ত্তি আর উজ্জ্বল পালক আমার চক্ষের জ্যোতি, যদি নম্রতা ক্রমে তুমি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে একটি গান শুনাইতে তবে

নিঃসন্দেহে জানিতাম যে তোমার স্বর তোমার আর আর গুণের সমান বটে।"

উল্লিখিত গ্রন্থ প্রকাশের দু' বছর পরেই প্রকাশিত হয় (১৮০৫) **চণ্ডীচরণ মুন্‌শীর** লেখা 'তো তা ই তি হা স'। এ বই 'তু তি-না মা' নামক পারশী গল্প পুস্তকের অনুবাদ। এর ভাষায় মূল পারশীর সামান্য প্রভাব থাকলেও এ বই বেশ সুখপাঠ্য। একথা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে যে, তারিণীচরণ এবং চণ্ডীচরণ উভয়েই রামরাম বসুর কল্পিত গদ্যের আদর্শকে অল্পবিস্তর সামনে রেখেই, নিজেদের অধিকতর কৃতিত্ব দেখাতে পেরেছিলেন। 'তোতা ইতিহাসে'র ভাষার কিঞ্চিৎ নমুনা নিচে দেওয়া হ'ল :—

"...ইতিমধ্যে অকস্মাৎ সেই স্থানে একজন বিদেশী উপস্থিত হইল। তদনন্তর রাজসভাস্থ প্রধানেরা তাহাকে জিজ্ঞাসিলেন যে তুমি কে কোথা হইতে আসিযাছ কি কার্য্য কর। সেই ব্যক্তি উত্তর করিলেক যে আমি তলোয়ার মারিতে আর ব্যাঘ্র ধরিতে পারি / ইহা ব্যতিরেক আর আর রূপ শিল্প কর্ম্ম জ্ঞাত আছি / আর তীর এমত মারিতে পারি যে আমার তীর কঠিন প্রস্তরেতে ছিদ্র করিয়া নির্গত হয / এবং খজেন্দর নামা একজন ধনবান আছেন / আমি কিছু দিবস তাঁহার নিকটে চাকর ছিলাম / কিন্তু খজেন্দর আমার কিছু গুণ বিবেচনা করিয়া বুঝিলেন না / অতএব আমি তাঁহার চাকরি ত্যাগ করিয়া মহারাজ তেবরস্তানের নাম শুনিয়া তাঁহার নিকট চাকরি করিতে আসিয়াছি।"

**রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়** কৃত 'রা জা কৃ ষ্ণ চ ন্দ্র রা য় স্য চ রি ত্র'ও ১৮০৫ সালে প্রকাশিত হয়। এর ভাষা ও এ পুস্তকের পূর্ব-বর্তী সকল গদ্য গ্রন্থের ভাষার চেয়ে বেশী মার্জিত। এর সরলতাও অপেক্ষাকৃত বেশি। ইতিহাসের দিক দিয়ে রাজীবলোচনের পুস্তক উচ্চাঙ্গের না হ'লেও গদ্য রচনার নিদর্শন হিসাবে প্রশংসনীয়। পূর্ব-বর্তী লেখকদের প্রতিষ্ঠিত আদর্শের তিনি অনেকটা সদ্‌ব্যবহার করতে

পেরেছিলেন ব'লে মনে হয়। নিচে এ পুস্তক থেকে কিয়দংশ উদ্ধৃত হ'ল :—

"জগৎসেট প্রভৃতি কহিলেন এমন কে তাহা বিস্তারিযা কহ / রাজা কহিলেন বিলাতে নিবাস জাত ইঙ্গরাজ কলিকাতায কোঠি করিযা আছেন / যদি তাঁহারা এ রাজ্যের রাজা হন তবে সকল মঙ্গল হবেক। ইহা শুনিযা সকলেই কহিলেন তাঁহার দিগের কি ২ গুণ আছে / রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায কহিলেন তাঁহার দিগের গুণ এই ২ সকল / সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয পরহিংসা করেন না / যোদ্ধা অতি বড় / প্রজা প্রতি যথেষ্ট দযা এবং অত্যন্ত ক্ষমতাপন্ন / বুদ্ধিতে বৃহস্পতির ন্যায় ধনেতে কুবের তুল্য / ধাম্মিক এবং অর্জ্জুনের ন্যায পরাক্রম / প্রজাপালনে সাক্ষাৎ যুধিষ্ঠির এবং সকলে ঐক্যতাপন্ন / শিষ্টের পালন দুষ্টের দমন রাজার সকল গুণ তাঁহার দিগের আছে / অতএব যদি তাঁহারা এ দেশাধিকারী হন তবে সকলের নিস্তার / নতুবা জীবনে সকল নষ্ট করিবেক।"

১৮০৮ সালে মৃত্যুঞ্জয়ের বিদ্যালঙ্কার রচিত 'হি তো প দে শে' র অনুবাদ এবং 'রা জা ব লী' গ্রন্থ প্রকাশিত হয। মৃত্যুঞ্জয়ের কৃত হিতোপদেশের অনুবাদের ভাষা গোলোকনাথ কৃত উক্ত গ্রন্থের অনুবাদের ভাষার চেযে শক্ত এবং সংস্কৃতঘেঁষা হলেও নিন্দনীয নয। উভয়ের ভাষার তুলনার জন্য এখানেও হিতোপদেশের আরম্ভ ভাগটি থেকে কিযদংশ দেওযা হ'ল :—

"ভাগীরথীর তীরে পাটলিপুত্র নামে নগর আছে / সেখানে সকল রাজগুণে যুক্ত সুদর্শন নামে রাজা ছিলেন / সেই ভূপতি এক সময কাহারও কর্তৃক পঠ্যমান শ্লোকদ্বয় শ্রবণ করিলেন / তাহার অর্থ এই / অনেক সন্দেহের নাশক এবং অপ্রত্যক্ষ বিষয়ের জ্ঞাপক যে শাস্ত্র সে সকলের চক্ষু / ইহা যাহার নাই সে অন্ধ / আর যৌবন ও ধনসম্পত্তি ও প্রভুত্ব ও অবিবেকতা এই চতুষ্টয় প্রত্যেকেও অনর্থের নিমিত্ত হয় / যেখানে এ চতুষ্টয় সেখানে কি হয় কহিতে পারি না / ইহা শুনিয়া সে রাজা অজ্ঞাতশাস্ত্র এবং সর্ব্বদা বিপথগামী

আপন পুত্রেরদিগের শাস্ত্র বিজ্ঞাপনার্থে উদ্বিগ্নচিত্ত হইয়া চিন্তা করিলেন / যে পুত্র পণ্ডিত ও ধার্মিক নয় সে পুত্র হওয়াতে কি প্রয়োজন / বরং অনর্থ হয় যেমন কাণচক্ষুতে কিছু প্রযোজন নাই। প্রত্যুত কাণচক্ষু কেবল পীড়ারি কারণ / এবং অজাত মৃত ও মূর্খ ইহার মধ্যে আদ্যদ্বয় ভাল অন্তিম ভাল নয় / যেহেতুক আদ্যদ্বয় একবার দুঃখদায়ক হয় / অন্তিম পুনঃ পদে পদে দুঃখদায়ক হয়।"

'রাজাবলী' সংস্কৃত পুস্তক অবলম্বনে লেখা হলেও কিয়দংশে মৃত্যুঞ্জয়ের মৌলিক রচনা। এ পুস্তকে তিনি কোন নতুন রীতিব ব্যবহার করেন নি ; তবে নবাব, বাদশাহ ও লড়াই আদির বর্ণনায় প্রযোজনমত পারশী আরবী শব্দ ব্যবহার করতে তাঁর কুণ্ঠা ছিল না। এ বিষয়ে রামরাম বসুর দৃষ্টান্ত তাঁর উপর কার্যকরী হয়েছিল ব'লে মনে হয়।

১৮১৮ সালে **রামকিশোর তর্কালঙ্কার** কৃত, 'হি তো প দে শে' র আর এক অনুবাদও প্রকাশিত হযেছিল। কিন্তু এ বই বর্তমানে একান্ত অলভ্য, তাই এর ভাষা সম্বন্ধে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যায় না ; তবে, এর ভাষায় কোন বিশেষত্ব ছিল না ব'লে মনে হয। এই বই গোলোকনাথ শর্মা বা মৃত্যুঞ্জযের অনুবাদের চেয়ে যে সুপাঠ্য হয নি, তাও মনে করা যেতে পারে।

এ সকল গ্রন্থের পরে ১৮১২ সালে কেরীর 'ই তি হা স মা লা' প্রকাশিত হয়। এ বইএর ভাষা রামরাম বসু ও চণ্ডীচরণ মুন্‌শী প্রভৃতির ভাষার চেয়ে বিশুদ্ধতর ও অপেক্ষাকৃত কম কৃত্রিম এবং মৃত্যুঞ্জয়াদির লিখিত পণ্ডিতী ভাষার চেয়ে অনাড়ম্বর। অবশ্য এ সকল গ্রন্থকারের অধিকাংশ রচনা কেরীর 'ইতিহাস মালা'র আগে প্রকাশিত হয়েছিল এবং কেরী এ সকলের আদর্শে তাঁর রচনারীতি পরিমার্জিত করতে পেরেছিলেন। নিচে এ বই থেকে কিয়দংশ উদ্ধৃত হ'ল :—

"একজন ঘটক ব্রাহ্মণ অর্থাৎ বিবাহের যোজক এক বনের মধ্য দিয়া আসিতেছিল / সেস্থানে এক ব্যাঘ্র ঐ ঘটক ব্রাহ্মণকে মারিতে উদ্যত হইলে ব্রাহ্মণ ভীত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। ব্যাঘ্র ঘটকের ক্রন্দন দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেক তুমি কি কারণ কান্দিতেছ / ব্রাহ্মণ

কহিলেক আমি ঘটক / বিবাহের যোজকতা করিয়া ধনোপার্জ্জন করিয়া স্ত্রী পুত্র প্রভৃতির ভরণ পোষণ করি / আমি মরিলে তাহারা কোন মতে বাঁচিবেক না / ইহা শুনিয়া ব্যাঘ্র বিবেচনা করিল / আমি ব্যাঘ্রীহীন / ব্রাহ্মণ বিবাহের যোজকতা করে / পরে কহিলেক হে ঘটক তুমি আমার বিবাহ দেও / ব্যাঘ্রী না থাকাতে আমি বড় দুঃখী আছি / তুমি আমার বিবাহ দিলে আমি তোমাকে নষ্ট করিব না।”

**হরপ্রসাদ রায়** রচিত ‘পুরুষপরীক্ষা’ প্রকাশিত হয় ১৮১৫ সালে। **বিদ্যাপতি** কৃত মূল সংস্কৃত থেকে অনুবাদিত এ পুস্তকের গদ্য অনেকটা সংস্কৃত-ঘেঁষা এবং অনেকাংশে মৃত্যুঞ্জয়ের ‘বত্রিশ সিংহাসনে’র ভাষার সঙ্গে তুলনীয়। অবশ্য শেষোক্ত পুস্তকের মত এর ভাষা তত আড়ম্বরপূর্ণ নয়। নিচে এর কিছু নমুনা দেওয়া গেল :—

“সকল কার্য্যের উদ্যোগের যে হেতু সেই উৎসাহ / তাহাকে জীবের ধর্ম্ম বিশেষ কহা যায / সেই উৎসাহহীন যে মনুষ্য সে অলস হয় / তাহার উদাহরণ এই।

মিথিলা নগরীতে বীরেশ্বর নামে এক রাজমন্ত্রী থাকেন / তিনি দানশীল এবং অত্যন্ত দযালু / সকল দুর্গত ও অনাথ লোকের দিগেরে প্রতিদিন তাহারদের ইচ্ছামত আহার দান করেন। কিন্তু ঐ সকলের মধ্যে অলস লোকের দিগেরে অন্ন এবং বস্ত্র দান করেন / যে হেতুক অলস লোক জঠরাগ্নিতে ব্যাকুল হইয়াও আলস্যপ্রযুক্ত কোন কর্ম্ম করিতে পারে না……। পরে ধূর্ত্তেরা অলসেরদের সুখ দেখিয়া কৃত্রিম আলস্য প্রকাশ করিয়া সেখানে ভোজনদ্রব্য গ্রহণ করিতে লাগিল।”

আদি যুগের প্রথম পর্বের রচনা হিসাবে বিশেষ নিন্দনীয় না হলেও ‘ফোর্ট উইলিযম গ্রন্থমালা’র প্রভাব যে, বাংলা সাহিত্যিক গদ্য গ’ড়ে ওঠার ব্যাপারে প্রত্যক্ষভাবে কার্যকরী হয়েছিল তা মনে হয় না। তার প্রধান কারণ হ’ল এ সকল বইএর বিষয বস্তুর আপেক্ষিক অকিঞ্চিৎকরত্ব। উক্ত গ্রন্থমালার অধিকাংশই ছিল গল্পপুস্তক, কিন্তু সে সকল

গল্প প্রায়শ লোকের জানা বা মুখে মুখে প্রচলিত ছিল। তাই, যে ভাষায় অপরিচিত বা স্বল্প পরিচিত আরবী, পারশী বা সংস্কৃত শব্দের বাহুল্য এবং পদবিন্যাস প্রণালী খানিকটে গোলমেলে, সে ভাষায় ঐ পরিচিত গল্প গুলি শুনতে লোকের তেমন আগ্রহ দেখা যায় নি। প্রতাপাদিত্য বা কৃষ্ণচন্দ্রাদির চরিত্রমূলক গ্রন্থের সম্বন্ধেও ঐ একই কথা বলতে পারা যায়। যাদের বিষয়বস্তু বা রচনারীতির আকর্ষণ কম, এমন বইও শুধু গদ্যের অভিনবত্বের জন্যে জনসাধারণের কৌতূহলের বস্তু হ'তে পারত; কিন্তু 'ফোর্ট উইলিয়ম গ্রন্থমালা'র দুর্মূল্যতার জন্যে তা হওয়াও সম্ভবপর ছিল না। ঐ পুস্তক সকলের প্রতিখণ্ডের দাম কখনো কখনো আট দশ টাকা পর্যন্ত ছিল। যে সময়ে লোকে মাসিক ৮।১০্ বেতনে ছোটখাট সংসার চালাত, সে সময়ে সাধারণ লোকদের পক্ষে এ দাম সংগ্রহ করা যে অতিশয় কষ্টসাধ্য ছিল, তা বলাই বাহুল্য। এ সকল কারণে 'ফোর্ট উইলিয়ম গ্রন্থমালা'র সমসাময়িক চাহিদা খুবই সীমাবদ্ধ ছিল। অতএব এ গ্রন্থমালা প্রকাশের অব্যবহিত পরবর্তী কালে (১৮১৫-১৮২৯) গদ্যরীতির গড়ে ওঠার ব্যাপারে এ সকল পুস্তকের প্রভাবের যে আতিশয্য কেউ কেউ কল্পনা করেছেন, তা মোটেই যুক্তিসঙ্গত ব'লে মনে হয় না। এ সময়ের (১৮১৫-১৮২৯) মধ্যে তিন খানি ছাড়া আর কোন পুস্তকই হয়ত পুনর্মুদ্রিত হয় নি। আর একখানির ('রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্র') প্রথম মুদ্রণ সম্বন্ধে পাদরী লঙ্ (Rev. J. Long) লিখেছেন ঃ—"যদিও ১২০ পৃষ্ঠা পরিমিত পুস্তকের দাম (প্রতি খণ্ড) ৫্ ছিল কোনও রকমেই এর ছাপা খরচ নির্বাহ হয়েছিল, বাংলা বইএর চাহিদা (তখন) এতই সীমাবদ্ধ ছিল।" ১৮২৯ অব্দের পূর্বে পুনর্মুদ্রিত 'ফোর্ট উইলিয়ম গ্রন্থমালা'র পুস্তকগুলি ছিল মৃত্যুঞ্জর বিদ্যালঙ্কারের রচিত। লোকপ্রিয়তার জন্যেই যে এগুলির একাধিক মুদ্রণের প্রয়োজন হয়েছিল তার স্পষ্ট প্রমাণ নেই। বরং মনে হয় মৃত্যুঞ্জয় ও তাঁর পুত্র ক্রমান্বয়ে ফোর্ট উলিয়ম কলেজের বাংলার প্রধান পণ্ডিতের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন ব'লেই উক্ত কলেজের ছাত্র মহলে মৃত্যুঞ্জয়ের পুস্তক বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়েছিল। তাই ১৮২৯এর আগে

সেগুলির একাধিক মুদ্রণ করতে হয়েছে। 'ফোর্ট উইলিয়ম গ্রন্থমালা'র প্রভাবাতিশয্য যদি ১৮২৯ সালের আগে সম্ভবপর না হয়ে থাকে, তবে পরবর্তিকালে হওয়া খুবই অসম্ভব, তা বিভিন্ন পাঠ-সংগ্রহ ( selection ) গ্রন্থে বা অন্যরূপে সেগুলি যতবারই পুনর্মুদ্রিত হোক। কিন্তু এসকল সত্ত্বেও বাংলা গদ্য প্রচারে 'ফোর্ট উইলিয়ম গ্রন্থমালা' যে কিয়ৎ পরিমাণে পথিকৃতের কাজ করেছিল তা স্বীকার করতেই হবে।

# পঞ্চম অধ্যায়

## সংস্কার-উদ্যোগের পর্ব ( ১৮১৫—১৮২৯ )

বাংলা গদ্যে রামমোহন রায়ের 'বেদান্তগ্রন্থা'দি প্রকাশিত হবার পর থেকে, তাঁর বিলাত যাত্রার কিঞ্চিৎ পূর্বপর্যন্ত তাঁর যুগের যে পর্ব চলেছিল তার নাম দেওয়া যেতে পারে **সংস্কার উদ্যোগের পর্ব**। এ পর্বের মধ্যে বাংলা গদ্যের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পরিপোষক অনেক ব্যাপার ঘটেছিল। সে সকলের মধ্যে প্রধান হচ্ছে :—রামমোহন প্রবর্তিত বিবিধ ( ধর্ম্ম, সমাজ ও শিক্ষা প্রভৃতি ) সংস্কার আন্দোলন, এবং তৎসঙ্গে স্কুলবুক সোসাইটি ( ১৮১৭ ), স্কুল সোসাইটি ( ১৮১৮ ) হিন্দুকলেজ ( ১৮১৭ ) আদির প্রতিষ্ঠা ও বাংলা সাময়িক পত্র প্রচারের আরম্ভ ( ১৮১৮ )।

এ যুগপর্বের সর্বশ্রেষ্ঠ গদ্য লেখক রামমোহন রায়। 'ফোর্ট উইলিয়ম গ্রন্থমালা' প্রচারের গোড়ায় তাঁর প্রেরণা থাকলেও উক্ত গ্রন্থ-নিচয়ের লেখকবর্গ নানা কারণে বাংলায় সর্বকার্যে ব্যবহারের উপযোগী সহজবোধ্য কোন গদ্য রীতির গোড়া পত্তন করতে পারেন নি। সে কাজটি সাধিত হয়েছিল স্বয়ং রামমোহনের দ্বারা।

### ( ক ) রামমোহন রায়ের গদ্য

রামমোহনের প্রথম প্রকাশিত পুস্তক ছিল মূর্তিপূজামূলক ঈশ্বরোপাসনার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সমালোচনা। তাই তাঁর বই প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সংখ্যাধিক মূর্তিপূজকের দেশে তুমুল আন্দোলন শুরু হয়েছিল। গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়, যে অল্পসংখ্যক লোকের মনঃপূত হ'ল তাঁরা রামমোহনের মত অনুসরণ করলেন ; আর যাঁরা একেশ্বরবাদ প্রচারের মধ্যে ধর্ম-বিপ্লবের বিভীষিকা দেখলেন তাঁরা, তাঁর উপর খড়্গহস্ত

হয়ে উঠলেন। রামমোহনের গদ্য যে সমসাময়িক লোকদের মধ্যে কতখানি প্রচার লাভ করেছিল এই ব্যাপার তার সুস্পষ্ট সাক্ষী। কিছু পরে লিখিত সহমরণ সম্পর্কীয় রচনাবলিও রামমোহনের গদ্যকে সর্বসাধারণের মধ্যে একরূপ সুপরিচিত করার সাহায্য করেছিল। এদিক দিয়ে তাঁর কৃতিত্ব কেরী প্রমুখ 'ফোর্ট উইলিয়ম গ্রন্থমালা'র লেখকগণের কৃতিত্বের বহু উর্ধ্বে।

রামমোহনের গদ্যরচনার বহুলপ্রচার যে কেবল ধর্মবিষয়ক বিচার বিতর্কের আশ্রয়েই ঘটেছিল, তা মনে কববার কারণ নেই। ওরূপ বাদানুবাদ তাঁর লেখা প্রচারের সাহায্য করেছে বটে, কিন্তু তাঁর রচনার প্রাঞ্জলতাও তাঁকে এ বিষয়ে কম সাহায্য করে নি। তাঁর প্রচারিত প্রথম গ্রন্থদ্বয়ে তিনি যদি বেদান্তের মত দুরূহ বিষয়কে নিতান্ত সহজরূপে পাঠকদের বোধগম্য করতে না পারতেন, তবে তাঁর বিরুদ্ধবাদীদের তেমন বিচলিত হবাব কথা ছিল না। কারণ, যে সব শাস্ত্রীয় প্রমাণ তিনি তাঁর বইতে উল্লেখ কবেছিলেন, সে সব যতদিন দুর্বোধ্য সংস্কৃতে নিবদ্ধ ছিল ততদিন গোড়া সমাজনায়কদেব মানসিক শান্তি ভঙ্গ করে নি। কিন্তু প্রাঞ্জল গদ্যে সে সকলের ব্যাখ্যা ক'বে তিনি যখন সংখ্যাবহুল সংস্কৃতানভিজ্ঞ পাঠকদেব নিকট উপস্থিত করলেন তখন গোড়ার দল বিচলিত না হযে থাকতে পারলেন না। একেশ্বরবাদের ব্যর্থ প্রতিবাদের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদীগণ বেদান্ত শাস্ত্রের অর্থ বাংলা ভাষায প্রকাশ করাকেও অপরাধজনক ব'লে প্রচার করলেন। রামমোহনের গদ্য রচনার সারল্য ও প্রাঞ্জলতা সম্বন্ধে এ হ'ল পরোক্ষ প্রমাণ। অতঃপর দৃষ্টান্তসহ তাঁর রচনার গুণাগুণ বিবেচনা করা যাচ্ছে।

'ফোর্ট উইলিয়ম গ্রন্থমালা'র রচনায় রামমোহনের পরোক্ষ প্রভাবের ফলে যদিও স্থানে স্থানে কিয়ৎপরিমাণ প্রাঞ্জলতা দেখা গিয়েছিল, তবু এতে এক মহৎ দোষ এই ছিল যে, এর সর্বাংশে কোন এক স্থির আদর্শ অনুসৃত হয়নি। স্থানে স্থানে, বাংলা ভাষার প্রকৃতিবিরুদ্ধ সুদীর্ঘ সমাসবদ্ধ পদসমূহের প্রয়োগ, অনুপ্রাস বা সংস্কৃত সাহিত্যের উপযোগী অন্যবিধ অলঙ্কারের অবতারণা, সংস্কৃত, প্রাকৃত ও বৈদেশিক শব্দের অদ্ভুত মিশ্রণ,

সংস্কৃত পদবিন্যাস রীতির অনুসরণ আদি ত্রুটির ফলে 'ফোর্ট উইলিয়ামী' রচনানিচয় কিয়দংশে এক বিচিত্র বহুরূপীর চেহারা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল। এই বিকৃত আদর্শ বিস্তৃতভাবে প্রচারিত হলে বাংলা গদ্যের স্বাভাবিক বিকাশের পথে যে অন্তরায় ঘটতে পারত তা বলাই বাহুল্য। তবু বাংলা গদ্যের ওপর যে স্বল্প প্রভাব 'ফোর্ট উইলিয়ম গ্রন্থমালা' থেকে এসেছিল রামমোহন রায়ের কৃতিত্বের ফলে পরিশেষে তা বাধা প্রাপ্ত হয়। বাংলা গদ্যের ধ্রুব আদর্শ আবিষ্কৃত হয়েছিল রামমোহনেরই হাতে। তার কারণ, বাংলা ভাষার অনন্যসাধারণ প্রকৃতিটি তাঁর বেশ ভালো ক'রে জানা ছিল; এর শ্রেষ্ঠ প্রমাণ তাঁর লেখা 'গৌ ড়ী য় ব্যা ক র ণ'। আর ইংরাজী পারশী আদি আধুনিক সাহিত্যের সঙ্গে সুগভীর পরিচয়ও রামমোহনকে বাংলা গদ্যের আদর্শ আবিষ্কারে কিয়ৎপরিমাণে সাহায্য ক'রে থাকবে। এ সকলের ফলে, এবং স্বাভাবিক বুদ্ধিতে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, বাংলার সঙ্গে সংস্কৃতের সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ হলেও দেবভাষাকে দেশকালপাত্র নির্বিশেষে এর স্কন্ধে ভর করতে দেওয়া অন্যায় হবে। তিনি জানতেন যে, বাংলাকে সংস্কৃত থেকে অবশ্যই ধার নিতে হবে, কিন্তু সে ধার যেন ভার হয়ে না ওঠে, এদিকে তাঁর দৃষ্টি সর্বদা জাগরূক ছিল। এক দিকে সমাস-বাহুল্য এবং অপর দিকে হাল্‌কা প্রাকৃত শব্দের প্রচুর প্রয়োগ, এ দুয়ের বর্জন ক'রে তিনি বাংলা গদ্যের এক ধ্রুব আদর্শ প্রতিষ্ঠার গোড়াপত্তন করতে পেরেছিলেন। নিচে দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁর রচনাবলি থেকে কয়েকটি অংশ উদ্ধার করা যাচ্ছে।

দেশভাষায় বেদান্তশাস্ত্র প্রচারে এবং শ্রবণে পাপ হতে পারে, প্রতি-পক্ষদের এরূপ অভিযোগের উত্তরে রামমোহন 'বে দা ন্ত গ্র ন্থে' (১৮১৫) লিখেছেন :—

> "কেহো কেহো এ শাস্ত্রে প্রবৃত্তি হইবার উৎসাহের ভঙ্গ নিমিত্ত কহেন যে / বেদের বিবরণ ভাষায় করাতে এবং শুনাতে পাপ আছে / এবং শূদ্রের এ ভাষা শুনিলে পাতক হয়। তাঁহাদিগ্যে জিজ্ঞাসা কর্ত্তব্য যে / যখন তাঁহারা শ্রুতি স্মৃতি জৈমিনি সূত্র গীতা পুরাণ ইত্যাদি শাস্ত্র ছাত্রকে পাঠ করান / তখন ভাষাতে তাহার বিবরণ

করিয়া থাকেন কি না / আর ছাত্রেরা সেই বিবরণকে শুনেন কি না / আর মহাভারত যাহাকে পঞ্চম বেদ আব সাক্ষাৎ বেদার্থ কহা যায় তাহার শ্লোক সকল শূদ্রের নিকট পাঠ করেন কি না / এবং তাহার অর্থ শূদ্রকে বুঝান কি না / শূদ্রেরাও সেই বেদার্থের অর্থ এবং ইতিহাস পরস্পর আলাপেতে কহিযা থাকেন কি না / আব শ্রাদ্ধাদিতে শূদ্র নিকটে ঐ সকল উচ্চাবণ করেন কি না। যদি ঐরূপ সর্ব্বদা করিযা থাকেন / তবে বেদান্তের এ অর্থের বিবরণ ভাষাতে করিবাতে দোষের উল্লেখ কিরূপে করিতে পারেন।"

পরম্পরার দোহাই দিয়েও লোকে কেমন সুবিধাবাদীর মত অসঙ্গত আচরণ করে, তা বোঝাতে গিযে রামমোহন 'ঈ শো প নি ষ দ্' অনুবাদের ভূমিকায ( ১৮১৬ ) লিখেছেন :—

"বিশেষ আশ্চর্য্য এই যে / যদি কোন ক্রিযা[১] শাস্ত্রসংমত এবং সত্যকাল অবধি শিষ্টপরম্পরা সিদ্ধ হয / কেবল অল্পকাল কোনো কোনো দেশে তাহার প্রচাবের ত্রুটি জন্মিযাছে / আর সংপ্রতি তাহার অনুষ্ঠানেতে লৌকিক কোনো প্রযোজন[২] সিদ্ধ হয না এবং হাস্য আমোদ[৩] জন্মে না / তাহার অনুষ্ঠান করিতে হইলে লোকে কহিয়া থাকেন যে পরম্পরাসিদ্ধ নহে কি রূপে ইহা করি / কিন্তু সেই সকল ব্যক্তি যেমন আমরা সেই রূপ সামান্য লৌকিক প্রয়োজন দেখিলে পূর্ব্ব শিষ্টপরম্পরার অত্যন্ত বিপরীত এবং শাস্ত্রের সর্ব্বপ্রকারে অন্যথা শত শত কর্ম্ম করেন / সে সমযে কেহ শাস্ত্র এবং পূর্ব্ব পরম্পরার নামো করেন না / যেমন আধুনিক কুলের নিযম[৪] যাহা পূর্ব্ব পরম্পরার বিপরীত এবং শাস্ত্র বিরুদ্ধ। আর ইঙ্গরেজ যাহাকে ম্লেচ্ছ কহেন তাঁহাকে অধ্যযন করান কোন শাস্ত্রে আর কোন পূর্ব্ব পরম্পরায ছিল।"

১। যেমন, নিরাকার পরমেশ্বরের উপাসনা, ২। যেমন, পুরোহিতের দক্ষিণাদি লাভ, ৩। যেমন, পূজোপলক্ষে নৃত্যগীতাদি, ৪। কৌলীন্যপ্রথা।

কখনো কখনো বিধবাকে বলপূর্বক দাহ করার যুক্তিরূপে সহমরণ পক্ষপাতী ব্যক্তি, স্ত্রীলোকের অন্যান্য দোষের মধ্যে অন্তঃকরণের অস্থিরতা ও বিশ্বাসঘাতকতার কথা তুলেছিলেন। এ কথার উত্তরে রামমোহন লিখেছেন ( ১৮১৯ ) ঃ—

"দ্বিতীযত তাহার দিগকে অস্থিরান্তঃকরণ কহিযা থাকেন, ইহাতে আশ্চর্য্য জ্ঞান করি, কারণ যে দেশের পুরুষ মৃত্যুর নাম শুনিলে মৃতপ্রায় হয, তথাকার স্ত্রীলোক অন্তঃকরণের স্থৈর্য্য দ্বারা স্বামির উদ্দেশে অগ্নিপ্রবেশ করিতে উদ্যত হয়, ইহা প্রত্যক্ষ দেখেন, তথাচ কহেন, যে তাহাবদের অন্তঃকরণের স্থৈর্য্য নাই।

তৃতীযত বিশ্বাসঘাতকতার বিষয়। এ দোষ পুরুষে অধিক কি স্ত্রীতে অধিক উভযের চরিত্র দৃষ্টি করিলে বিদিত হইবেক। প্রতি নগরে প্রতি গ্রামে বিবেচনা কর, যে কত স্ত্রী পুরুষ হইতে প্রতারিতা হইয়াছে, আর কত পুরুষ স্ত্রী হইতে প্রতারণা প্রাপ্ত হইযাছে, আমরা অনুভব করি যে প্রতারিত স্ত্রীর সংখ্যা দশগুণ অধিক হইবেক, তবে পুরুষেরা প্রায় লেখাপড়াতে পারগ এবং নানা রাজকর্ম্মে অধিকার রাখেন, যাহার দ্বারা স্ত্রীলোকের কোন কোন এরূপ অপরাধ কদাচিৎ হইলে সর্ব্বত্র বিখ্যাত অনাযাসেই করেন, অথচ পুরুষে স্ত্রীলোককে প্রতারণা করিলে তাহা দোষের মধ্যে গণনা করেন না।"

উল্লিখিত রচনাংশ কযেকটিতে খাটি বাংলা ও সংস্কৃত শব্দের যে অনুপাত বর্তমান, আধুনিক কালে প্রচলিত সর্বকার্যের উপযোগী সাধু ভাষার গদ্যেও প্রায় তাই পাওযা যায়। এতে যে পরিমাণে সংস্কৃত শব্দ আছে তাতে রচনায গাম্ভীর্য এসেছে, অথচ রচনা তার স্বাভাবিক গতি হারায নি। আর সরল ও জটিল বাক্যের যথোপযুক্ত মিশ্রণেও এ রচনা জমাট বেঁধেছে। কিন্তু 'ফোর্ট উইলিয়ম গ্রন্থমালা'র রচনায় এসকল গুণ তত সুলভ নয। এ জন্যে রামমোহন রায়কে সর্বজন-ব্যবহার্য সাধুভাষার গদ্যের আদি প্রবর্তক বলা যেতে পারে।

উপরে প্রদত্ত দৃষ্টান্ত তিনটি থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, রামমোহনের রচনা 'ফোর্ট উইলিয়ম গ্রন্থমালা'র রচনার চেয়ে কত প্রাঞ্জল ও সুখবোধ্য।

কিন্তু তাঁর রচনায় এর চেয়েও সরল এবং প্রসাদগুণসম্পন্ন স্থান আছে। নিচে তার একটি নমুনা উদ্ধার করা গেল।

খ্রীষ্টীয় প্রচারকগণকৃত হিন্দুশাস্ত্রের সমালোচনার উত্তরে তিনি 'ব্রা হ্ম ণ সে ব ধি' (১৮২১) নামক পত্রিকায় লিখেছেন :—

"বায়বেলে আদ্য তিনি অধ্যায়েই এই পরের লিখিত বাক্য সকল দেখিতে পাই যে / "ঈশ্বর আপন ক্রিয়া হইতে সপ্তম দিবসে বিশ্রাম করিলেন" / "ঈশ্বর ঈদন উপবনে দিবসের শীতল সময়ে বেড়াইতে ছিলেন" / "ঈশ্বর আদমকে কহিলেন যে তুমি কোথায় রহিয়াছ" / অতএব বিশ্রাম এই শব্দের দ্বারা মোসার কি এই তাৎপর্য্য ছিল যে / ঈশ্বর শ্রমাধিক্যের নিমিত্ত ক্রিয়া হইতে নিবৃত্ত হইলেন যাহার দ্বারা তাঁহার একাবস্থ স্বভাবে বাধা পড়ে। আর দিবসের শীতল সময়ে ঈশ্বর বেড়াইতেছিলেন এই বাক্যের দ্বারা মোসার কি এই তাৎপর্য্য ছিল যে / ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় পাদবিক্ষেপের দ্বারা উত্তাপের ভয়ে দিবসের শীতল সময়ে এক স্থান হইতে অন্য স্থান গমন করেন। আর আদম তুমি কোথায় রহিযাছ এই প্রশ্নের দ্বারা মোসার কি এই তাৎপর্য্য ছিল যে / সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর আদমের কোন স্থানে স্থিতি ইহা জানিতেন না। যদি মোসার এই সকল তাৎপর্য্য ছিল তবে ঈশ্বরের স্বভাবকে অতি চমৎকাররূপে মোসা জানিয়াছিলেন / এবং মোসার পরমার্থজ্ঞান ও তৎকালের মূর্খদের পরমার্থজ্ঞান দুই প্রায় সমান ছিল।"

মাঝে মাঝে দুই চারিটি কথা অদল-বদল ক'রে দিলে রামমোহনের রচনার উদ্ধৃত অংশটিকে প্রায় আধুনিক সাধুভাষার গদ্য ব'লে চালানো যেতে পারে। এ গদ্য যেমন লঘুগতি তেমনই প্রাঞ্জল; কিন্তু এই এর একমাত্র গুণ নয়। রামমোহন মুখ্যত ধর্ম ও সমাজ সংক্রান্ত বিষয় এবং তৎসম্পর্কিত বাদবিতণ্ডা নিয়ে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, অতএব তাতে অন্য কোন সাহিত্যিক গুণ থাকতে পারে না, এরূপ অনুমান করা সঙ্গত হবে না। কেবল ধর্মাদি নিয়ে নিজ মতস্থাপন এবং পরমত খণ্ডন করলেও তাঁর রচনা কখনো কখনো সাহিত্যহিসাবে উপভোগ্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ "পাদরী ও

শিষ্যসংবাদ” নামক বিদ্রূপাত্মক রচনাটির উল্লেখ করা যেতে পারে খ্রীষ্টান মিশনারীরা যখন হিন্দুর দার্শনিক মত নিয়ে নানা কদর্থ শুরু করেছিলেন, তখন রামমোহন অন্যান্য লেখার সাথে এটি তাঁদের উপহার দেন ( অবশ্য ইংরেজী অনুবাদ সহ )। এই লেখার মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টীয় একেশ্বর বাদ ও ত্রিত্ববাদের দ্বন্দ্ব কেমন হাস্যকর ভাবে প্রকটিত হয়েছে, তা যিনি এটী পড়েন নি তাঁকে বোঝানো সম্ভব হবে না। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, রচনাটিতে খ্রীষ্টধর্মসম্বন্ধে রামমোহনের কোন অসংযত উক্তি নেই। তা থাকতেও পারে না, কারণ তিনি খ্রীষ্টের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন। মিশনারীদের একদেশদর্শিতাই তাঁকে ঐ ব্যঙ্গাত্মক রচনায় প্রবৃত্ত করেছিল। এই নাতিদীর্ঘ রচনাটি প'ড়ে মনে হয়, তিনি যদি বিশেষভাবে সাহিত্য-সেবায় আত্মনিযোগ করতেন, তবে একজন উঁচুদরের হাস্যরসিক ব'লে তার খ্যাতিলাভ হতে পারত তাঁর এ রচনাটিতে প্রচুর হাস্যরস বর্তমান। এ গুণ যে তাঁর বিতণ্ডামূলক রচনায়ও নিতান্ত দুর্ল ভ তা নয়। ব্রহ্মজ্ঞানীর পক্ষে জীবহিংসা ও মাংসভোজন গর্হিত মনে ক রে 'চারিপ্রশ্নে'র রচয়িতা আমিষাহারী রামমোহনকে যে নিন্দা করেছিলেন, তার উত্তরে মাংসভোজনের পক্ষে শাস্ত্রীয প্রমাণ উদ্ধার ক'রে তিনি লিখেছেন ( ১৮২২ ) ঃ—

> "মৎসরতা কি দারুণ দুঃখের কারণ হয়। লোকে কেন খায় কেন সুখে কালযাপন করে ইহাই মৎসরের মনে সর্ব্বদা উদয হইয়া তাহাকে ক্লেশ দেয। মাংস ভোজন শাস্ত্রে অভিহিত ইহা যদি না কহিতে পারে / অন্ততও লোকের নিন্দা করিবার উদ্দেশে কহিবেক যে নিবেদন করিয়া খায না / কিম্বা আচমনে অধিক জল কি অল্প জল লইয়াছিল। কিন্তু মৎসরের তুষ্টির নিমিত্তে কে আপন শাস্ত্র-বিহিত আহার ও প্রারব্ধ নির্ম্মিত ভোগ পরিত্যাগ করে / ইহাতে মৎসরের অদৃষ্টে যে দুঃখ তা কে নিবারণ করিতে পারিবেক ইতি।"

'চারি প্রশ্নে'র উত্তর পেয়ে প্রশ্নকর্তা খুশী হন নি। তিনি অচিরাৎ 'পা ষ ণ্ড পী ড় ন' নামে তার এক প্রত্যুত্তর ছাপলেন। এ বইয়ের ভাষা সম্বন্ধে পরে আলোচনা করব। নিজের প্রতি নিন্দা ব্যঙ্গ বিদ্রূপ ও

কটূক্তিতে পূর্ণ এই বইযের জবাবে রামমোহন 'প থ্য প্র দা ন' নামে এক বৃহৎ পুস্তক রচনা করেছিলেন ( ১৮২৩ )। কিন্তু এই বইতে কোন পাল্টা কটুক্তি ছিল না। এরূপ সদ্ব্যবহারের কৈফিৎ দিতে গিযে 'পথ্যপ্রদানে'র ভূমিকায রামমোহন লিখেছেন :—

"বালক ও পশ্বাদির হিতকরণে ও চিকিৎসা সময়ে তাহারা আস্ফালন ও চীৎকার এবং বিরুদ্ধ করিবার চেষ্টা যদি করে ও হিংসাতে প্রবৃত্ত হয় / তাহাতে ঐ অবোধ প্রাণির চীৎকারাদির পরিবর্ত্ত না করিযা / দযালু মনুষ্যেরা তাহাদের হিতেচ্ছা হইতে ক্ষান্ত হযেন না, সেইরূপ আমাদের হিতৈষার বিনিমযে ধর্ম্মসংহারকের বিরুদ্ধচেষ্টায ও দ্বেষ প্রকাশে আমরা রাগাপন্ন না হইযা / ঐ প্রত্যুত্তরের উত্তরে শাস্ত্রীয় উপদেশেব দ্বারা ততোধিক স্নেহ প্রকাশ করিতেছি।"

'বে দা ন্ত চ ন্দ্রি কা' র লেখক তাঁর গ্রন্থে রামমোহনের উদ্দেশ্যে যথেষ্ট ব্যঙ্গবিদ্রূপ ও দুর্বাক্য প্রযোগ করেছিলেন। তার উত্তরে রামমোহন 'ভ ট্টা চা র্য্যে র স হি ত বি চা র' নামে পুস্তক রচনা ( ১৮১৭ ) করেন। এই বইযের গোড়ায়ও তিনি পাল্টা দুর্বাক্য ব্যবহার না করার কৈফিযৎ দিযেছেন। তিনি লিখেছেন :—

"আমার দিগের সম্বন্ধে যে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ দুর্ব্বাক্য ভট্টাচার্য্য লিখিযাছেন তাহার উত্তর না দিবার কারণ আদৌ এই যে / পরমার্থ বিষযক বিচারে অসাধু ভাষা এবং দুর্ব্বাক্যকথন সর্ব্বথা অযুক্ত হয, দ্বিতীযতঃ আমারদিগের এমত রীতিও নহে যে দুর্ব্বাক্যকথন বলের দ্বারা লোকেতে জয়ি হই, অতএব ভট্টাচার্য্যের দুর্ব্বাক্যের উত্তর প্রদানে আমরা অপরাধি রহিলাম।"

উল্লিখিত দৃষ্টান্ত তিনটি থেকে রামমোহনের যে বচনচাতুর্য্য ও সূক্ষ্ম হাস্যরস সৃষ্টির পরিচয পাওয়া যাচ্ছে, তা কেবল উচ্চ শ্রেণীর সাহিত্য-স্রষ্টার রচনাতেই সুলভ। ফোর্ট উইলিয়ম গ্রন্থমালা'র লেখকবর্গের বা রামমোহনের সমসাময়িক অন্যান্য লেখকের রচনায় এই শ্রেণীর সাহিত্যিক ক্ষমতার নিদর্শন আছে ব'লে মনে হয় না। আর তা হয়ত থাকতেও পারে না; কারণ রামমোহনের সঙ্গে তাঁদের এক বিষয়ে বিষম প্রভেদ ছিল।

এই প্রভেদ হচ্ছে প্রেরণা সম্পর্কিত। 'ফোর্ট উইলিয়ম গ্রন্থমালা', 'বেদান্তচন্দ্রিকা' (১৮১৭) ও 'পাষণ্ডপীড়নে'র (১৮২৩) লেখকেরা লিখেছিলেন অর্থপ্রাপ্তির আশায়। তাই উচ্চাঙ্গের সাহিত্যিক গুণ দূরের কথা, গদ্যের প্রাঞ্জলতাও তেমন ভাবে তাঁদের রচনায় দেখা দেয় নি; আর, মুখ্যত সংস্কৃত, পারসী এবং ইংরেজী পুস্তক, বা সে সকলের বিষয় বস্তু, অথবা লোকপ্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের জীবন অবলম্বন ক'রে, তাঁরা যে সব বই রচনা করেছিলেন সেগুলো কোনও রকমে কাজ চালাবার মত ছিল। এই হ'ল তাঁদের সম্বন্ধে সর্বোচ্চ প্রশংসা।

রামমোহন রায় যে, গদ্য রচনা করেছিলেন তার পশ্চাতে ছিল মনন শক্তির এবং হৃদয়বৃত্তির সেই প্রবল প্রেরণা, যার তাগিদে মানুষ ব্যক্তিগত সুখস্বাচ্ছন্দ্য অনায়াসে বিসর্জন দিয়ে, সমসাময়িক ব্যক্তিবর্গের এবং ভবিষ্যৎ পুরুষদের মঙ্গল চিন্তা করে। এই আন্তরিক প্রেরণার ফলেই তাঁর প্রকাশভঙ্গী যথাসম্ভব সরল, সরস ও কৃত্রিমতাবর্জিত হতে পেরেছিল। এই প্রকাশ পদ্ধতির অন্যতম গুণ ছিল এক অসাধারণ ভব্যতা। প্রতি-পক্ষেরা তাকে ও তাঁর মতকে হেয় প্রতিপন্ন করবার জন্যে, স্থানে স্থানে তাঁর প্রতি যে অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করেছেন, রামমোহন তার জবাবে কুৎসিত ভাষা দূরের কথা, অসংযত উক্তি পর্যন্ত করেন নি। সাহিত্যে এ শিষ্টতার আদর্শ স্থাপনও রামমোহনের গদ্যরীতির অন্যতম দান। প্রাচীন ও আধুনিক বহু সাহিত্যের সঙ্গে সুপরিচিত থাকার ফলে রামমোহন যে, বাংলা গদ্যকে তার ধ্রুব আদর্শটি দান করতে পেরেছিলেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই; কিন্তু নানা গুণসত্ত্বেও তাঁর লেখায় স্থানে স্থানে যে দুর্বোধ্যতা নেই তা নয়, কিন্তু সে দুর্বোধ্যতা ঘটেছে বিষয়ের দুরূহত্বের জন্যে। স্থানবিশেষে তিনি সংস্কৃত শব্দ ও বাগ্‌বিন্যাসের বৈশিষ্ট্যকে তাঁর রচনায় স্থান দিয়েও বক্তব্য বিষয়কে দুর্বোধ্য করেছেন, কিন্তু এ সকল তাঁর জ্ঞাতসারেই ঘটেছে; এর কৈফিয়ৎ দিতে গিয়ে তিনি লিখেছেন :—

"বেদান্তশাস্ত্রের ভাষাতে বিবরণ করাতে সংস্কৃতের শব্দ সকল স্থানে স্থানে দিয়া গিয়াছে / ইহার দোষ যাঁহারা ভাষা এবং সংস্কৃত

জানেন তাঁহারা লইবেন না / কারণ বিচারযোগ্য বাক্য বিনা সংস্কৃত-শব্দের দ্বারা কেবল স্বদেশীয় ভাষাতে বিবরণ করা যায় না।"

রামমোহনের রচনার স্থানে স্থানে দুরূহত্ব থাকলেও তাহা দ্বারা বাংলা সাহিত্যের উন্নতিসাধনের কাজ ব্যাহত হয় নি। ধর্ম্ম ও সমাজসংস্কারের যে প্রবল আন্দোলন এবং উৎসাহ তিনি দেশ-মধ্যে সৃষ্টি করেছিলেন, তাই তাঁর প্রবর্ত্তিত গদ্য রচনার আদর্শকে বহন ক'রে চলেছিল। এবং যে সকল প্রতিষ্ঠান বা জনমণ্ডলীর দ্বারা রামমোহনের গদ্য রীতির আদর্শ প্রসারলাভ করতে পেরেছিল, তাদের মধ্যে স্কুলবুক সোসাইটির নাম উল্লেখযোগ্য। তার পরে উল্লিখিত হওয়া উচিত বিবিধ সংবাদ পত্রের সম্পাদক ও লেখকের কৃতিত্ব।

# পরিশিষ্ট

## রামমোহন রায় ও মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার

আজকালকার কোনো কোনো লেখক স্বীকার করতে প্রস্তুত নন যে, বাংলা গদ্যরীতির ক্রমবিকাশে রামমোহন রায়ের বিশেষ প্রভাব ছিল। এঁদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং বিশিষ্ট সাহিত্যিক শ্রেণীর দু'এক জন আছেন ব'লে এ ভিত্তিহীন মতেরও উপযুক্ত সমালোচনার দরকার আছে। এ নূতন ঐতিহাসিকের দল বলতে চান যে কেরী, মৃত্যুঞ্জয়, বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিম প্রধানত এ চার জনের ক্ষমতায় এবং পরিশ্রমে আধুনিক বাংলা গদ্যের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। এ বই যাঁরা গোড়া থেকে মন দিয়ে পড়বেন তাঁরাই দেখবেন যে এরূপ ধারণা কত ভ্রমাত্মক। কেরীর কৃত বাইবেলের বঙ্গানুবাদকে কিছুতেই আজকালকার বাংলা

গদ্যের পূর্বপুরুষ বলা চলে না ১। রাম রাম বসু কেরীর আদেশে যে 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' রচনা করেছিলেন তারও প্রথম পাণ্ডুলিপি রামমোহনকে দেখিয়ে নেওয়া হয়েছিল ২। এ সকলের পরে বই লেখেন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার। বাংলা গদ্যে এঁর প্রভাব নগণ্য নয় একথা ঠিক, কিন্তু এ সত্ত্বেও রামমোহন বাংলা গদ্যকে যে বিশেষ প্রভাবে প্রভাবিত করেন নি তা সত্যি নয়। পূর্বেই দেখানো হয়েছে যে ফোর্ট উইলিয়ম গ্রন্থমালা মোটেই জনসাধারণের মধ্যে সুপ্রচারিত ছিল না ৩। অতএব বাংলা গদ্যের বিকাশের উপর এ গ্রন্থমালা বা মৃত্যুঞ্জয়ের প্রভাব নিতান্ত দুর্নিরীক্ষ্য। রামমোহন রায়ের লেখা গ্রন্থনিচয় থেকেই বাংলা গদ্য সর্ব-সাধারণের মধ্যে বিশেষ প্রচার লাভ করেছিল। এ সম্বন্ধে পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্নও লিখে গেছেন :—

> "পৌত্তলিকদিগের ধর্ম্মপ্রণালী', 'বেদান্তের অনুবাদ', 'কঠোপনিষদ্', 'বাজসনেয় সংহিতোপনিষদ্', 'মাণ্ডুক্যোপনিষদ্', 'পথ্যপ্রদান' প্রভৃতি যে কয়েকখানি বাঙ্গালা পুস্তক দেখিতে পাওয়া যায় তৎসমস্তই শাস্ত্রীয় গ্রন্থের অনুবাদ ও পৌত্তলিকমতাবলম্বী প্রাচীন ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের সহিত বিচার। ঐসকল বিচারে তিনি নিজের নানা শাস্ত্রবিষয়ক প্রগাঢ় বিদ্যা বুদ্ধি, তর্কশক্তি, শাস্ত্রের সারগ্রাহিতা, বিনয় গাম্ভীর্য্য প্রভৃতি ভূরি ভূরি সদ্‌গুণের একশেষ প্রদর্শন করিয়াছেন। নিবিষ্টচিত্তে সে সকল অধ্যয়ন করিলে চমৎকৃত ও তাঁহার প্রতি ভক্তি-রসে আপ্লুত হইতে হয়। সে সকল ধর্ম্মসম্পৃক্ত বিষয় এ স্থলে উদ্ধৃত করিয়া পাঠকগণকে প্রদর্শন করান আমাদিগের অভিমত নহে, ইচ্ছা হইলে তাঁহারা সেই সকল গ্রন্থ পাঠ করিয়া দেখিতে পারিবেন। যাহা হউক ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, রামমোহন রায়ের সময়েই তাঁহার রচিত উল্লিখিতরূপ গ্রন্থসকল এবং তদুত্তরে পৌত্তলিক মতাবলম্বী ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের রচিত গ্রন্থ ও পত্রিকা সকলের

---

১। দ্রষ্টব্য পৃঃ ২৫-২৬

২। দ্রঃ পৃঃ ২৭-২৮

৩। দ্রঃ পৃঃ ৩৮-৩৯

দ্বারাই বিশুদ্ধ ভাবে বাংলা গদ্য রচনার রীতি প্রথম প্রবর্তিত হইয়াছিল ৪।”

রামমোহনের মৃত্যুর মাত্র চল্লিশ বৎসর পরে রামগতি ন্যায়রত্ন এ মত প্রকাশ করেন। কাজেই এ বিষয়ে তাঁর ভুল হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। আর তিনি ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ছিলেন না, তাই এ বিষয়ে তাঁর উক্তিকে অপক্ষপাতমূলক সত্য হিসাবে গ্রহণ করলে দোষ হয় না। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের নামে প্রচলিত ‘প্রবোধচন্দ্রিকা’ সম্বন্ধে রামগতি ন্যায়রত্ন যা বলেন তাও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। তিনি বলেন৫ :—

* * * প্রবোধচন্দ্রিকা কোনরূপে উৎকৃষ্টগ্রন্থ মধ্যে গণ্য হইতে পারে না। এ গ্রন্থে উপদেশজনক ভূরি ভূরি কথার সমাবেশ আছে, সত্য বটে কিন্তু গ্রন্থকর্ত্তার সম্যক্ সহৃদয়তার অভাবে সে সকল সুশৃঙ্খলরূপে সম্বদ্ধ হয় নাই। * * * * তদ্ভিন্ন ইহার ভাষাও নিতান্ত বিশৃঙ্খল ও অত্যন্ত নীরস। কোন স্থল দীর্ঘ দীর্ঘ সমাস-সমন্বিত এবং নিতান্ত অপ্রচলিত শব্দদ্বারা গ্রথিত, কোন স্থল বা একান্ত অপভ্রংশ পদদ্বারা বিরচিত। কোন কোন স্থানের বাক্যের দীর্ঘতা ও বিশৃঙ্খলতা জন্য অর্থবোধই হইয়া উঠে না” ৬।

বস্তুত বাংলা গদ্য রচনার মধ্য থেকে যে, ভাষাগত বিশৃঙ্খলা এবং দুর্বোধ্যতা দূর হ'ল তার প্রধান কারণ রামমোহন রায়ের লিখিত গদ্য। রামমোহন কোন বিশুদ্ধ সাহিত্যিক রচনা রেখে যান নি বটে কিন্তু পরবর্ত্তী কালের গদ্য যে, সাহিত্য রচনার যোগ্যতা লাভ করেছিল তার মূলে ছিল তাঁর প্রবর্তিত আদর্শ। বাংলা গদ্যের দ্বিতীয় যুগে বা তত্ত্ববোধিনী যুগে যাঁদের হাতে গদ্য রচনারীতি সমৃদ্ধ হ'ল, তাঁদের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমার প্রভৃতির উপর রামমোহন রায়ের প্রভাব খুব সহজেই বোধগম্য হবে। আর, যে বিদ্যাসাগরের উপর মৃত্যুঞ্জয়ের প্রভাব পড়েছিল তিনিও যে শেষ পর্য্যন্ত মৃত্যুঞ্জয়ের দীর্ঘসমাস এবং অমিশ্র সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার

---

৪। দ্রঃ পৃঃ ৩৮-৪০

৫। বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব (১ম সং) পৃঃ ২০৯-২১০।

৬ বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব পৃঃ ২০৫-২০৬।

কমিয়ে এনেছিলেন, তার কারণ ছিল রামমোহনের পন্থা অনুসরণকারীদের রচনার প্রভাব ৭। কিন্তু মৃত্যুঞ্জয়ের প্রভাব বিদ্যাসাগরের সঙ্গেই লোপ পায় নি। দীর্ঘ সমাসের ও সংস্কৃতপ্রাচুর্যের মোহ বঙ্কিমচন্দ্রকেও পেয়ে বসেছিল, কিন্তু, প্যারীচাঁদ মিত্রের প্রভাবে তিনি এ মোহ বহুল পরিমাণে কাটাতে পেরেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের ও বিদ্যাসাগরের প্রবন্ধের ভাষার তুলনা করলেই একথা সহজে বোঝা যাবে। বঙ্কিমের গদ্যের আদর্শ যে তারাশঙ্কর ও ভূদেব এবং প্যারীচাঁদের রচনা, এসকল কথা পরে দেখানো যাবে ৮। বস্তুত বঙ্কিমের কালেই মৃত্যুঞ্জয়ের প্রভাব লোপ পেয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর যুগে যে গদ্য লিখেছেন তার উপর তাঁর পিতার রচনার প্রভাব খুবই বেশী। এ সত্ত্বেও তিনি যে কেবল বিদ্যাসাগরকেই বাংলা গদ্যের পরিপোষক হিসাবে জয়মাল্য অর্পণ করেছেন তার কারণ মনে হয়, তাঁর নিজ পিতৃদেব সম্বন্ধে প্রশংসা বিস্তারের কুণ্ঠা। দেবেন্দ্রনাথ তো সাহিত্যিক ছিলেন না, তাই পাছে কেউ মনে ভাবে যে নিজ পিতা বলেই দেবেন্দ্রনাথকে গদ্য রচনার যশ অর্পণ করছেন সেই জন্তে তিনি এবিষয়ে কিছু বলেন নি। তাঁর পিতার সহকর্মী অক্ষয়কুমার সম্বন্ধে নীরবতার কারণও মনে হয় তাই। কিন্তু রামমোহনের সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে প্রশংসায় রবীন্দ্রনাথের এরূপ কোন সঙ্কোচ ছিল না। রামগতি ন্যায়রত্নের, এবং সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাসাগর, ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির উক্তি থেকে জানতে পারা যায় যে সমসাময়িক বিরোধীদের অস্তিত্বসত্ত্বেও সকল সম্প্রদায়ের শিক্ষিত সজ্জনদের দ্বারা রামমোহন বিদ্যাবুদ্ধি ও সহৃদয়তা আদি কিরূপ প্রশংসিত ও সমাদৃত ছিল। তাই, দেবেন্দ্রনাথ রামমোহনকে গুরু-স্থানীয় মনে করলেও রবীন্দ্রনাথ নিঃসঙ্কোচে বলেছেন:—"নব্যবঙ্গের সৃষ্টিকর্তা রাজা রামমোহন রায়ই বাংলাদেশে গদ্য-সাহিত্যের ভূমি পত্তন

---

৭। ১৩শ অধ্যায়ের পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

৮। একালের একদল লোক মৃত্যুঞ্জয়কে দিক্‌পালস্থানীয় গদ্যলেখক মনে করলেও ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগে লোকের এরূপ ধারণা ছিল না। স্বয়ং বিদ্যাসাগর তাঁর বাঙ্গলার ইতিহাস ২য় ভাগের পরবর্তী সংস্করণগুলিতে বাংলা সাহিত্যের সেবক হিসাবে মৃত্যুঞ্জয়ের নাম একেবারে বাদ দেন। (দ্রঃ বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলী)

করিয়াছেন।”·· এরূপ কথাকে ভুল বুঝে কেউ কেউ রবীন্দ্রনাথের প্রতি কঠোর বাক্য লিপিবদ্ধ করেছেন। তাঁদের মতে রবীন্দ্রনাথের উক্তির অর্থ এই যে রামমোহন সাহিত্য রচনায় হাত দিয়েছিলেন, কিন্তু সাহিত্য রচনা না ক'রেও সাহিত্যের ভুমি পত্তন করা সম্ভব। কারণ পরবর্ত্তীকালে যে গদ্যে সাহিত্য রচিত হয়েছিল তার গোড়ায় রয়েছে রামমোহনেরই প্রবর্তিত গদ্যের আদর্শ। রবীন্দ্রনাথ একথাই বলতে চেয়েছেন এবং একথাই ইতিহাস-সঙ্গত।

# ষষ্ঠ অধ্যায়

## (খ) স্কুলপাঠ্য ও অন্যান্য পুস্তক ( ১৮১৭—১৮২৯ )

১৮১৭ সালের মাঝামাঝিতে বাংলাভাষার বিদ্যার্থীদের পাঠ্যপুস্তক রচনার জন্যে যে **কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটি** ( Calcutta School Book Society) প্রতিষ্ঠিত হয়, বাংলা গদ্য প্রচারের কাজে তা বিশেষ সাহায্য করেছে। বাংলা গদ্যের উন্নতিসাধনও এ সোসাইটীর দ্বারা কিয়ৎপরিমাণে সাধিত হয়েছে। স্কুলবুক সোসাইটি স্থাপনের কিছু পর থেকে খ্রীষ্টান প্রচারকগণ এবং এদেশীয় কোন কোন শিক্ষিত ব্যক্তি, বিদ্যার্থীমণ্ডলের ও সাধারণ পাঠকদের জন্যে পুস্তক প্রণয়ণে হাত দেন। এঁদের সকলের কাজই একসঙ্গে বিবেচিত হওয়ার যোগ্য। বাংলা গদ্যকে প্রতিষ্ঠিত এবং পরিপুষ্ট করার ব্যাপারে তাঁদের সকলেরই কৃতিত্ব প্রায় এক শ্রেণীর।

লেখকবর্গের মধ্যে **রামজয় তর্কালঙ্কার** কৃত 'সাংখ্য প্রবচন ভাষ্যে'র অনুবাদ (১৮১৮) সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। সংস্কৃত দার্শনিক গ্রন্থের অনুবাদ হিসাবে এর গদ্য নিন্দনীয় নয়। নিচে এর কিঞ্চিৎ নমুনা উদ্ধৃত করা গেল :—

"দুঃখের অত্যন্তনিবৃত্তির নাম মোক্ষ ইহা পূর্ব্বে কহা হইয়াছে / তৎপ্রযুক্ত এস্থলে বদ্ধ শব্দের অর্থ দুঃখসংযোগই / সেই দুঃখসংযোগ পুরুষেতে স্বাভাবিক নহে / স্বাভাবিকত্বের লক্ষণ পশ্চাৎ করা যাইবে / যেহেতুক স্বভাবতো বদ্ধ ব্যক্তির মোক্ষের নিমিত্ত বেদবিহিত উষ্ম গুণ হইতে অগ্নির কি কখনো মোক্ষ সম্ভব হয় / যে দ্রব্যে যে স্বাভাবিক গুণ সে দ্রব্য যে পর্য্যন্ত থাকে তৎপর্য্যন্ত সে গুণ তাহাতে অবশ্য থাকেই এই অর্থ। একথা ঈশ্বর গীতাতে কহিয়াছেন / আত্মা যদি স্বভাবতো মলিন অর্থাৎ রাগদ্বেষাদিযুক্ত হন এবং অস্বচ্ছ অর্থাৎ অনির্ম্মল হন

আর বিকারী অর্থাৎ পরিণামী হন তবে তাঁহার শত শত জন্মেতেও মুক্তি হইতে পারে না ইতি।"

রামজয়ের রচনার পরেই উল্লেখ করতে হয় স্কুলবুক সোসাইটির প্রকাশিত **তারাচাঁদ দত্ত** রচিত 'ম নো র ঞ্জ নে তি হা স' নামক (১৮১৯) পুস্তকের। এর ভাষার কিছু নমুনা তৃতীয় সংস্করণের (১৮২৮) বই থেকে দেওয়া যাচ্ছে। এ সংস্করণে ভাষার কোন পরিবর্তন করেছেন কিনা গ্রন্থকার সে সম্বন্ধে নীরব। যদি এ গদ্য ১৮১৯ সালেরই লেখা হয়ে থাকে তবে লেখকের খুবই প্রশংসা করতে হবে। আর ১৮২৮ সালের লেখা হিসাবেও এ গদ্য কিঞ্চিৎ প্রশংসার যোগ্য। 'অর্থের সদ্‌ব্যবহার' সম্বন্ধে গ্রন্থকার লিখেছেন :—

"যেমন গোময় একত্র রাশি হইলে দুর্গন্ধ হয়, কিন্তু জমিতে বিস্তার করিয়া দিলে সার বলা যায় ; ধনও সেইরূপ একত্র সঞ্চিত হইলে তদধিকারীকে কৃপণ কহে, কিন্তু লোকদের প্রয়োজনানুসারে ও আপনার সংস্থানানুসারে দান করিলে, তাহার দুর্ণাম ঘুচিয়া সে ব্যক্তি দাতা বিখ্যাত হয়।"

"কৃষাণ জমিতে বীজ ছড়ায়, তাহাতে বহুগুণ ফল হয় ; তদনুরূপ বিবেচনা ও সৌজন্য পূর্ব্বক দরিদ্র লোকের প্রতি ধন বিতরণ করিলে তাহাদের পরিতোষ ও আপনাদের সন্তোষ হয় ও ঈশ্বরের কৃপাপাত্র হয়, কেন না যে জন ঈশ্বরকে মানিয়া দরিদ্রকে দান করে সে ঈশ্বরকে ঋণ দেয়। অতএব সম্প্রতি ধনোপার্জ্জন করিয়া সদ্ব্যয় করা লোকত ধর্ম্মত সম্মত বটে।"

এ ভাষার সরলতা ও প্রাঞ্জলতা সহজেই চোখে পড়বে। বিজ্ঞান বা দর্শনের পুস্তক এরূপ সহজবোধ্য হবে আশা করা যায় না। এ সম্বন্ধে **ফিলিক্স কেরী** ( Felix Carey ১৭৮৬-১৮২২ ) লিখিত 'ব্য ব চ্ছে দ বি দ্যা' ( ১৮২০ ) নামক পুস্তকই প্রমাণ। তিনিই হলেন বাংলাভাষায় বিজ্ঞান আলোচনার প্রথম পথপ্রদর্শক। তাঁর পরিকল্পিত 'বি দ্যা হা রা-ব লী' ( বাংলা এন্‌সাইক্লোপিডিয়া ) গ্রন্থের প্রথম খণ্ড [ নরদেহ ] 'ব্যবচ্ছেদবিদ্যা', এন্‌সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা' ( Encyclopoedia

Britannica) গ্রন্থের পঞ্চম সংস্করণ থে:ক 'অ্যানাটমি' ( anatomy ) নামক প্রবন্ধের অনুবাদ। এ বইএর কটমট ভাষার কিছু নমুনা নিচে দেওয়া হ'ল।

"পৃষ্ঠের কণ্টাকৃতি প্রবর্দ্ধনযুক্ত ঐ মাংসপেশী উৰ্দ্ধস্থ কট্যাবর্ত্তকের এবং অধঃস্থ পৃষ্ঠাবর্ত্তকের কণ্টকাকৃতি প্রবর্দ্ধনেতে প্রবিষ্ট হয়। পৃষ্ঠের কণ্টক-প্রবর্দ্ধন প্রযুক্ত ঐ মাংসপেশী কশেরুকাবর্ত্তকাকে উত্তোলন করে।"

এ পুস্তকের রচনায় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের বেশ হাত ছিল। কারণ বইএর আখ্যাপত্র থেকে জানা যায় যে, দু'জন পণ্ডিত এ অনুবাদের কাজে নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন। কিন্তু অনুবাদের সহায়কগণের এবং খুব সম্ভব অনুবাদকর্তারও, আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে কোন প্রত্যক্ষ জ্ঞান না থাকায় অনুবাদের ভাষা অতি বিকট ও দুর্বোধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অবশ্য কোনও কঠিন বিষয়ে যাঁরা সর্বপ্রথমে হাত দেন, তাঁদের খুব সহজে সাফল্যলাভ করতে প্রায়শ দেখা যায় না। কিন্তু নূতন বিষয়বস্তুর জন্যে এ ভাষা খুব কটমট হয়ে পড়লেও, ফিলিক্স কেরীর বাংলা গদ্য অত দুর্বোধ্য ছিল না। নিচে তাঁর গ্রন্থের আরম্ভ থেকে কিয়দংশ উদ্ধৃত হল :—

"( ১ ) ঐ ব্যবচ্ছেদবিদ্যাভ্যাসকরণে সুগমার্থে চিকিৎসকেরা ব্যবচ্ছেদবিদ্যাকে দুই ভাগ করিয়াছেন। প্রথমতঃ [ আনাতোমি ] অর্থাৎ শরীর কোন দ্রব্য দ্বারা নির্ম্মিত এবং ঐ শরীরের প্রত্যেক অবয়ব কি প্রকার এবং কিসের দ্বারা সম্মিলিত। দ্বিতীয়তঃ [ ফিসিওলজি ] অর্থাৎ দৃশ্যাদৃশ্যবস্তুর সংযোগ বিদ্যা / ফলতঃ শরীরের মধ্যে যে ২ দ্রব্য আছে সে সকল কি প্রকার এবং কাহার দ্বারা চালিত হন তদ্বিদ্যা। শরীর ঘন এবং দ্রব বস্তুদ্বারা নির্ম্মিতপ্রযুক্ত ব্যবচ্ছেদকেরা ব্যবচ্ছেদবিদ্যাকে দ্বিধা করিয়াছেন ॥১॥ শরীর মধ্যে ঘনবস্তুর ব্যবচ্ছেদবিদ্যা। ॥২॥ দ্রববস্তুর ব্যবচ্ছেদবিদ্যা।"

**কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন** লিখিত 'ভা ষা প রি চ্ছে দে র' অনুবাদের

( ১৮২১ ) গদ্য যে এর চেয়ে প্রাঞ্জল বা সুখবোধ্য তা নয়। নিচে তার কিছু নমুনা দেওয়া যাচ্ছে :—

"কোন চিরপ্রবাসি যুবতিপতি যুবকের প্রতি / তাহার স্বগৃহ হইতে আগত কোন বন্ধুজন / শিষ্ট প্রিয় ভৎর্সনা করিতেছেন। আমি দেখিলাম যে গৃহদ্বারে কোন কৃতি পুরুষের পুণ্য প্রকাশ হইতেছে তাহা শ্রবণ করুন ; লতামূলে হরিণ পরিহীন হিমকর, লীন হইয়াছে অর্থাৎ দ্বার অবলম্বন করিবার নিমিত্ত কিঞ্চিৎ উন্নত বাহুস্বরূপ কনক লতার মূলে বদনস্বরূপ নিষ্কলঙ্ক সুধাকর, বিলীন হইয়া আছেন এবং / কুবলয হইতে স্ফুরত্তারাকারা যে জলধারা তাহা পতিত হইতেছে অর্থাৎ নয়নস্বরূপ নীল ইন্দীবর হইতে উজ্জল তারার আকার যে জলধারা সকল তাহার পতন হইতেছে / এবং তিলকুসুমজন্মা পবন বন্ধুক পুষ্পের কম্পন জন্মাইতেছেন অর্থাৎ তিলকুসুমস্বরূপ নাসিকা হইতে নির্গত যে দীর্ঘতর নিঃশ্বাস তাহাতে বন্ধুক পুষ্পস্বরূপ অধরের কম্পন হইতেছে।

এই কাশীনাথ তর্কপঞ্চাননের রচিত মৌলিক গদ্য পুস্তক 'পাষণ্ড-পীড়নে'র ( ১৮২৩ ) ভাষাও এ শ্রেণীর পণ্ডিতী গদ্যের অন্যতম উদাহরণ। এ পুস্তক মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'বেদান্তচন্দ্রিকা'র ভাষার চেয়ে স্থানে স্থানে কম দুর্বোধ্য হলেও খুব সরল ছিল না। নিচে এর ভাষার কিঞ্চিৎ নমুনা দেখা গেল :—

"শূদ্রসম্পর্ক শব্দে, যাজকত্ব যজমানত্বাদিরূপ সম্বন্ধ, ধর্ম্মসংস্থাপনা-কাঙ্খিদিগের মধ্যে কে, শূদ্রযাজক এবং শূদ্রের সহিত ব্রাহ্মণের একাসনে উপবেশন পাপ শ্রবণে ব্রাহ্মণের বহুত্ব আপনার একত্ব প্রযুক্ত বিশিষ্ট শূদ্রেরা, আপনি পৃথক আসনে উপবিষ্ট হয়েন। অধিকন্তু শূদ্র যাজনাদি করণে যে সকল দোষ শ্রুতি আছে, সে তাবৎ অসৎশূদ্র অন্ত্যজাদিপর, যেহেতু চারিবর্ণ, চারিযুগেই প্রসিদ্ধ আছেন, তাঁহারদিগের ক্রিয়াকর্ম্ম, ষটকর্ম্মশালী ব্রাহ্মণ সকল চিরকাল করিয়া আসিতেছেন, এবং অদ্যাবধি সৎশূদ্রযাজী ও অসৎশূদ্রযাজী বিপ্রদিগের পরস্পর তুল্যরূপে মান্যমানকতা কুটুম্বতা ও আহার ব্যবহার সর্ব্বদেশেই

হইতেছে, কিন্তু অন্ত্যজযাজি ব্রাহ্মণের সহিত এতাদৃশ ব্যবহার বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ দূরে থাকুন, সৎশূদ্রেরাও করেন না, অতএব তাঁহারা কেবল অন্ত্যজবর্ণ যাজনদ্বারা পতিত ও অব্যবহার্য্য হইয়া সর্ব্বত্র আছেন, ইহা সর্ব্ববাদি সম্মত।"

'স মা চা র চ ন্দ্রি কা'র সম্পাদক **ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়** (১৭৮৭-১৮৪৮) রচিত পুস্তকসমূহের গদ্য অধিকাংশ স্থানে কাশীনাথের রচনার চেয়ে সহজবোধ্য ছিল। তাঁর 'ক লি কা তা ক ম লা ল য়' (১৮২৩) থেকে কিয়দংশ নিচে উদ্ধৃত করা গেল :--

"অনন্তর নগরবাসী কহিতেছেন / শুন ভাই বিবেচনায় বুঝিলাম তুমি লোক ভাল / রীতি উপদেশ করিবার উপযুক্ত পাত্র বট / বিজ্ঞের দিগের এই রীতি যে পাত্র বিবেচনা না করিয়া বিজ্ঞলোক দ্রব্যাদি কোন বস্তু অর্পণ করিবেক না / অতএব দ্রব্য যেমন তেমন পাত্র না হইলে অর্পিত দ্রব্যাদির হানি হয় / দেখ এই বিবেচনায় লোক তৈল প্রভৃতি জলীয় দ্রব্য মৃত্তিকার পাত্রে বা কাঁচ পাত্রে স্থাপিত করে / লৌহপাত্র ব্যতিরেকে অন্যপাত্রে পারা প্রভৃতি দ্রব্যাদি স্থাপন করে না, অতএব তুমি সুপাত্র তোমার প্রশ্নের উত্তর দ্বারা অবশ্যই যথার্থোপদেশ করিব।"

সেকালকার হিসাবে পণ্ডিতদের চেয়ে সহজবোধ্য গদ্য লিখলেও ভবানীচরণের রচনার মারাত্মক দোষ ছিল এর কুরুচিপ্রবণতা ও অশ্লীলতা। তাঁর 'ন ব বা বু বি লা স' ও 'ন ব বি বি বি লা স' পড়লে বুঝতে পারা যায় যে, বটতলার কুৎসিত সাহিত্যের উদ্ভব কোথায়। ভবানীচরণ নিম্ন শ্রেণীর পাঠকদের জন্য অপেক্ষাকৃত সহজবোধ্য ভাষায় লিখলেও তাঁর রচনার চেয়ে গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কারের 'স্ত্রী শি ক্ষা বি ধা য় কে' র (১৮২৪) ভাষা আরও প্রাঞ্জল এবং সুখবোধ্য। নিচে এ পুস্তকের কিয়দংশ উদ্ধার করা গেল :—

"এখনকার স্ত্রীগণের মধ্যে মুরশিদাবাদে রাণী ভবানী ছিলেন। তিনি বালককালে বিদ্যাশিক্ষা করিয়া আপন স্বামির মরণের পর রাজ্যের সকল বিষয়কর্ম্মের হিসাব উত্তমরূপে আপনি দেখিয়া ভালমন্দ

বিবেচনা করিতেন, ও ব্যবহারিক বিদ্যা সুন্দর জানিতেন। তিনি দানশীলা ও দয়াশীলা ও পুণ্যবতী ছিলেন, এবং তাঁহার বাটিতে আর আর যে স্ত্রীসকল আছেন তাঁহারাও লেখাপড়াতে নিপুণ, এবং আপন আপন রাজ্যের ও অন্য অন্য বিষয়ের লেখাপড়া করিতেন। ইহাতে ঐ রাণী ভবানীর এমত সুখ্যাতি যে তাহাকে জানে না এমন লোক বাঙ্গালায় প্রায় নাই।"

এ গ্রন্থের ভাষার নমুনা পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণের পুস্তক থেকে দেওয়া গেল। গ্রন্থকার এতে ভাষার কিছু বদল ক'রে ছিলেন কিনা জানা যায় না। তবে পরিবর্তন না হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। যেহেতু ভাষার পারিপাট্যের কথা সেকালের লোকের তেমন মনোযোগের বিষয় ছিল না। গতানুগতিকতাই ছিল তখন প্রবল। খ্রীষ্টান লেখকগণের মধ্যেও কেউ কেউ এরূপ গতানুগতিক ভাবে গদ্য লিখেছেন। ১৮২৬ সালে শ্রীরামপুর থেকে 'ভ্র ম প্র কা শ প ত্র' নামে একখানি খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারের পুস্তিকা ছাপা হয়েছিল। তার আদর্শ ছিল রামমোহনের গদ্য। এখানির বাগ্‌ভঙ্গি এবং তর্কপদ্ধতি উক্ত যুগপ্রবর্তক মহাপুরুষের রচনাভঙ্গীর কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। নিচে এ পুস্তিকা থেকে কিছু অংশ তুলে দেওয়া হ'ল :—

> "কিন্তু যদি বল শাস্ত্রে লিখিত আছে যে বিদ্যা মুক্তির পদ তবে কহি সদ্বিদ্যা উত্তমা বটে কেননা শুভাশুভ জ্ঞাত করায় / অতএব এই মাত্র মুক্তিপদের হিতকারিণী হন / কিন্তু মনের পরিবর্ত্তন করিতে পারেন না / এবং যে ২ শাস্ত্রদ্বারা তোমরা বিদ্যা অন্বেষণ করিতেছ সে ২ শাস্ত্রের উপদেশ যুক্তিরহিত ও পরস্পর বিরুদ্ধ / এবং দক্ষিণাদান প্রভৃতি কেবল লৌকিক কর্ম্ম পালনার্থে বিদ্যাসংগ্রহের তাৎপর্য্য দেখিতে পাই। ইহার প্রমাণ পুস্তক দ্বিতীয় ভাগে পাইবা। আরো পুরাণাদির উপদেশ যদি মুক্তির কারণ হয় এবং অহঙ্কার রাগ বাদানুবাদ ইত্যাদি যদি পাপ স্বীকার কর / তবে মহা ২ বিজ্ঞ লোকেরাও এই এই সকল ছাড়া নহেন / অতএব বিদ্যা দ্বারা কি প্রকারে মোক্ষপদ প্রাপ্ত হইবা।"

১৮২৮ সালে **নীলরত্ন হালদার** 'ব হু দ র্শ ন' নামক যে অনুবাদ-গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন, তার ভাষা ছিল সরল; নিচে এর গদ্যের দুটি নমুনা দেওয়া হইল :—

"যে দিন গত হইয়াছে সে একেবারেই গিয়াছে এবং যে দিন আসিবেক সে না আসিতে পাবে / কেবল বর্ত্তমান যে সময় ইহাই আমার দিগের বটে / অতএব যথাসাধ্য এই কালকে সার্থক করা কর্ত্তব্য।"

"যে কালে কাটো নামক মহাত্মার জীবনাবসান কাল নিকটাগত হইল / তখন তিনি আপনার স্বজনসকলকে এই স্নেহোক্তি প্রকাশ করিলেন যে / এক্ষণে আমার বৃদ্ধদশায় কেবল যে সকল পরোপকার করিয়াছি তাহারি স্মরণমাত্র সুখের কারণ হইয়াছে / এরং তাহারা যে মৎকর্তৃক সুখী ও স্বচ্ছন্দ দৃষ্ট হইতেছে ইহাতেই আমিই ঐরূপ সুখী ও স্বচ্ছন্দ হইতেছি।"

কিন্তু অনুবাদমূলক গ্রন্থের ভাষা যতই সরল হোক না কেন নীলরত্ন হালদার মহাশয়ের মৌলিক রচনা খুব সুন্দর বা সুবোধ্য ছিল না। তাঁর গ্রন্থের 'অনুষ্ঠান পত্র' থেকে নিম্নোল্লিখিত অংশ দেখলেই একথা বোঝা যাবে। তিনি লিখেছেন :—

"আদৌ আদ্যন্তরহিত স্বতঃপ্রতীত স্বগুণ নির্গুণ উভযোপাসক স্বীকৃত অদ্বৈত পরাৎপর বিঘ্নহরণ স্মরণ পুরঃসর গুণিগণ পরগুণ-কৃতাদরভর মহাশয়দিগের মহাশয়তার মহাশয়ে মহাশয়যুক্ত হইয়া নিবেদন / বহুকালাধি বহু ভাষায় বহুবিধ দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করণে বহুতর যত্ন ছিল যেহেতুক এক গ্রন্থে দৃষ্টিক্ষেপ করিলে বহুদর্শী হওনের সম্ভাবনা হয়।"

এ গদ্য থেকে মনে হয় রামমোহন রায়ের একজন অনুরাগী এবং সহকর্মী হয়েও নীলরত্ন উক্ত মহাপুরুষের প্রবর্তিত গদ্যরীতির দ্বারা সম্পূর্ণরূপে প্রভাবিত হন নি। অথচ তৎকালীন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের মধ্যেও কেউ কেউ রামমোহনের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন ব'লে মনে হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ **ভবানীচরণ তর্কভূষণের** নাম করা যায়। তাঁর রচিত

'জ্ঞা ন র স ত র ঙ্গি ণী' নামক পুস্তকের ( ১৮২৮ ) যে কয় পাতায় গদ্য ব্যবহৃত হয়েছে তার রচনারীতি বেশ সরল। নিচে এ গদ্যের কিছু নমুনা উদ্ধৃত হ'ল :—

'যদ্যপি ধ্যানযোগ মুক্তির কারণ হইযাছেন তথাপি ক্রিয়াযোগ ব্যতিরেকে ধ্যানযোগ হয় না একারণ প্রথমতঃ ক্রিয়া যোগ করিবেন।···

•দুর্লভ মনুষ্যদেহ প্রাপ্ত হইয়া পণ্ডিতব্যক্তি মোক্ষনিমিত্ত যোগাভ্যাস করিবেন। যোগ দ্বিবিধ। ক্রিযাযোগ এবং ধ্যানযোগ। তাঁহার মধ্যে ধ্যানযোগ প্রথমত অসাধ্য / এই হেতু ক্রিযাযোগ করিবেন। তিনি সকল কামনা প্রদান করেন। এবং ব্যক্তিবিশেষকে বিষ্ণুর পদ দিতে সমর্থ। তত্র আদৌ ব্রহ্মাদির জন্ম কহিতেছেন।···সৃষ্টির পূর্ব্বে মহাবিষ্ণু সিসৃক্ষু হইযা সৃষ্টিকর্ত্তা পালনকর্ত্তা সংহারকর্ত্তা এই ভেদে তিন মূর্ত্তি হইযা ছিলেন।"

খ্রীষ্টান মিশনারী সম্প্রদাযভুক্ত **পিয়ার্স** ( William Hopkins Pearce ১৭৯৪-১৮৪৪ ) কৃত 'প শ্বা ব লী' তেও ( ১৮২৮ ) বেশ সরল বাংলা গদ্য ব্যবহৃত হযেছে। এ পুস্তক **লসন** ( Lawson ) সংকলিত Animal Biographyর বঙ্গানুবাদ। নিচে এর কিঞ্চিৎ নমুনা দেওয়া হ'ল :—

"জর্ম্মণি দেশে জিমের্মান নামে একজন অধ্যাপক ছিলেন। তাঁহার বালকের সহিত আজন্ম পর্যন্ত এক বিড়ালের বড় প্রীতি ছিল, সেই বালক একসময় পীড়িত হইলে বিড়াল দিবারাত্রি তাহাকে কদাচ ত্যাগ করিত না ; আর ঐ বালক যখন মরিল, তখন তাহার কবর না হইলে বিড়াল তাহার শব কখন ছাড়িয়া দিল না ; পরে বালকের গোর হইলে বিড়াল বালককে না দেখিয়া শোকেতে ঘরের কোন গুপ্ত স্থানে গিয়া আহার না করিয়া প্রাণত্যাগ করিল।"

# সপ্তম অধ্যায়

## ( গ ) সংবাদপত্র ( ১৮১৮—১৮২৯ )

বিবিধ সংস্কার আন্দোলন আরম্ভ ক'রে রামমোহন বাংলা গদ্যের উন্নতিতে যে বেগ সঞ্চার করেছিলেন, সাপ্তাহিক পত্রের প্রচলন সে বেগকে বিশেষ ভাবে বাড়িয়ে ছিল। স্কুলবুক সোসাইটি ও অন্যান্য প্রকাশকের ছাপা পুস্তকের চেয়ে, সাময়িক পত্রগুলির কৃতিত্ব এ দিক দিয়ে অনেক বেশি। ছাপা বইগুলির মূল্যাধিক্য অথবা বিষয়বস্তুর আপেক্ষিক দুরূহত্বের জন্যে প্রচার খানিকটা সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু সাময়িক পত্রগুলি কম দামের হওযায় এবং সে সকলে চিত্তাকর্ষক সংবাদাদি থাকায, পাঠকদের মধ্যে তাদের প্রচার কিছু বেশি করেই হয়েছিল। সেই জন্যে বাংলা গদ্যের প্রচারে ও সংস্কারে এ সকল পত্র-পত্রিকার দান বিশেষ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণীয়।

গোড়ার দিকে প্রকাশিত বাংলা সংবাদ পত্রের মধ্যে সবাগ্রে উল্লেখ-যোগ্য পত্র হচ্ছে ( সাপ্তাহিক ) 'স মা চা র দ র্প ণ' ( প্রথম পর্য্যায় ১৮১৮ )। এর সম্পাদক ছিলেন (**মার্শম্যান** John Clark Marshman ১৭৯৪-১৮৭৭ )। কিন্তু মার্শম্যান সম্পাদক হলেও সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের সাহায্যে সে কাগজ প্রকাশিত হ'ত। কিন্তু এ সাহায্যের অর্থ এ নয় যে, সাহেব নামে মাত্র সম্পাদক ছিলেন এবং পণ্ডিতরাই সব কাজ করিতেন। মনে হয় কেবল সংবাদ লেখাতেই পণ্ডিতদের সাহায্য বেশির ভাগে নেওয়া হ'ত, কারণ সংবাদের ভাষাই মাঝে মাঝে সংস্কৃত রীতির অন্ধ অনুকরণের জন্যে উৎকট হ'য়ে উঠেছে। আর নানা বিষয়ের যে সকল চিত্তাকর্ষক পাবন্দূর্ণা]থ্যবন সমাচার দর্পণে' প্রকাশিত হ'ত, সে সকল যে মূলত— মার্শম্যান আদির স্বচরিত তাতে সংশয় করার কোন হেতু নেই। কারণ সেগুলি পণ্ডিতী ভাষার বাগড়ম্বর থেকে বহুলপরিমাণে বিমুক্ত। যেমন ১৮১৮ সালের 'সমাচার দর্পণে' ক্রুসেড্ ( Crusade ) সম্বন্ধে যে নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল তাতে আছে :—

"পূর্ব্বকালে লোকেরা যিরূশালমস্থিত খ্রীষ্টের কবর মহাতীর্থ জ্ঞান করিয়া মানিত এবং অনেক অনেক যাত্রিক লোক সেখানে যাইত। আমরা যে কীর্ত্তির বিষয় কহিব/ তাহার কতক বৎসর পূর্ব্বে যিরূশালম নগর মুসলমানেরদের হস্তগত হয় ও তাহারা খ্রীষ্টিয়ান যাত্রিকের দিগকে অনেক দুঃখ দেয়/ পিতর নামে বানপ্রস্থ ব্যক্তি ঐ কবর দর্শন করিতে গিয়া খ্রীষ্টিয়ানদের নানা দুঃখ দেখিলে তাহার মনে ধর্ম্মোদ্বেগ উপস্থিত হয; এবং সে পুনর্ব্বার ইউরোপে আসিয়া এই সম্বাদ পাপাকে কহিল ও পাপাকে এই অনুরোধ করিল, যে তোমার যদি ইচ্ছা হয়, তবে আমি সর্ব্বত্র ইউরোপে ভ্রমণ করিয়া সকলকে প্রবৃত্ত করাই যে তাহারা ঐ ধর্ম্মনগর মুসলমানেরদের হস্ত হইতে উদ্ধার করে। পাপা ইহাতে অতিশয় সম্মত হইল এবং ঐ কর্ম্মে যে যে যাইবে তাহাদের সকল পাপ মোচন অঙ্গীকার করিল। এই অঙ্গীকার পাইয়া পিতর সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিল ও যাত্রিকেরদের নানা দুঃখ সকল লোককে জানাইল, এবং সকল লোকের মনে তাহারদের দুঃখ দায়কেরদের প্রতি ক্রোধ করাইল এবং তাহার উপদেশেতে এই হইল ফল যে তাবৎ ইউরোপস্থ লোকেরদের মন সেই অবিশ্বাসী মুসলমানেরদের হস্ত হইতে সেই ধর্ম্মকবর উদ্ধার করিবার নিমিত্ত জ্বলিয়া উঠিল।"

উল্লিখিত অংশের ভাষা রামমোহনের ভাষার সঙ্গে তুলনীয়। আর এর সঙ্গে ১৮১৯ সালের 'সমাচার দর্পণে' প্রকাশিত নিচে উদ্ধৃত সংবাদটি পাঠ করলেই পণ্ডিতী রচনার উৎকট বিশেষত্ব ধরা পড়বে।

"মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্য নানা শাস্ত্রীয় বিদ্যোপার্জ্জন করিয়াছিলেন ও উপার্জ্জনানুসারে বিদ্যাবিতরণ করিয়াছেন এবং মোং কলিকাতায় কোম্পানির কলেজের আরম্ভাবধি তাহার প্রধান পাণ্ডিত্য কর্ম্ম পাইয়া অনেক বিশিষ্ট সন্তানেরদের অনৌপাধিক উপকার করত বহুকাল ক্ষেপণ করিয়াছিলেন এবং দুই তিন বৎসর হইল কালেজের পাণ্ডিত্যকর্ম্মেতে স্বসদৃশ পুত্রকে অভিষিক্ত করিয়া আপনি সুপ্রীমকোর্টের পাণ্ডিত্যকর্ম্ম করিতেছিলেন/ পরে সাআটম

হইল সুপ্রীমকোর্টের সাহেবেরদের নিকট বিদায় হইয়া তীর্থ দর্শনার্থ গিয়া কাশী প্রয়াগ গয়া প্রভৃতি তীর্থ দর্শন করিয়া বাটী আসিতে ছিলেন / পথে মোং মুরশিদাবাদের নিকটে গঙ্গাতীরে জ্ঞানপূর্ব্বক পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন।"

এ সংবাদটির মত আড়ম্বরপূর্ণ ভাষা যে, সব ক্ষেত্রেই লেখা হ'ত তা নয়। যে সকল ক্ষেত্রে সম্পাদকের সহকারী পণ্ডিতবর্গের ভাবাবেগ উদ্রেক করার মত খবর থাকত, সে সব জায়গায়ই তাঁরা প্রাচীন গৌড়ীয়দের স্বভাবসিদ্ধ উৎকট রীতি আমদানী করতেন। তাঁদের এ অভ্যাস বহুকাল যাবৎ বর্তমান ছিল। ১৮৩৭ সালের 'সমাচার দর্পণে' নীলমণি হালদারের পরলোক গমনের যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল, তা'ও এ জাতীয় ভাষায় রচিত। নিচে এ সংবাদটি উদ্ধৃত হ'ল :—

"আমরা অপারপরিতাপপযোধিপয়ঃপ্রবাহে পতিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে এতন্নগর নিবাসি যশোরাশি বৈকুণ্ঠবাসি কীর্ত্তিশশি পবিত্র-চরিত্র ভগবদভক্তাগ্রগণ্য সুশীল ভুবনমান্য পুণ্যশীল্য বিবিধ-বিদ্যাবিশারদ দান্ত শান্ত নরবর ৺বাবু নীলমণি হালদার মহাশয় গত ২৪ শ্রাবণ সোমবাসরে স্বজন স্বজনাদি পুত্র পৌত্র সমীপে শ্রীশ্রী৺পতিতপাবনী ত্রৈলোক্যতারিণী তপনতনয়তাপিনী ত্রিদশ-তরঙ্গিণীতীরে নীরে সজ্ঞানে পরমপ্রেমানন্দান্তঃকরণে সরসরসনে মুক্তাননে অতিসকরুণ স্বরে ঈশ্বরের নামোচ্চারণপূর্ব্বক এতন্মায়াময় সংসার বিনিময় করত লোকান্তর যাত্রা কবিযাছেন ইতি।"

কিন্তু সুখের বিষয় এই যে, এ **বাণভট্ট** অনুকারী ভাষা সাময়িক পত্রের চাপেও ক্রমশ খানিকটে সংযত হয়ে গেল। প্রত্যেক খবর এরূপ ভাবে লিখতে গেলে যথেষ্ট প্রযত্ন এবং সময় দরকার ব'লেই হয়ত এ ভাষা তেমন ক'রে চলে নি। অবশ্য গোড়ার থেকেই বেশ সরলভাবে রচিত সংবাদও নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল। যেমন ১৮২০ সালের 'সমাচার দর্পণে' নিচের সংবাদটি ছাপা হয়েছিল :—

"কলিকাতা শহরের খবরাদিতে যে সকল সাহেবেরা নিযুক্ত আছেন তাঁহারা অনুমান করিয়াছেন যে / কলিকাতায় অনেক অনেক

গভীর নরদামা আছে তাহাতে অন্য কোন দ্রব্য পড়িলে তাহা পচিয়া অত্যন্ত দুর্গন্ধ নির্গত হয় / তাহাতে লোকেরদের সতত রোগ জন্মে। অতএব সকল নরদামা বন্দ করিয়া কিঞ্চিৎ গভীর নরদমা করা যাউক।"

সংবাদ কখনো কখনো একরকম ভাষায় রচিত হলেও সাধারণ প্রকাশিত খবর হয়ত এর চেয়ে একটু ভারিক্কি চালে রচিত হ'ত। ১৮২৯ সালের 'সমাচার দর্পণে' প্রকাশিত খবরটিই বোধ হয় এ জাতীয় ভাষায় বহুল প্রচলিত নিদর্শন। নিচে এ খবরটির কিয়দংশ দেওয়া তুলে যাচ্ছে :—

"গত পাঁচ ছয় বৎসরের মধ্যে এদেশে ইংগ্লণ্ডীয় ভাষা ও বিদ্যা শিক্ষাকরণার্থে যে উদ্যোগ হইতেছে তাহা অত্যাশ্চর্য্য। ইহার পূর্ব্বে আমরা শুনিতাম যে ইংগ্লণ্ডীয় ভাষায় ছাত্রেরা যৎকিঞ্চিৎ পড়াশুনা করিয়া কেরাণিরদের পদপ্রাপণার্থে সেই ভাষা শিক্ষা করিত / কিন্তু আমরা এখন অত্যাশ্চর্য্য দেখিতেছি যে এত দ্দশীয় বালকেরা ইংগ্লণ্ডীয় অতিশয় কঠিন পুস্তক ও গূঢ় বিদ্যা আক্রমণ করিতে সাহসিক হইয়াছে / এবং ভাষার মধ্যে যাহা অতিশয় দুঃশিক্ষণীয় তাহা আপনারদের অধিকারে আনিয়াছে / অল্প দিনের মধ্যে হিন্দুকলেজের বিদ্যার্থিরা ও শ্রীযুত রামমোহন রায় ও শ্রীযুত জগমোহন বসুর পাঠশালার ছাত্রেরা ইংগ্লণ্ডীয় সাহেবেরদের নিকটে ইংগ্লণ্ডীয় ভাষার উত্তম পরীক্ষা দিয়াছে।"

এ সংবাদটিতে যে 'গূঢ়বিদ্যা আক্রমণ করিতে সাহসিক হইয়াছে' ইত্যাদির মত ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে তা ইংরেজীর অনুবাদ ব'লে মনে হয়। সংবাদ বর্ণনার ব্যাপার হয়ত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের একচেটে ছিল না; সাহেব সম্পাদকও তাতে হস্তক্ষেপ করতেন এবং অংশত তাদের হস্তক্ষেপের ফলেই পণ্ডিতী গদ্যরীতি বাংলা সাহিত্যকে ভারগ্রস্ত করতে গিয়ে বাধা পেয়েছে। এ বাধাদান কার্যে রামমোহন রায়েরও প্রত্যক্ষ কৃতিত্ব আছে। তাঁর প্রচারিত 'ব্রাহ্মণ সেবধি' (১৮২১) পত্রের ভাষার যে নমুনা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে, তাও বেশ সরল ভাষায় রচিত। তাঁর

পৃষ্ঠপোষিত 'সং বা দ কৌ মু দী' (১৮২১) পত্রিকাও এ রকম সহজবোধ্য ভাষায় লিখিত হ'ত। এতে প্রকাশিত সংবাদের একটি নমুনা নিচে দেওয়া হ'ল :—

> "শুনা গেল যে সংপ্রতি জেলা বর্দ্ধমানের অন্তঃপাতি হরিপুর গ্রাম নিবাসি রামমোহন বসু নামক এক কায়স্থের পুত্রের বিবাহ আতড়ি খড়শী গ্রামের মিত্রদের কন্যার সহিত হইয়াছিল / তাহাতে যে সকল বিশিষ্ট সন্তান বরযাত্র গিয়াছিলেন তাহার দিগের সহিত পরিহাসের কারণ / কন্যা যাত্রিকেরা হাঁড়ির মধ্যে হেলে ঢোঁড়া ও ঢেমা এই তিন প্রকার সর্প পরিপূর্ণ করিয়া এক গৃহ মধ্যে রাখিয়া / সেই গৃহে বরযাত্রির দিগকে বাসা দিয়া দ্বাররুদ্ধ পূর্ব্বক কৌশল ক্রমে ঐ সকল হাঁড়ি ভগ্ন করিলে তাহাতে এককালে সর্প বাহির হইয়া হিলিবিলি করিয়া ইতস্ততঃ পলায়নের পথ না পাইয়া ফোঁস ফোঁস করত বরযাত্রিকেরদিগের গাত্রে উঠিতে লাগিল···—"

এর রচনারীতি খুব উৎকৃষ্ট না হলেও ভাষা সহজবোধ্য এবং পণ্ডিতী গদ্যের মত আড়ম্বরপূর্ণ নয়। রামমোহনের বিরোধী পক্ষের মুখপত্র 'স মা চা র চ ন্দ্রি কা' র ( ১৮২২ ) ভাষা এর চেয়ে গুরুগম্ভীর হলেও তেমন দুর্বোধ্য ছিল না। এ পত্রিকার সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় গোড়ায় রামমোহনের 'সংবাদ কৌমুদী'র সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং অনেকটা সহজবোধ্য ভাবে লিখতে চেষ্টা করতেন। ১৮২৪ সালের 'সমাচার চন্দ্রিকা'য় 'সংবাদ কৌমুদী'র মত সহজবোধ্য গদ্যে, মিশরীয় মামী ( emblamed dead body ) সম্বন্ধে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। নিচে সেটি উদ্ধৃত হ'ল :—

> "ইংলণ্ডের সমাচার পত্রেতে জানা গেল যে মিসরদেশের এক পিরামিদ অর্থাৎ মন্দির হইতে এক সুগন্ধি নিক্ষিপ্ত শব পাওয়া গিয়াছে, অনুমান হয় সেই শব ফরওহ রাজবংশে এক স্ত্রীর শব হইবেক। এবং তাহার অঙ্ক দেখিয়া জানা গেল যে ঐ শব প্রায় তিন হাজার সাত শত বৎসর হইল। যে সিন্দুকে ঐ শব রাখিয়াছিল সে সিন্দুক অদ্যাপি আছে। ঐ সিন্দুকের পরিমাণে বোধ হয় যে

সে যুবতী ছিল / তাহার বর্ণ অদ্যাপি অবিকল আছে। ঐ সিন্দুকের মধ্যে একটা বিড়ালের শরীর ছিল / ইহাতে বোধ হয় যে ঐ বিড়ালের শরীরও তাহার কর্ত্রীর শরীরের ন্যায় সুগন্ধি নিক্ষিপ্ত করিয়া রাখিয়াছিল।"

সেকালকায় গোঁড়া হিন্দুদের পক্ষ সমর্থনকারী অপর কাগজ 'সং বা দ-তি মি র না শ কে' র ( ১৮২৩ ) ভাষা এর চেয়ে হয়ত একটু নিকৃষ্ট ছিল। এ কাগজে মাঝে মাঝে বেশ গুরুগম্ভীর আড়ম্বরপূর্ণ পণ্ডিতী চালের গদ্য লেখা হ'ত। যেমন ১৮২৮ এর 'সাংবাদতিমিরনাশক' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি সংবাদে আছে :—

বলীপলিত-কলেবর ধবলিতকুন্তলশেখর আসন্নসময়াসঙ্গকম্পিত সর্ব্বাঙ্গ বিগলিত দশনাবলীক প্রাচীন গৃহশূন্যজন্য মতিচ্ছন্নাবসন্ন কোন শিল্পবিদ্যাপন্ন ব্যক্তি পুনর্ব্বার বিবাহবাসনা নিতান্ত বিভ্রান্তবুদ্ধিপ্রযুক্ত তদ্বিষয়াসক্তচিত্ত হইয়া অন্তরঙ্গ নিকটে কোন প্রসঙ্গ না করিয়া তলে তলে ঘটক সহায়তাবলে কলে কৌশলে বার্দ্ধক্যকালে কুতূহলে কলিকাতার কলুটোলার কোন এক নিজ কুটুম্বের সপ্তমবর্ষীয়া কন্যার ভাবী যৌবন জনপদাধিকারকরণে বাঞ্ছিত হইয়া লাঞ্ছনা ভয়ে লুকাইয়া নির্ল্লজ্জ সুসজ্জ মাধুর্য্য বেশ ধারণ করিয়া বাসরাবসরে সন্ধ্যোত্তরে আনন্দভরে কন্যাকর্ত্তার ঘরে গমন করিতেছিলেন——"

কিন্তু এ সত্ত্বেও উক্ত সাপ্তাহিক খানির ভাষার অন্য যে কয়েকটি নমুনা পাওয়া গেছে তাতে মনে হয়, সমসাময়িক অন্য কাগজের চেয়ে এর ভাষা বেশি দুরূহ ছিল না। এ চারখানি প্রধান কাগজের ভাষা থেকে আন্দাজ করা যেতে পারে যে, তখনকার দিনে সংবাদ রচনার ভিতর দিয়ে বাংলা-গদ্য ক্রমশ উন্নতির পথেই চলেছিল। এ সকল কাগজে 'সাময়িক সংবাদ' ছাড়া অন্য জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বন্ধে যে সকল রচনা ছাপা হ'ত, তা'ও উক্ত অনুমানের পোষকতা করে।

১৮১৮ সালের 'সমাচার দর্পণে' প্রকাশিত 'ক্রুসেড, সম্বন্ধীয় প্রবন্ধের ভাষা আগেই দেখা গিয়েছে। রামমোহন রায়ের সংসৃষ্ট লোকদের দ্বারা লিখিত 'সংবাদ কৌমুদী'র প্রবন্ধগুলিও ঠিক এ রকমই সরল

ভাষায় রচিত ছিল। সে কাগজে ১৮২৩ সালে নিম্নলিখিত আখ্যানটি প্রকাশিত হয়েছিল :—

"গ্রীকদেশে একজন পণ্ডিত অবিরোধে কালযাপন করিতেন। এক সময় তিনি আপন মিত্রদিগের সহিত পথভ্রমণ করিতেছেন, ইত্যবকাশে এক ব্যক্তি গোঁয়ার আসিয়া তাঁহাকে পদাঘাত করিল। তাহাতে তিনি কিছুই উত্তর করিলেন না, ইহা দেখিয়া তাঁহার মিত্রেরা কহিল একি! আপনি ইহাকে যে কিছু কহিলেন না।" পণ্ডিত কহিলেন, যে যদি কোন ব্যক্তি গর্দ্দভের নিকট যায় এবং সেই গর্দ্দভ চাইট মারে তবে কি গর্দ্দভের নামে কেহ নালিশ করিয়া থাকে?"

১৮২৫ সালের 'সমাচার চন্দ্রিকা'য় কর্পূর সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল তার ভাষা বেশ প্রাঞ্জল ও অনাড়ম্বর। এর কিয়দংশ নিচে উদ্ধৃত হ'ল :—

"জাপান দেশে এক বৃহৎ বৃক্ষ হয়, তাহা হইতে কর্পূর জন্মে, ইংরাজীতে তাহার নাম ক্যাম্ফর। ঐ বৃক্ষের মূল ও কাষ্ঠ আর জল এক ভাটিতে ভরিয়া আতর চোয়াইবার মত দুই দিন ও রাত্রি অর্থাৎ ষোল প্রহর আঁচ দিলে সেই উত্তাপে খড়ের উপর কর্পূর জমে; উত্তম কর্পূর জলে ডোবে না ভাসিয়া থাকে, তাহার বর্ণ অতি শ্বেত হয়, অগ্নি দিলে বিলক্ষণ জ্বলে, কর্পূর তৈলে ও অলকোহলেতেও গলে, জলে গলে না।

কর্পূর খাইলে ধাতু রুক্ষ হয় এবং সমস্ত শরীরে অল্প ঘর্ম্ম হয় কিন্তু নাড়ী মৃদুগামিনী হয়, রোগী ব্যাকুল হইলে কর্পূর খাওয়াইলে উপকার করে, কর্পূর জ্বরে খাওয়ান যায়······।"

খুব সম্ভব এ রচনাটির এবং এ জাতীয় অন্যান্য রচনার উপাদান ইংরেজী থেকে গৃহীত হ'ত ব'লে (অনুবাদে মূলের অনিবার্য ছায়াপাতের জন্যে) এদের ভাষাকে গোঁড়া সংস্কৃতপন্থীদের ছাঁচে ফেলা সহজসাধ্য হ'ত না। সেজন্যেও হয়ত এ সকল লেখায় শব্দাড়ম্বর বা বাক্যের জটিলতা প্রায় অনুপস্থিত। এরূপ অনাড়ম্বর রচনা অল্পবিস্তর পরিবর্তিত হয়ে এ যুগের পরবর্তী পর্ব (১৮২৯-১৮৪৩) পর্যন্তও চলেছিল।

# অষ্টম অধ্যায়

## সাময়িক-পত্র পর্ব (১৮২৯—১৮৪৩)

### (ক) সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও দৈনিক পত্র

রামমোহন রায় ১৮৩৩ সালে দেহত্যাগ করলেও তাঁর প্রবর্তিত বাংলা গদ্যের যুগ আরো কয়েক বছর ধ'রে চলেছিল। ১৮৪৩ সালের আগে নবযুগের কোন সুস্পষ্ট লক্ষণ দেখা যায় নি। রামমোহন যুগের তৃতীয় বা শেষ পর্ব সুরু হ'ল খুব সম্ভব ১৮২৯ সাল থেকে। এর আগের পর্বে ধর্ম্ম, সমাজ ও শিক্ষা বিষয়ে সংস্কারের জন্য দেশময় যে নানা প্রকারের আন্দোলন চলছিল, তার ফলে জনসাধারণের মধ্যে হয়েছিল নূতন চেতনার সঞ্চার। সংবাদপত্র ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের (যেমন স্কুলবুক সোসাইটি এবং স্কুল সোসাইটির) চেষ্টায় দেশের মধ্যে বাংলা ভাষা চর্চার যে সামান্য বিস্তার হয়েছিল, তা'র দ্বারা এ চৈতন্যের একাংশ জনসাধারণের মধ্যে পাঠস্পৃহারূপে দেখা দিল। এ পাঠের আগ্রহ বিশেষভাবে বোঝা গেল সংবাদপত্রসমূহের জনপ্রিয়তায়। সংবাদ পাঠে জনসাধারণের আগ্রহ দেখে ভালো সংবাদপত্র পরিচালনার দিকে দেশের নেতৃস্থানীয় লোকদের মনোযোগ বিশেষভাবে আকৃষ্ট হ'ল। ১৮২৯ সালের ৫ই মে তারিখে রামমোহন রায়, **দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রসন্নকুমার ঠাকুর** প্রভৃতি মিলে বাংলা ইংরেজী আদি চার ভাষায় 'বেঙ্গল হেরলড' নামে নূতন সাপ্তাহিক কাগজ প্রকাশিত করলেন। এ কাগজের বাংলা রূপটিরই নাম ছিল 'বঙ্গদূত' (১৮২৯)। ১৮৩১ সালের জানুয়ারীতে অর্থাৎ 'বঙ্গদূতে'র প্রায় দেড় বছর পরে প্রকাশিত হ'ল সুবিখ্যাত **ঈশ্বরচন্দ্র** সম্পাদিত 'প্রভাকর' বা 'সংবাদ প্রভাকর' পত্র। আর এই (১৮৩১) সাল থেকে ১৮৪০ পর্যন্ত দশ বছরের মধ্যে অন্যূন ত্রিশখানি সাময়িক পত্র প্রকাশিত হয়েছিল, এবং এক ১৮৩১ সালেই

অন্যূন আটখানি কাগজ জন্মলাভ করে। এ সকল সাময়িক পত্রের অধিকাংশ দীর্ঘজীবী না হলেও এদের দ্বারা বাংলা গদ্য বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছে; এজন্যে রামমোহন যুগের এ অংশকে **সাময়িক পত্র পর্ব** নাম দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে, স্কুলপাঠ্য ও অন্যান্য পুস্তকের দ্বারা বাংলা গদ্য এ সময়ে লাভবান হয় নি। অব্যবহিত পূর্ববর্তী-কালের মত এ সময়েও, এ জাতীয় পুস্তকের মধ্য দিয়ে বাংলার সাহিত্যিক গদ্য ক্রমবিকাশের পথে চলছিল, কিন্তু এ ক্রমবিকাশের ধারাকে বিশেষ ভাবে দ্রুততর করেছিল নানাশ্রেণীর সাময়িক পত্র। তাই রামমোহন যুগের এ পর্বকে বিশেষভাবে বুঝতে হ'লে এর সাময়িক পত্রগুলির দিকে সকলের আগে দৃষ্টি দিতে হবে।

'বঙ্গদূত' পত্রিকায় প্রকাশিত উপাখ্যান বা তথ্যমূলক প্রবন্ধাদির ভাষা বেশ সরল ছিল। নিচে এর একটি উপাখ্যান ( ১৮২৯ ) উদ্ধৃত হ'ল :—

> "পূর্বে ফ্রান্স রাজ্যের এক প্রদেশ মাস্থল গ্রাহক লোকেতে পূর্ণ ছিল, প্রজাগণেরা মাস্থল না দিয়া জিনিস আমদানী কি রপ্তানী করণে আপনাদের লাভ দেখিয়া তৎকর্ম্মে এমত প্রবৃত্ত হইল যে তাহা কোন প্রকারে নিবারণ করিতে গবর্ণমেণ্ট অক্ষম হইলেন / সেই অনুচিত কর্ম্ম কুক্কুরের দ্বারা সম্পন্ন হয়। কুক্কুরের ঘাড়ে তাহারদের শক্ত্যনুসারে জিনিসের বস্তা বোঝাই হইত / কেবল পথ দর্শক এক কুকুর বোঝাই রহিত থাকিত। চাবুকের এক শব্দ হইলে ঐ কুকুর সকল যাত্রা করিত। পথপ্রদর্শক কুকুর সকলের কিছু অগ্রে গমন করিত / যদি কোন অপরিচিত লোকের আগমন বোধ করিত তবে সে তৎক্ষণাৎ অন্য কুকুরের নিকটে ফিরিয়া আসিত / তাহারা তৎক্ষণাৎ অন্য পথ দিয়া গমন করিত / সঙ্কট সন্নিহিত হইল এমন যদি জানিতে পারিত তবে তাহারা নিকটস্থ ঝোপের মধ্যে প্রবেশ করিয়া অপরিচিত লোকেরদের না যাওয়া পর্য্যন্ত সেখানে লুক্কাইয়া থাকিত।"

এ অংশটির ভাষা বেশ অনাড়ম্বর এবং সহজবোধ্য হলেও 'বঙ্গদূতের' সংবাদ গুলি মাঝে মাঝে গুরুগম্ভীর ও কৃত্রিম চালের পণ্ডিতী রীতিতে

রচিত হ'ত। এতে মনে হয় 'বঙ্গদূতের' কর্তৃপক্ষেরাও 'সমাচার দর্পণে'র মত সম্পাদন কার্যের জন্য সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের সাহায্য নিতেন। নিচে 'বঙ্গদূতে' প্রকাশিত ( ১৮২৯ ) একটি সংবাদের কিয়দংশ দেওয়া যাচ্ছে :—

"শ্রুত যে ৺প্রাণকৃষ্ণ সিংহের পুত্র শ্রীযুত বাবু শ্রীনারায়ণ সিংহ পশ্চিম অঞ্চল হইতে নৌকারোহণে স্বদেশে আগমন করিতেছিলেন / তাহাতে গত আষাঢ়ের ২০ বিংশতি দিবসে প্রত্যূষে কাটোয়ায় আগত হইলে দৈব দুর্যোগ জন্য তদ্দিবস তথায় তিনি অবস্থিতি করিলেন / সে রাত্রে বায়ুযোগে জহ্নু তনযা তরঙ্গিণীর তরঙ্গ তুঙ্গাঙ্গ হইয়া যেরূপ রঙ্গ করিয়াছিল তৎসন্দর্শনে অনেকেরি স্বান্ত শঙ্কিত হইয়াছিল / এবং নীরদের নিরন্তর বর্ষণে হর্ষ ও বিমর্ষ হইয়া লুক্কায়িত ও সকলেই কায়কম্পিত হইয়াছিলেন / এমতকালে অশান্ত অবোধ অর্ব্বাচীন বিবেচনাশূন্য কোন নাবিক নৌকায় ৪০ চত্বারিংশৎ লোক লইয়া পার করিতে প্রবর্ত্ত হইল......।"

সংবাদের ভাষা কখনো কখনো এরূপ বিসদৃশভাবে অলঙ্কৃত হলেও 'বঙ্গদূত' কাগজের ভাষা সাধারণত এরূপ ছিল না। 'সমাচার দর্পণ' কাগজের প্রায় তুল্যই ছিল এর রচনারীতি। এ শেষোক্ত কাগজে প্রকাশিত ( ১৮৩১ ) একটি উপাখ্যানের কিয়দংশ নিচে উদ্ধৃত হ'ল।

"পরে রাজা তৃতীয় হেনরী স্বীয় সিংহাসনভ্রষ্ট হইলে উক্ত সাহেবের একজন সন্তানকে কহিলেন, যে তুমি গমন করিয়া স্থইস দেশীয়দিগের নিকট হইতে আমার উপকার প্রার্থনা কর। রাজা তৎকালে নিধন হওয়াতে উক্ত সাহেবকে এই পরামর্শ দিলেন, যে তুমি ঐ হীরক আপনার বংশের স্থান হইতে কর্জ করিয়া স্থইস দেশের গবর্ণমেণ্টের স্থান হইতে যে টাকা লইবা, তাহার বন্ধক স্বরূপ দিবা।"

১৮৩৩ সালে সংস্কৃত কলেজের ইংরাজী বিভাগের তিন জন শিক্ষক মিলে 'বি জ্ঞা ন সা র সং গ্র হ' ( ১৮৩৩ ) নামক এক দ্বিভাষিক পাক্ষিক পত্র প্রকাশ করেন। ১৮৩৪ সাল থেকে এখানি মাসিকে পরিণত হয়। সংস্কৃত কলেজের সঙ্গে যোগ থাকলেও এ কাগজখানিতে বোধ হয় পণ্ডিতী

রীতির তেমন প্রভাব ছিল না। এতে প্রকাশিত (১৮৩৩) স্যর **উইলিয়ম জোন্‌সের** ( Sir William Jones ) জীবন চরিত থেকে কিছু অংশ নিচে দেওয়া হ'ল :—

"যখন তিনি ভারতবর্ষের অন্তঃপাতি বঙ্গদেশের প্রধান বিচার স্থানের অর্থাৎ কলিকাতা সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারকর্ত্তা হইয়াছিলেন, তখন ঐ অত্যন্ত কঠিন কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়াও, নানাপ্রকার জ্ঞান শাস্ত্রের আলোচনা করিতেন এবং লণ্ডন নগর হইতে ভারতবর্ষে উপস্থিত হইয়াই লণ্ডন নগরের রাজকীয় সভার ন্যায় এই কলিকাতা মহানগরে এক মহতী সভা স্থাপন করিয়াছিলেন, ও যাবৎকাল তিনি জীবদ্দশায় ছিলেন তাবৎকাল পর্যান্ত ঐ সভার একজন প্রধান অধ্যক্ষ ছিলেন, আর ঐ সভাতে এতদ্দেশীয় শব্দ শাস্ত্র দ্বারা প্রাচীন বিষয় সকল লিখিয়া ঐ সভার কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেন।"

এসময়কার সাময়িক পত্রে বিজ্ঞান সম্পর্কিত যে সকল প্রবন্ধ ছাপা হ'ত তাদের ভাষা খানিকটা সরল হয়ে এসেছে বলা যায়। সর্বপ্রথম প্রকাশিত বাংলা বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ 'বিদ্যাহারাবলী'র ভাষার সঙ্গে নিচে উদ্ধৃত 'সমাচার দর্পণের' ( ১৮৩২ ) ভাষার তুলনা করলেই এ কথা বোঝা যাবে।

"তাপ যে প্রকার কঠিন বস্তুর মধ্য দিয়া যায়, সেই প্রকার দ্রব বস্তুর মধ্য দিয়া চলে না কিন্তু আস্তে আস্তে চলে। দ্রব বস্তুর মধ্যগত পরমাণুর চলনদ্বারা তাহার মধ্যে তাপ বাহুল্যরূপে চলে অর্থাৎ কোন জলপূর্ণ পাত্র অগ্নিতে স্থাপিত হইলে জলের যে পরমাণু ঐ পাত্রের নীচে থাকে তাহা প্রথম উত্তপ্ত হয়, ঐ উত্তপ্ত পরমাণু কঠিন বস্তুর পরমাণুর ন্যায় স্বস্থানে থাকিয়া অন্যান্য নিকটবর্ত্তি পরমাণুর প্রতি তাপ চালন করে না কিন্তু ঐ পাত্রের নীচ স্থান হইতে উপরে উঠে এবং জলের শীতল পরমাণু সকল নামিয়া ক্রমশঃ উত্তপ্ত হয় ও পূর্ব্ববৎ উপরে উঠে।"

উপরে উল্লিখিত রচনাংশের সঙ্গে 'বিজ্ঞানসারসংগ্রহে' প্রকাশিত

( ১৮৩৩ ) একটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের ভাষা তুলনীয়। এরও কিয়দংশ নিচে দেওয়া গেল —

"শিষ্য। কাষ্ঠমধ্যে যে প্রেক প্রবিষ্ট হয় সে কি ঐ কাষ্ঠ যে পরমাণুদ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে সেই পরমাণুর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে ?

গুরু। না, সেই লৌহ পরমাণু সকলের মধ্যে মধ্যে যে পথ থাকে সেই পথদ্বারা গমন করে, কারণ যদি নরম কর্দ্দমময় গোলার মধ্যে অঙ্গুলি প্রবিষ্ট করান যায়, তবে সে কেবল ঐ কর্দ্দমীয় কতকগুলি পরমাণুকে স্থানান্তর করা হয়, অতএব ইহার তাৎপর্য্য এই, যে ঐ সকল পরমাণু অন্য অন্য স্থানে প্রবিষ্ট হয সুতরাং অঙ্গুলিতে তাহার এক পরমাণুও প্রবেশ করে না।"

উপরে বাংলা গদ্যের যে সকল নিদর্শন উল্লিখিত হ'ল সেগুলি সহজ-বোধ্য হলেও এদের ভাষা সাহিত্যরচনায় ব্যবহারের যোগ্যতা লাভ করে নি। বাংলা ভাষার প্রকৃতিসঙ্গত বাক্যবিন্যাসের পদ্ধতি তখনো সম্পূর্ণরূপে গড়ে ওঠে নি। 'জ্ঞা না ন্বে ষ ণ' (১৮৩১) পত্রিকায় প্রকাশিত ( ১৮৩৭ ) একটি প্রবন্ধের ভাষা দেখলেই একথা বোঝা যাবে। এর খানিকটা নিচে দেওয়া হ'ল :—

"ঐ স্থলে পশুদের জীবননাশক একপ্রকার বিষবৃক্ষ অনেক জন্মে। শ্যামপূ নদীর তটে বাস করে যে এবোর নামক পর্ব্বতীয় ব্যক্তিরা ইহার অনেক চাস করিয়া থাকে / ইহারা গুপ্তভাবে ইহার চাস করে / দেশ পরিত্যাগ করিযা যাইবার সময়ে একেবারে ঐ বৃক্ষকে বিনষ্ট করিয়া যায়। এই গাছ আটি বাঁধিয়া এবোর জাতিরা সদিয় দেশে আনিয়াছে / ইহা সীকড়ের ন্যায় দৃশ্যে জটাময় / ঐ গাছ চূর্ণ করিয়া কাইর সহিত মিলায় এবং কঠিন করিবার জন্যে ওটেঙ্গ বৃক্ষের রস তাহাতে মিশ্রিত করিয়া শরের অগ্রে দেয় / ইহার এমন গুণ যদ্যপি এই বাণের আঁচ লাগে মনুষ্য তৎক্ষণাৎ মরিয়া যায়।"

বাংলা গদ্য যখনও সাহিত্যিক ব্যবহারের সম্যক্ উপযুক্ত হয়ে উঠে নি তার আগে আবির্ভূত হলেন স্বনামখ্যাত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। তাঁর 'প্রভাকর

পত্রিকায় তিনি এক নূতন ধরণের অলঙ্কৃত গদ্য লেখার প্রয়াস করলেন। খুব সম্ভব ১৮৩৭ সালের 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত 'বি দে শী র অ ক্ষ রে অ ন্য ভা ষা লি খ ন' নামক প্রবন্ধটি তাঁরই রচিত। কারণ এ রচনায় তাঁর ব্যবহৃত নূতন গদ্যরীতির লক্ষণ সকল স্পষ্টভাবে বর্তমান। প্রবন্ধটির আরম্ভ নিম্নোক্তরূপ :—

"বর্ম্ম নগরে ধর্ম্মনামক একজন চর্ম্মকার / কোন অনির্ব্বচনীয় বস্তুবিশেষের বিক্রমে বিস্তর যত্নে / এক জোড়া দশ অঙ্গুলি পরিমাণ সুচারু চর্ম্ম পাদুকা প্রস্তুত করত / গ্রামের মধ্যভাগে আগমন করিয়া প্রফুল্লচিত্তে সাধারণকে কহিতে লাগিল যে ভাইরে, আমি এক উত্তম নূতন জুতা নির্ম্মাণ করিয়াছি, তোমরা সকলে এই জুতা জোড়াটী পায়ে দেহ, তাহাতে গ্রামস্থ ভদ্রসমূহ ঐ চর্ম্মকারের উনপঞ্চাশৎ অনিল ঘটিত বাক্য শ্রবণে প্রথমতঃ সম্বোধন পূর্ব্বক উত্তর করিলেন যে / ওহে বাপু তোমার জুতা জোড়াটী সর্ব্বতোভাবে উত্তম বটে / কিন্তু পরমেশ্বর আমাদিগর কাহারো বারো অঙ্গুলি কাহারো অষ্টাঙ্গুলি ও কাহারো কাহারো ষড়ঙ্গুলি পদের বিস্তার করিয়াছেন / অতএব তোমার ঐ অপরিমিত চর্ম্মপাদুকা আমাদিগের কাহারু পায়ে উৎকৃষ্ট-রূপে সমান হইতে পারে না।"

অনুপ্রাসাদি অলঙ্কার এ গদ্যের ভাষাকে স্থানে স্থানে হাস্যকর রূপে কৃত্রিম করেছে। তখনকার দিনের লোকের সাহিত্যিক রুচি, যমকানুপ্রাসে ভূষিত এ জাতীয় কবিওয়ালার ভাষার দ্বারা বিকৃত হয়ে পড়েছিল, তাই ঈশ্বরগুপ্তের গদ্য রচনা তখন জনসাধারণের কানে সুধাবর্ষণই ক'রল। ইনি কিছুকাল কবিওয়ালার দলে গান বাঁধতেন বলেই হয়ত তাঁর গদ্যে এ বৈশিষ্ট্য সম্ভবপর হয়েছিল। এ রকম গদ্যরচনাশক্তি এবং এরি তুল্য কবিত্ব নিয়ে তিনি তৎকালে বাংলা লেখকদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় হয়ে ছিলেন, কিন্তু 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রচারিত হলে (১৮৪৩) ক্রমশ তাঁর প্রভাব ক'মে যায়। গুপ্ত কবির এরূপ সমসাময়িক প্রতিপত্তি সত্ত্বেও 'সমাচার দর্পণ', 'সমাচার চন্দ্রিকা' 'বঙ্গদূত' 'জ্ঞানান্বেষণ' 'সং বা দ পূ র্ণ-চ ন্দ্রো দ য়' (১৮৩৫) 'সং বা দ ভা স্ক র' (১৮৩৯) প্রভৃতি সাময়িক

কাগজের প্রভাবও একান্ত কম ছিল না। কাজেই ঈশ্বরগুপ্তের গদ্য রীতি কখনো লোকের মনে একাধিপত্য করবার সুযোগ পায় নি। কিন্তু গদ্যরীতির কৃত্রিমতাকে তিনি যে, কিছু পরিমাণে জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন তার ফলে পণ্ডিতী গদ্য আবার শক্তিশালী হওয়ায় সুযোগ পেল। এ যুগপর্বের স্কুলপাঠ্য ও অন্যান্য পুস্তকের গদ্য আলোচনা করলে একথা কিঞ্চিৎ স্পষ্টতর হবে।

# নবম অধ্যায়

## স্কুলপাঠ্য ও অন্যান্য পুস্তক ( ১৮২৯—১৮৪৩ )

স্কুলপাঠ্য ও অন্যান্য বাংলা গদ্য পুস্তকের লেখক হিসাবে মার্শম্যান সাহেবের নাম চিরস্মরণীয়। সর্বপ্রথমে প্রকাশিত বাংলা সংবাদপত্র 'সমাচার দর্পণও' তাঁর অন্যতম কীর্তি। এ কাগজের রচনার নমুনা আগে দেখা গিয়েছে। এবার তাঁর ভিন্ন ভিন্ন বইএর গদ্যরীতি আলোচিত হবে। এ সকল বইএর মধ্যে 'সদ্‌গুণ ও বীর্য্যের ইতিহাস' ( ১৮২৯ ) সর্বাগ্রে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এর ভাষার কিছু নিদর্শন নিচে দেওয়া গেল :—

"১৮১১ সালে ঐল ও দেশে সর জন পসর্ল সাহেবের গৃহ অসীম-সাহস একদল ডাকাইত কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়, তিনি যে কুটরীতে শয়ন করিতে গিয়াছিলেন সেই কুটরীর নিকটস্থ কামরার খিড়কী তাহারা বলদ্বারা খুলিল। ঐ সাহেব তাহারদের চৌদ্দজনকে আসিতে দেখিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ শয্যা হইতে উঠিয়া প্রথমতঃ তাহারদের আগমন নিবারণ করিতে নিশ্চয় করিলেন, কিন্তু যখন দেখিলেন যে তাঁহার স্থানে কিছু অস্ত্রশস্ত্র নাই, এবং তিনি নিতান্ত অনুপায়ী তখন তাঁহার মনের মধ্যে কিঞ্চিদুদ্বেগ জন্মিল; অতিশয় সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার স্মরণ হইল যে পূর্ব্ব রাত্রিতে তিনি শয়নাগারে ভোজন করণান্তর দৈবাৎ সেই স্থানে এক ছুরী রাখিয়া আসিয়াছিলেন, এবং অতি শীঘ্র অন্ধকারে সেই অস্ত্রের অনুসন্ধানে গমনপূর্ব্বক হাতড়িয়া হাতড়িয়া অতিশয় শুভাদৃষ্টক্রমে সেই ছুরী পাইলেন। ইতিমধ্যে ডাকাইতেরা তাঁহার শয়নাগারে অতি শীঘ্র আসিবে, ইহার অপেক্ষায় তিনি অতিশয় ধৈর্য্যাবলম্বী অথচ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া থাকিলেন,......"

ইংরাজী থেকে অনুবাদিত এ উপাখ্যানটির ভাষায় কোন বিশেষত্ব নাই। কিন্তু বিশেষ সাহিত্যিক গুণ কিছু না থাকলেও এর ভাষা সহজবোধ্য এবং

আড়ম্বরবর্জিত। মার্শম্যানের রচিত 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' (১৮৩১) তাঁরই লেখা ইংরাজী পুস্তকের অনুবাদ। এ খানিরও ভাষার সাহিত্যিক গুণ কিছু নেই। নিচে এর ভাষার একটু নমুনা দেওয়া গেল :—

"পলাসীতে নবাব সাহেবের পূর্ব্বকালাবধি কতক সৈন্য ছাউনি করিয়া রহিয়া ছিল / এবং ইংলণ্ডীয়েরা যে রাত্রিতে সে স্থানে পহুছিলেন / ঐ দিবস নবাব সাহেব স্বয়ং সে স্থানে উপস্থিত হইলেন। তাহার সঙ্গে পঞ্চাশ সহস্র পদাতিক এবং অষ্টাদশ সহস্র অশ্বারূঢ় এবং পঞ্চাশটা তোপ ছিল। * * * তাবৎ দিবস ব্যাপিয়া সংগ্রাম হইল এবং যুদ্ধ প্রায় গোলাক্ষেপেতে নিষ্পন্ন হইল / তাহাতে সুবাদার অত্যন্ত ভীত হইয়া / অনিষ্টচেষ্টকদের পরামর্শেতে বেলাবসানে আপন সৈন্যেরদিগকে পশ্চাৎ হাটিতে আজ্ঞা দিলেন / ইহা দেখিয়া মীরজাফর আপন সৈন্য পৃথক করিলেন / তাহাতে ক্লাইব সাহেবের মনেতে নিশ্চয় হইল যে / মীরজাফর আমারদের পক্ষ হইবেক / অতএব তিনি ইংলণ্ডীয় সৈন্যেরদিগকে অগ্রসর হইয়া নবাব সাহেবের অবশিষ্ট সৈন্যের উপর আক্রমণ করিতে আজ্ঞা দিলেন।"

ইংরেজী থেকে অনুবাদিত এ যুগের অন্যান্য পুস্তকের ভাষা এ পুস্তকের ভাষার মতই সরল ও সংস্কৃতঘেঁসা সাধুভাষা, এবং ১৮৩৩ সালে স্কুলবুক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত 'গ্রীকদেশের ইতিহাস' এ বিষয়ের দৃষ্টান্ত। **ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়** নামক এক ব্যক্তি **গোল্ডস্মিথের** (Goldsmith) 'হিস্টি অব গ্রীস্' নামক পুস্তক অবলম্বনে উহা রচনা করেন। তাঁর বইএর উৎসর্গ-পত্র দে'খে অনুমান করা যায় যে, ক্ষেত্রমোহন হয়ত হিন্দুকলেজের ছাত্র ছিলেন। উক্ত ইতিহাসের ভাষার কিছু নমুনা নিচে দেওয়া গেল :—

"বুসিফেল নামক প্রসিদ্ধ অশ্বকে বশীভূত-করণ দ্বারা আলেক্‌সাণ্ডরের সাহস ও বীরত্ব প্রথমে প্রকাশ হয়। * * * * * * ফিলিপ ঐ অশ্ব পরীক্ষার্থে সভাসদের সঙ্গে মাঠে গিয়া দেখিলেন / সে এমন দুরন্ত ও অনায়ত্ত যে তাহার উপর আরোহণে কোন ব্যক্তির

যোগ্যতা হইল না। ইহাতে ফিলিপ ক্রুদ্ধ হইয়া সে অশ্বকে লইয়া যাইতে আজ্ঞা করিলেন। তৎকালে আলেক্সাণ্ডর সেখানে উপস্থিত ছিলেন, ঐ অশ্ব অগ্রাহ্য হইল দেখিয়া তিনি উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, যে হায় ইহা কি দুঃখের বিষয়। ইহাতে কাহারও আরোহণে সাহস নাই এই প্রযুক্ত এমত উত্তম অশ্ব ক্রয় করা হইল না। ফিলিপ্ প্রথমে এইরূপ বিবেচনা করিয়াছিলেন, যে যুবাদের স্বাভাবিক দুঃসাহস ও অবিবেক হইযা থাকে, তাহাতেই আলেক্সাণ্ডর এতাদৃশ অজ্ঞানের ন্যায় বাক্য কহিতেছেন। কিন্তু আলেক্সাণ্ডর ঐরূপ পুনঃ পুনঃ কহাতে, এবং এমত উৎকৃষ্ট অশ্ব লইয়া যায় দেখিয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হওয়াতে, তাঁহার পিতা তাঁহাকে ঐ অশ্ব পরীক্ষাকরণের অনুমতি দিলেন।"

উল্লিখিত অংশের ভাষার এক বিশেষত্ব এই যে, উহাতে সমাসবদ্ধ শব্দ প্রায় অনুপস্থিত। এ দিক দিয়ে ক্ষেত্রমোহন 'গ্রীক ইতিহাসের' ভাষা মার্শম্যানের 'ভারত ইতিহাসে' চেয়ে কিঞ্চিৎ সরলতর, এবং রচনার সৌন্দর্য, প্রাঞ্জলতা ও সুখবোধ্যতার দিক দিয়েও এ পুস্তক এর সমকালে প্রকাশিত সংস্কৃত পণ্ডিতদের ভারিক্কি রচনার চেয়ে প্রশংসনীয়। সেই ১৮৩৩ সালেই স্বর্গীয় মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের নামে প্রকাশিত[১] 'প্রবোধ চন্দ্রিকা'র ভাষার আলোচনা করলেই একথা সহজে বোঝা যাবে। এ পুস্তকখানিতে অন্তত চার রকম ভাষার সন্ধান পাওয়া যায়। যথা (১) সমাস-সংকুল সাধুভাষা (২) সরলতর সাধুভাষা (৩) চলিতভাষা এবং (৪) সাধু এবং চলিত মিশ্রিত ভাষা। এর বিষয়বস্তুও

---

১। গোড়ার দু'এক অধ্যায় ছাড়া বইখানি মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের রচনা কিনা, সে সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। শ্রীযুক্ত (অধুনা ডক্‌টর) সুশীলকুমার দে মহাশয় অনুমান করেন যে এ বই ১৮১৩ সালে রচিত হয়েছিল। কিন্তু ১৮৩৩ সালের আগে বই ছাপা না হওয়াতে এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ ঘটে। কেরী মার্শম্যান প্রমুখ মহোদয়গণের বহু প্রশংসিত পণ্ডিত মৃতুঞ্জয়ের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ, কেন যে প্রায় কুড়ি বছর ধরে কেবল পাণ্ডুলিপিরূপেই প'ড়ে থাকতে বাধ্য হয়েছিল, ঐতিহাসিকরা তার কোন সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ দেন নি। এ কৈফিয়তের অভাবে সমগ্র বইখানিকে মৃত্যুঞ্জয়ের রচনা মনে করা শক্ত। (এ প্রসঙ্গে ডাঃ দে মহাশয়ের Hist. of Bengali Lit পৃঃ ২১১ দ্রষ্টব্য)

বিবিধ এবং বিচিত্র। কাব্য, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, নীতিশাস্ত্র, ধর্ম ও দর্শনাদির সঙ্গে স্থানে স্থানে লৌকিক এবং পৌরাণিক কাহিনী মিশিয়ে এ বই লেখা হয়েছে। এ বই এর গদ্যরীতি সম্বন্ধে অনেক অনুকূল বা প্রতিকূল আলোচনা বর্তমান, কিন্তু তা সত্ত্বেও নতুন আলোচনার অবকাশ আছে ব'লে মনে হয়। এর যে সমাসসংকুল সাধুভাষা, তা বাংলা ভাষার প্রকৃতির একান্ত বিরোধী। নিচে এ ভাষার দুটি নমুনা উদ্ধৃত হ'ল :—

"তদনন্তর রাজদ্বারস্থিত ঘটিযন্ত্রস্থ দণ্ডতাম্রীতুল্য দিবাকর জলনিমগ্নপ্রায় অস্তমিত হইলেন / এবং প্রবলতর বায়ু সহিত ঘনাঘন ঘোরঘটাতে দিঙ্‌মণ্ডলীমুখ নিবিড়াচ্ছন্ন হইল / এবং অন্ধতমসাবৃত বনস্থলীতে বিদ্যুদুদ্যোতমাত্র প্রদর্শিতপদ্ধতী নৃপকুমার / বন্ধনোন্মুক্ত অশ্বপলায়ন ও স্বকীয় সেবকসকলের অনাগমননিমিত্ত / অত্যন্ত চিন্তাকুলান্তঃকরণ হইয়া ইতস্ততো ভ্রমণ করত / হঠাৎ সম্মুখে সৌদামিনীপ্রকাশে অতি ভয়ানক শব্দায়মান অনতিদূরস্থ এক বর্বর ব্যাঘ্রকে দেখিতে পাইয়া / অতি ভীতিবিহ্বল হইয়া উচ্চতর বৃক্ষোপরি আরোহণ করিয়া দেখেন যে সেই বৃক্ষশাখা অবলম্বন করিয়া এক ভয়ানক ভল্লুক শয়ন করিয়া আছে।"

"কোন পণ্ডিতেরা কহেন / যেমন কদম্বকুসুমগ্রন্থিতে প্রস্ফুটিত কেশরসমূহ একৈক পুষ্পরূপে প্রকাশ পায় তেমনি কণ্ঠতালু প্রভৃতি স্থানেতে উচ্চারিত বর্ণসমূহালম্বন জ্ঞান একৈকপদবুদ্ধিরূপে প্রকাশিত হয়। ইত্যাকারক কদম্বগোলকন্যায়ে শব্দোৎপত্তি হয়।"

উল্লিখিত অংশ দুটিতে প্রকাশিত দীর্ঘসমাসে পীড়িত গদ্যরীতি বাংলা সাহিত্যের পক্ষে দুঃসহ বলেও, 'প্রবোধ-চন্দ্রিকা'র এ জাতীয় শিল্পহীন (inartistic) রচনা যে, পরবর্তীকালের নাতিদীর্ঘ সমাসমিশ্রিত এক সুন্দর গদ্যরীতির গঠনে কিয়ৎ পরিমাণে সাহায্য করেছিল, তা অস্বীকার করা যায় না। মৌলিক বাংলা গদ্যে সংস্কৃত সাহিত্যের অলঙ্কার প্রয়োগের চেষ্টা করাতেই 'প্রবোধচন্দ্রিকা' প্রণেতার কৃতিত্ব। মনে হয় তাঁর

এ চেষ্টাই গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ ও বিদ্যাসাগর আদির পথপ্রদর্শক হয়েছিল।

'প্রবোধচন্দ্রিকা'য় যে সরল সাধুভাষা পাওয়া যায় তাতে 'চন্দ্রিকা' প্রণেতার কোন কৃতিত্ব আছে ব'লে মনে হয় না ; কারণ এ জাতীয় গদ্য, এ পুস্তকপ্রকাশের বহুদিন আগে থেকে সাময়িক পত্রিকার পাতায় দেখা গিয়েছিল। নিচে 'প্রবোধচন্দ্রিকা'র এ ভাষার একটি নমুনা দেওয়া গেল :—

"দুইজন রথ চড়িয়া এক বনের মধ্যে প্রবিষ্ট হইল / দৈবাৎ সেই কাননের মধ্যে দাবানলেতে একজনের রথ পুড়িয়া গেল অশ্ব থাকিল / অন্য ব্যক্তির অশ্ব পুড়িয়া মরিল রথ থাকিল। এতদ্রূপে একজন নষ্টাশ্ব অন্যজন দগ্ধরথ হইয়া অটবীতে থাকে / একদিবস দৈবাৎ দুইজনেতে দেখা হইল। অনন্তর উভয়ে যুক্তি করিয়া একজনার রথেতে অন্যের অশ্বযোজনা করিয়া অনায়াসে পরমসুখে গন্তব্য দেশ পাইল।"

এক চেতনরূপী পরমেশ্বর জগতের উৎপত্তির কারণ / ঈশ্বর কার্যভূত ভৌতিকপ্রপঞ্চমাত্র অচেতন। কারণ ঘটপটকারকাদির চেতনা / কার্যপটপটাদির অচেতনতা ইহা সকল লোকের প্রত্যক্ষানুভবসিদ্ধ আছে। এই দৃষ্টান্তে এ জগতের আদি কর্তা পরমেশ্বর চেতন / তিনি এক / অনেকেশ্বর কল্পনাতে গৌরব ও প্রমাণাভাব। তৎসৃষ্ট যাবজ্জগৎ অচেতন ও অনেক এই নিশ্চয়।"

এরূপ সাধুভাষা 'প্রবোধচন্দ্রিকা'র অধিকাংশস্থলে ব্যবহৃত হলেও, তা স্থানে স্থানে চলতি ভাষার স্পর্শে অদ্ভুত হয়ে উঠেছে। যেমন,

"হে বন্দিন্ নিদ্রিত ব্যাঘ্রকে চপেটপ্রহারে তুমি নিদ্রিত করিযাছ ও ওষ্ঠাধরপ্রান্তলেলিহান কালসর্পকে পাদে তুমি স্পর্শ করিযাছ। তুমি আজ ছাড়ান পাবে না / আমার সঙ্গে তোমাকে কথোপকথন করিতে হবে স্থির হও /"

"বামনা বন্যজনের ঐ বচন শুনিয়া আপনার পণ্ডিতাই থাটাইলেন / বিশেষরূপে যে আঘ্রাণ করে সে ব্যাঘ্র শব্দের বাচ্য হয় / তার ভয় কি /

থাকিলে কি মানুষ মরে / এই মনে করিয়া নিশ্চিন্ত নির্ভয় নিঃশঙ্ক হইয়া পুষ্প চয়নে নির্ভর করিল /"

এরূপ মিশ্রিত রীতির রচনা যে, লেখকের সাহিত্যগত শিল্পবোধের ন্যূনতার প্রমাণ তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু এজন্যে 'চন্দ্রিকা' প্রণেতাকে বেশী দোষ দেওয়া যায় না। পরবর্তী যুগে প্যারীচাঁদের রচনায়ও এ শ্রেণীর মিশ্র রীতির নিদর্শন বিদ্যমান। আর বঙ্কিমচন্দ্রের গোড়ার দিকের রচনায়ও এ মিশ্র ধরণের বাক্য একান্ত দুর্লভ নয়। 'প্রবোধচন্দ্রিকা'স্থিত চলিতভাষার রচনা মোটামুটি ভাবে বেশ সুন্দর। তবে এ বিষয়ে গ্রন্থকারের কৃতিত্ব খুব বেশী নয়। কেরী তাঁর 'কথোপকথনে' চলিত ভাষার সে সকল নিদর্শন প্রকাশ করেছিলেন, তাই সে ক্ষেত্রে আদর্শ হয়েছিল এতে বিশেষ সন্দেহ নেই। 'চন্দ্রিকা'র চলিত ভাষার কিছু নমুনা নিচে দেওয়া গেল :—

"তাঁহার স্ত্রী কপালে করাঘাত করিয়া / ও মা এ কি হইল শিয়ালের কামড় বড় মন্দ / না জানি মোর ভাগ্যে কি আছে / অভাগিনী জন্মদুঃখিনী মুই। * * * * শাক ভাত পেট ভরিয়া যেদিন খাই সেদিন তো জন্মতিথি। কাপড় বিনা কেয়ো পাচা ঠুকরিয়া খায় / তেল বিহনে মাথায় খড়ি উড়ে। শীতের দিনে কাঁথাখানী ছালিয়া গুলিকের গায় দি / আপনারা দুই প্রাণী বিচালি বিছাইয়া পোয়ালের বিঁড়ায় মাতা দিয়া মেলের মাদুর গায় দিয়া শুই। * * * এইরূপে দুঃখোক্তি করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল।"

'প্রবোধচন্দ্রিকা'র মাঝে মাঝে এরূপ চলিত ভাষার প্রয়োগ বেশ মনোজ্ঞ হলেও, এর এক মহৎ দোষ হচ্ছে লেখকের সুরুচি ও শ্লীলতা-জ্ঞানের অভাব। 'নববাবুবিলাস' ও 'প্রবোধচন্দ্রিকা'র এবং এ দুখানি গ্রন্থের সমসাময়িক এদের মত অন্যান্য পুস্তকের জঘন্য রুচিকে লক্ষ্য করে **বঙ্কিমচন্দ্র** ১ বলে গেছেন, যে, 'এ-দুখানি পুস্তকের যুগে (**ভারতচন্দ্রের** কাব্য যে হিসাবে পাঠ্য সে হিসাবে) পাঠযোগ্য পুস্তক ছিল না বললেই

১। বঙ্কিমচন্দ্রের Essays and Letters (Centenary Edition) পৃঃ ২৩।

হয়, আর ঘৃণ্য সাহিত্যিক ময়লার ( filth ) এমন প্রচুর সরবরাহ আগে কখনো হয়নি।' অশ্লীলতা ছাড়াও 'প্রবোধচন্দ্রিকা'র ভাষায় নানা দোষ ছিল যথা :- [ ১ ] অকারণ পুনরুক্তি, [ ২ ] বেমানান ভাবে সংস্কৃত ও প্রাকৃত শব্দের পাশাপাশি প্রয়োগ, [ ৩ ] শ্রুতিকটু অনুপ্রাসাদির প্রয়োগ ইত্যাদি। নিচে একে একে এদের দৃষ্টান্ত দেওয়া যাচ্ছে। যেমন—

( ১ ) পুনরুক্তির উদাহরণ :—

"তোমার বিদ্যাতে তুষ্ট হইয়া আমরা সকলে তোমার উপযুক্ত উত্তম পাত্র ও অকৃতদার এই মহাশয়কে জানিয়া অনেক যত্নে ও আয়াসে ও চেষ্টাতে আনিয়াছি।"

"অষ্টাবক্র কহিলেন, যদ্যপি ব্রাহ্মণ সম্মুখে মিলিত না হন তবে পথ রাজার ও স্ত্রীর ও বরের ও ভারিকের ও বধিরের ও অন্ধের।"

( ২ ) যুগপৎ সংস্কৃত ও প্রাকৃত শব্দের অশোভন মিশ্রণের উদাহরণ :—

"অতি গণ্য-মান্য প্রতাপশালী কাশ্মীররাজ হস্তি অশ্ব রথ পদাতিচয় চতুরঙ্গিণী সেনা সঙ্গে লইয়া মৃগয়ার্থ কানন মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া কাটারি কাঁড় বাঁড়া বর্শা খড়্গ ছুরা বন্দুকাদি বহুবিধ অস্ত্র-শস্ত্রেতে এবং শিকারি কুকুরের দ্বারা * * * নানাবিধ মৃগজাতি সংহার করিয়া অরণ্যানী হইতে আসিতেছেন।"

"* * দৌড়লো দৌড়লো চক্ষু গেল এই শব্দ উচ্চৈঃস্বরে করিয়া উদ্বিগ্ন হইয়া হস্তদ্বয়ে চক্ষুর্দ্বয় মর্দ্দন করিতে করিতে বন্ধন শিথিল মাত্রে শৃগাল অমনি ঝটিতে ধড়্‌ফড়্ করিয়া উঠিয়া চাষার পাছায় এক কামড় দিয়া এবং চক্ষে ধূলা দিয়া চলিয়া গেল।"

( ৩ ) অনুপ্রাসাদিহেতু শ্রুতিকটুতার উদাহরণ :—

"* * * যোগীশ্বর যাজ্ঞবল্ক্য অসৎপক্ষপাতি লক্ষ লক্ষ বিপক্ষ-পণ্ডিতেরদের পূর্ব্বপক্ষ প্রক্ষেপ করিয়া যে তোমার সমক্ষে তত্ত্বনির্ণয় করিয়া অপরোক্ষ ব্রহ্মসাক্ষাৎকার করামলক ন্যায় তোমার করাইয়াছেন * * *।"

"শ্রীল শ্রীবিক্রমাদিত্যভূপালতনয় শ্রীল শ্রীবিজপালাভিধান ধরণীপাল ছিলেন।"

'প্রবোধচন্দ্রিকা'র ভাষায় এ শ্রেণীর দোষ থাকলেও লেখকের প্রশংসাই করতে হয়। কারণ তার আগে কেউ বাংলা গদ্যের সাহায্যে রসসৃষ্টির সজ্ঞান চেষ্টা করেছেন বলে জানা যায় নি। এ পুস্তকের ভাষা কতকটা বিদ্যাসাগরী গদ্যরীতির অস্ফুট পূর্বাভাসের মত।

যে ১৮৩৩ সালে 'প্রবোধচন্দ্রিকা' মুদ্রিত হয়, সে সালেই **কলিকাতা বাইবেল সোসাইটি** মূল হিব্রু ভাষা থেকে 'বাইবেলে'র 'ওলড টেষ্টামেণ্ট-এর (Old Testament) এক অনুবাদ প্রকাশ করেন। এ অনুবাদের প্রণেতা কে বা কারা, মুদ্রিত পুস্তক থেকে তা জানবার উপায় নেই। তবু ভাষার পারিপাট্য দেখে মনে হয়, এ অনুবাদের কাজে এদেশীয় কোন প্রতিভাবান ব্যক্তি সহযোগিতা করেছিলেন। নিচে এ-গ্রন্থের ভাষার নমুনা দেওয়া গেল:—

"আদিতে ঈশ্বর গগণমণ্ডলের ও পৃথিবীর সৃষ্টি করিলেন। কিন্তু তৎকালে পৃথিবী বিরূপা ও শূন্যা ছিলেন, এবং গম্ভীর জলের উপরে অন্ধকার ছিল, ও ঈশ্বরের আত্মা ঐ জলের উপর দোধূযমান ছিলেন, পরে দীপ্তি হউক, ঈশ্বর এই আজ্ঞা করিবামাত্র দীপ্তি হইল। আর দীপ্তিকে উৎকৃষ্টা দেখিয়া ঈশ্বর অন্ধকার হইতে দীপ্তিকে পৃথক্ করিলেন; এবং দীপ্তির নাম দিবস ও অন্ধকারের নাম রাত্রি রাখিলেন। আর সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে প্রথম দিবস হইল।

অনন্তর ঈশ্বর আজ্ঞা করিলেন, জলের মধ্য প্রদেশে শূন্য হইয়া ঐ জলকে দুইভাগ করিয়া পৃথক্ করুক। অতএব ঈশ্বর শূন্যের সৃষ্টি করিয়া তাহার অধঃস্থিত জল হইতে ঊর্দ্ধস্থিত জলকে পৃথক্ করিলেন। এবং সেইরূপ হইলে ঈশ্বর ঐ শূন্যের নাম আকাশ রাখিলেন। আর সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে দিবস হইল।"

এ অনুবাদে সমাসের প্রায় অভাব সত্ত্বেও যে পরিমাণ গাম্ভীর্যের সঞ্চার হয়েছে তা এ যুগের রচনায় দুর্লভ। সাধু ভাষার গদ্যের এরূপ

উত্তম দৃষ্টান্ত ১৮৪০ সালের আগে বড় একটা যায়নি। ১৮৩৭ সালের উক্ত বাইবেল সোসাইটি মূল গ্রীক্ থেকে 'নিউ টেষ্টামেণ্ট'এর ( New Testament ) যে অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন তার রচনা আলোচিত 'ওল্ড-টেষ্টামেণ্টে'র অনুবাদের মত প্রশংসনীয় নয়। নিচে এর কিয়দংশ উদ্ধৃত হ'ল :—

"আর উপবাসের সময়ে কপটি লোকেরা মনুষ্যদিগকে উপবাস জানাইবার নিমিত্তে যেমন আপনাদের মুখ ম্লান করে, তোমরা তেমন করিও না ; আমি তোমাদিগকে যথার্থ কহিতেছি, তাহারা আপনাদের ফল পাইল। অতএব যখন উপবাস কর তখন যে লোকদের কাছে তোমাকে উপবাসির মত না দেখায়, কিন্তু অগোচর যে তোমার পিতা তাহারি কাছে যেন দেখায়, এই জন্যে আপন মস্তকে তৈল মাখ, এবং মুখ প্রক্ষালন কর ; তাহাতে তোমার পিতা যিনি গোপনে দেখেন, তিনি প্রকাশরূপে তোমাকে ফল দিবেন।"

কিন্তু এ 'বাইবেল' অনুবাদের ভাষা যতই উত্তম হোক এর প্রচার সংখ্যালঘিষ্ঠ ধর্মসম্প্রদায় বিশেষের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল ব'লে, এ বই হয়ত বাংলা গদ্য রীতির ক্রমবিকাশে প্রত্যক্ষ সাহায্য করতে পারে নি। এর চেয়ে 'প্রবোধচন্দ্রিকা' আদির মত পুস্তকের প্রভাব ঢের বেশি ছিল।

'প্রবোধচন্দ্রিকা'র যে সকল দোষ দেখা গিয়েছে সেকালকার প্রায় সকল সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের লেখায় যে দোষগুলি অল্পবিস্তর বর্তমান ছিল। আগেই দেখা গিয়েছে যে, সাময়িক পত্রগুলির সম্পাদনেও ছিল সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের প্রভাব। তারই ফলে ১৮২৯ সালের পরবর্তীকালে গদ্যের স্বাভাবিক উন্নতির গতি কিঞ্চিৎ পরিমাণে বাধা পেয়েছিল। অনেক ইংরেজীনবীশ এবং সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তিও তাঁদের রচনায় সাধুভাষার পণ্ডিতী গদ্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। এর প্রধান দৃষ্টান্ত হিন্দু কলেজের প্রাক্তন ছাত্র **গোপাললাল মিত্র** রচিত 'জ্ঞান চন্দ্রিকা' ( ১৮৩৮ )। এ পুস্তক সেকালকার রচনা হিসাবে মোটের উপর নিন্দনীয় না হলেও এর ভাষা স্থানে স্থানে পণ্ডিতী গদ্যের মত। যেমন—

"অবন্তিকানগরনিবাসী রাজকুলোদ্ভব মহাবল পরাক্রান্ত সপ্তদ্বীপাধিপতি বহু বহু রত্ন ও অসীম ধনসংযুক্ত কমলাপতি নামক এক ব্যক্তি তাহার ধরণীধর নামক এক পুত্র সতত সকল বিষয়ে চেষ্টারহিত, পরিশ্রম করণে অসমর্থ। কিছুকাল পরে তৎপিতা কমলাপতির মৃত্যু হইলে ঐ ধরণীধর কেবল অমাত্যসহ মিথ্যাকল্পিত কথাতে কালযাপন করেন, কিন্তু কোন বিষয়ে বিশেষ পরিশ্রম করেন না। তদনন্তর ঐ ধরণীধরের পিতৃমন্ত্রী ও অমাত্য ও অন্য অন্য ভৃত্যাদি সকলেই ধরণীধরের এতাদৃশী রীতি সন্দর্শনহেতুক বিরক্ত হইয়া স্বীয় স্বীয় কার্য্য পরিত্যাগ পূর্বক স্বীয় স্বীয় গৃহে প্রস্থান করিলে কএক ব্যক্তি ধূর্ত ও প্রবঞ্চক মন্ত্রী প্রভৃতির কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া অল্পদিনের মধ্যে অসংখ্য ধন ও রত্নাদিযুক্ত কোষ প্রায় শূন্য করিলেন ...।"

'জ্ঞানচন্দ্রিকা'র এ অংশটিকে অনায়াসে 'প্রবোধচন্দ্রিকা'র ভাষা ব'লে চালানো যেতে পারে। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় যে, রামমোহন রায়ের প্রবর্তিত গদ্যের প্রভাব তখনো কাজ করছিল। সহমরণ নিবারণে উক্ত মহাপুরুষের সহকর্মী 'সংবাদভাস্কর' সম্পাদক গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ ১৮৪০ সালে 'জ্ঞান প্রদীপ' ( ১ম খণ্ড ) নামে যে পুস্তক প্রকাশ করেন তাই এ কথার প্রমাণ। 'হিতোপদেশ' নামক সংস্কৃত গ্রন্থের অনুকরণে নানা সুনীতি প্রবর্তক গল্পের সমবায়ে 'জ্ঞান প্রদীপ' রচিত হয়। এতে সেকালের পণ্ডিতী রুচির নিদর্শনস্বরূপ অশ্লীলতা বর্তমান থাকলেও এর ভাষা তৎকালের অন্যান্য গদ্য রচনার তুলনায় খুব উপাদেয়। দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার ও বিদ্যাসাগরের গদ্য রচনায় ছন্দজ্ঞানের যে সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়, গৌরীশঙ্করের লেখায় তার সুনিশ্চিত পূর্বাভাস রয়েছে। সংস্কৃত সাহিত্যের উপযুক্ত অলঙ্কারাদিকে বাংলা গদ্যে, যথাযোগ্যভাবে ব্যবহারের পথ গৌরীশঙ্করই দেখিয়েছেন ব'লে মনে হয়। তাঁর 'জ্ঞান-প্রদীপ' থেকে কিছু পড়লে বোধ হয় যে বিদ্যাসাগর তাঁরি মত লেখকদের রচনার আদর্শে নিজস্ব রচনারীতি গ'ড়ে তুলেছিলেন। নিচে 'জ্ঞান-প্রদীপ' থেকে কিছু অংশ তুলে দেওয়া গেল :—

"* * * এই সময়ে পরমেশ্বরের আশ্চর্য্য কৃপা দেখুন, সোমদত্ত আর্ত্তনাদপূর্ব্বক পরমেশ্বর সমীপে নিবেদন করিয়া অন্তরে পিতামাতার পাদপদ্ম চিন্তা করিতেছে এমতকালে মেঘান্ধকার বর্ষাকালীন দশ-রাত্রির ন্যায় দিবাভাগে নিবিড়ান্ধকার হইল, জীবজীবন সমীরণ একবারে স্তম্ভিত হইলেন, মনুষ্য-পশুপক্ষী সকল যে যেথায় ছিল সে সেই স্থানে রহিল, কেহ কিছু দেখিতে পায় না অতএব চতুর্দ্দিকে ত্রাহি ত্রাহি কোলাহল শব্দ হইতে লাগিল, ইহাতে রাজা আন্তরিক বিস্ময়জ্ঞান করিয়া পণ্ডিতসকলকে কহিলেন, হে ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ, আপনারা কি করিতেছেন, অকস্মাৎ মহাপ্রলয় উপস্থিত হইল, ইহার কারণ কি, পণ্ডিতেরা কহিলেন আমরা হতজ্ঞান হইয়াছি বোধ হয় ধরাতল পাপেতে পরিপূর্ণ হইয়াছে অতএব পরমেশ্বর পৃথিবীকে জলমগ্না করিলেন।"

গৌরীশঙ্করের 'জ্ঞানপ্রদীপে'র মত **প্রেমচাঁদ রায়** বিরচিত 'জ্ঞানার্ণব' (১৮৪২) নামক পুস্তকও রামমোহনের গদ্যের আদর্শে লিখিত। প্রেমচাদ হিন্দুকলেজ বা অন্য কোথাও ইংরেজী শিক্ষা পেয়েছিলেন কিনা জানা যায় নি। তবে তিনি শুধু সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন না বলেই মনে হয়। 'জ্ঞানার্ণবে'র ভাষা যেন 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র ভাষার পূর্বাভাস। সরলতা ও প্রাঞ্জলতায় এ ভাষা পণ্ডিতী গদ্যের অনেক উপরে। নিচে এর কিয়দংশ উদ্ধার করা গেল :—

"চিত্তবৃত্তি অদৃষ্ট পদার্থ/ যাহার দ্বারা দৃষ্টাদৃষ্ট যাবৎ পদার্থ প্রকাশ পায় তাহার নাম বুদ্ধি। বুদ্ধি গোমহিষ্যাদিরো আছে; কিন্তু তাহাদিগের বুদ্ধি কেবল আহার নিদ্রাদি বিষয়ে থাকে, মনুষ্যের বুদ্ধি দৃষ্টাদৃষ্ট যাবতীয় পদার্থ বিষয়ে দীপ্তি পায়, আর চক্ষুরাদির অতীত যে পরমেশ্বর তাঁহাকে বুদ্ধিদ্বারা জানা যায়। অতএব সবশাস্ত্রে সবলোকে মনুষ্যদেহকে উত্তম কহিয়াছেন। এই বুদ্ধি ব্যক্তিবিশেষে কোন দোষবশতঃ স্থূলা, গুণবিশেষপ্রযুক্ত সূক্ষ্মা হয়েন, সেই সূক্ষ্মতা যাহার দ্বারা হয় তাহাকে উপায় বলা যায়। এই বুদ্ধিকে মনুষ্য-গোমহিষ্যাদি আধারের বিভিন্নতায় নানা কহিয়া থাকেন; ফলতঃ

সর্বসাধারণের এক, যেমত এক বায়ুকে শরীরের মধ্যে স্থান বিশেষে স্থিতিতে প্রাণবায়ু উপাদানবায়ু ইত্যাদি নানা প্রকার বলা যায়, তাহার ন্যায় এক বুদ্ধিকে আধারভেদে নানা কহিয়া থাকেন।"

উল্লিখিত অংশটি অনায়াসে রামমোহনের রচনা ব'লে চালান যেতে পারে। **ব্রজমোহন মজুমদার (দেব)** রচিত 'পথ্যপ্রকাশ' (১৮৪২) এজাতীয় গদ্যে রচিত। এই ব্রজমোহন ছিলেন রাজার একজন পার্শ্বচর। 'পথ্যপ্রকাশ' তিনি রামমোহনের ব্যবহৃত শাস্ত্রীয় ও অন্যান্য যুক্তিতর্কের সাহায্যে প্রায় তাঁরি ভাষায় মূর্তিপূজার অসারতা প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করেছেন। নিচে এ বই থেকেও কিয়দংশ উদ্ধার করা হল :—

"যদি বল, যুক্তিসিদ্ধ অথবা শাস্ত্রসিদ্ধ হউক অথবা না হউক, পিতৃপিতামহ যাহা করিয়া আসিয়াছেন, তাহাই করিব। উত্তর। তোমরা পুত্তলিকা লইয়া খেলাইবার নিমিত্ত পিতৃপিতামহের নাম উল্লেখ করহ, নতুবা কি লৌকিক কি পারমার্থিক কোন বিষয়ে আপন আপন পিতৃপিতামহের ব্যবহারানুসারে অতি অল্প কর্ম করিয়া থাক, এ অতি আশ্চর্য। তোমাদের মধ্য যাহাদের পিতৃপিতামহ সৎকর্মান্বিত এবং বিদ্যাব্যবসায়ী ছিলেন, এমন সহস্র সহস্রকে দেখিতেছি, তথাপি তাহারা পিতৃপিতামহের ধর্মকে উল্লঙ্ঘন করিয়া ঘোর বিষয়ী হইয়া ম্লেচ্ছের দাসত্ব করিতেছেন। * * * কাহারো পিতৃপিতামহেরা দেবলক্রিয়া করিতেন, তাহার সন্তানেরা অশূদ্র-প্রতিগ্রাহী হইয়াছেন। যাহার পিতৃপিতামহ শাক্ত বরঞ্চ বামাচারী ছিলেন তাহার সন্তানেরা বৈষ্ণব বরঞ্চ চৈতন্য-সম্প্রদায়ী হইয়াছেন। * * * অতএব পিতৃপিতামহের রীতির অন্যথা সর্ব্বদা কর, কেবল পরমেশ্বরের উপাসনা করিতে হইলে পিতৃপিতামহের নামস্বরূপ ঢালকে অবলম্বন কর।"

সাময়িকপত্র পর্বের রচনার এ নিদর্শনটিকে সর্বশেষে স্থান দিতে দেখে কেউ যেন মনে না করেন এই ছিল সে সময়ের গদ্য রচনার সর্বোত্তম

পরিণতি 'পথ্যপ্রকাশ'। ১৮৪২ সালে প্রকাশিত হলেও এর রচনা একটু প্রাচীনত্বগন্ধী। সাময়িক-পত্র পর্বের গদ্য রচনার প্রশংসনীয় নিদর্শন হচ্ছে গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ এবং প্রেমচাঁদ রায়ের গ্রন্থদ্বয়। এই দু'খানি বইএর গদ্যে যে যে ত্রুটি ছিল সে সকল সংশোধন ক'রে বিষয়গৌরবের সাহায্যে বাংলা গদ্যকে ইংরাজী-শিক্ষিতদের সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করাতেই হ'ল 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র কৃতিত্ব। এ কৃতিত্বের কথাই সবিস্তারে আলোচিত হবে পরবর্তী অধ্যায়ে।

# দশম অধ্যায়

## দেবেন্দ্র অক্ষয় পর্ব্ব ( ১৮৪৩—১৮৫৫ )

রামমোহন যুগের শেষের দিকেই বাংলার সাহিত্যিক গদ্য তার শৈশবকাল অতিক্রম করে কৈশোরে পৌঁছেছিল। রচনার সুপরিচিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত রীতি বিশেষের অভাবই ছিল এ যুগের বিশেষত্ব। কখনো সমাসবহুল এবং উপমা-অনুপ্রাসাদিযুক্ত শিল্পহীন পণ্ডিতী ধরণের জটিল রচনা, কখনো সমাসবিরল, অপপ্রযুক্ত শব্দময় বা অ-সংস্কৃত ( দেশী ও ও বিদেশী ) শব্দের প্রক্ষেপযুক্ত সরল বাগ্‌বিন্যাস এবং কখনো বা এসবের অল্পবিস্তর মিশ্রণ, এ যুগের গদ্যে প্রায়শ দেখা যেত। এ যুগের শেষাংশেও লিখনভঙ্গীর সঙ্গে আলোচ্য বিষযেব স্বাভাবিক সামঞ্জস্য বিশেষ সুলভ ছিল না। মাঝে মাঝে নিতান্ত হাল্‌কা আটপৌরে বিষয়ের বর্ণনাযও আড়ম্বরপূর্ণ সমাসাদিযুক্ত সংস্কৃত শব্দের বাহুল্য দেখা যেত। আর স্বাভাবিক ছন্দসুষমাও বাক্যে সুপ্রাপ্য ছিল না। বাংলা গদ্যের এ বিসদৃশ অবস্থা বহুলাংশে দূর হ'ল 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রকাশের পর থেকে। এ কাগজের অসাধারণ কৃতকার্যতার মূল কারণ হলেন এর প্রথম সম্পাদক **অক্ষয়কুমার দত্ত** ( ১৮২০-১৮৮৬ ) এবং প্রতিষ্ঠাতা **দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর** ( ১৮১৭-১৯০৫ )। এ দুজনের ব্যক্তিত্ব, পরিশ্রম এবং ঐকান্তিক যত্নের বলেই 'তত্ত্ববোধিনী' বাংলা গদ্যের সংস্কারে এতটা সাহায্য করতে পেরেছিল। কিন্তু কেবল পরিচালকদের অসামান্য ব্যক্তিত্ব ও যোগ্যতার ফলেই 'তত্ত্ববোধিনী' শক্তিলাভ করে নি; এর পশ্চাতে ছিল সমসাময়িক চিন্তাধারার প্রবল প্রেরণা।

রামমোহন যুগে দেশময় যে সকল নূতন চিন্তা ও সংস্কার-কামনার সতেজ বীজ বাংলা দেশের মানসক্ষেত্রে উপ্ত হয়েছিল, প্রায় ত্রিশ বৎসর ধ'রে নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়ে যে সকল তখন অঙ্কুরিত হয়ে বিরাট্-বৃক্ষত্ব প্রাপ্তির দিকে চলেছিল। এরূপ নববিকশিত বাঙালী মনের যে জ্ঞানতৃষ্ণা ও আদর্শবাদ, তা'ও 'তত্ত্ববোধিনী'র কৃতকার্যতাকে অগ্রসর ক'রে দিয়েছে। অন্তরের মধ্যে যদি কোন শক্তিশালী ভাবপ্রবাহ থাকে, তবেই তা' প্রাণবন্ত ভাষার আত্মপ্রকাশ করে, এবং এরূপ স্বাভাবিক ভাষাই কেবল হতে পারে যথার্থ সাহিত্যের বাহন। 'তত্ত্ববোধিনী'র কালে এ রকমের শক্তিমান্ ভাবপ্রবাহ বাঙালীর মানস-ক্ষেত্রকে উর্বর করে প্রবাহিত হয়েছিল। এ প্রবাহকে ফলপ্রসূ করবার কাজে হাত দিয়েছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমার। তাই তাঁদের হাতে 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা, অন্য অনেক কাজের মধ্যে বাংলা গদ্যের সংস্কার সাধনেও সমর্থ হয়েছিল। এ সংস্কার সাধনের ব্যাপারে সকলের পুরোবর্তী হলেও 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' মোটেই একক ছিল না। এর প্রতিক্রিয়া বা অনুকরণে উৎপন্ন একাধিক সাময়িক পত্রিকা ও পুস্তক বাংলা গদ্যের উন্নতি বিধানে অল্পবিস্তর সাহায্য করেছে। তাদের মধ্যে 'বিদ্যাকল্পদ্রুম' (১৮৪৬), 'উপদেশক' ( ১৮৪৭ ), 'সত্যার্ণব' ( ১৮৫০ ), 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' ( ১৮৫১ ), 'মাসিক পত্রিকা' ( ১৮৫৪ ), 'এডুকেশন গেজেট' ( ১৮৫৬ ), 'সোমপ্রকাশ' ( ১৮৫৮ ), 'রহস্যসন্দর্ভ' ( ১৮৬৩ ), 'বামাবোধিনী' ( ১৮৬৩ ) আদির নাম উল্লেখযোগ্য। 'তত্ত্ববোধিনী'র এরূপ বিস্তৃত প্রভাবের জন্যই এ পত্রিকার আবির্ভাবকাল (১৮৪৩) থেকে 'বঙ্গদর্শনে'র আরম্ভকাল ( ১৮৭২ ) পর্যন্ত সময়কে বাংলা গদ্যের **তত্ত্ববোধিনী যুগ**' নাম দেওয়া যেতে পারে। আবার এ তত্ত্ববোধিনী যুগের প্রথমার্ধকে বলা যায় **দেবেন্দ্র-অক্ষয়পর্ব** (১৮৪৩-১৮৫৫); কারণ এ বারো বছরে বাংলা গদ্যের যে উন্নতি হয়েছিল তাঁর মূল কারণ তত্ত্ববোধিনীর প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক দেবেন্দ্রনাথ, এবং সম্পাদক অক্ষয়কুমার।

## (ক) দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৮৪১ অব্দে দেবেন্দ্রনাথ তত্ত্ববোধিনী সভার সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তাই তাঁর সর্বপ্রথম গদ্য রচনা। এ বক্তৃতার কিয়দংশ নিচে দেওয়া গেল :—

ঈশ্বর সাধনা নিমিত্তে এই তত্ত্ববোধিনী সভা স্থাপিতা হইয়াছে। ঈশ্বরজ্ঞান না হইলে ঈশ্বরারাধনা হয় না, এবং একাকী নির্জ্জনে জ্ঞানালোচনার উপায় বিরহে জ্ঞানোপার্জ্জনও হয না, অতএব এই সভা যে উপকারিণী ইহা বিশেষ বোধ হইতেছে। যদিও ঈশ্বরারাধনা গুপ্ত এবং প্রকাশ্য উভয় স্থানেই উত্তমরূপে নির্বাহ হইতে পারে, যদিও যাহার ঈশ্বর ভক্তি আছে, কি সজনে কি নির্জ্জনে তাহার ঈশ্বরভক্তিরূপ দীপশিখা কখন নির্বাণ হয না, প্রকাশ্যে ভজনা করিলে আপনার ও অন্যের একেবারে উপকার হয়। নির্জ্জনে তাঁহার দৃষ্টান্ত কেহ গ্রহণ করিতে পারে না এবং তাঁহার নিকটে ঈশ্বর-জ্ঞানোপযোগী বাক্য শুনিয়া কেহ তৃপ্ত হইতে পারে না। সভাতে সকলের সহিত ঈশ্বরারাধনা করিলে ঈশ্বর ভক্তির দৃঢ়তা হয়, পরস্পর জ্ঞানালোচনায় জ্ঞানের প্রকাশ অধিক হয়, স্বধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিদিগের একস্থানে মিলন জন্য আত্মীয়তা এবং প্রণয়ের বৃদ্ধি হয়, আত্মীয়তা এবং প্রণয়ের বৃদ্ধি হইলে অজ্ঞানাবৃত ব্যক্তিদিগকে জ্ঞান দিবার অনেক উপায় করিতে পারি, অথচ এই প্রকাশ্য ভজনা নির্জ্জন ভজনায় প্রতিবন্ধক নহে, এবং সর্বতোভাবে প্রবৃত্তিদায়ক।"

বক্তৃতাংশটি পড়লে মনে হয় যে, বিদ্যাসাগরেরও ছয় বছর আগে দেবেন্দ্রনাথের রচনা "গ্রাম্য পাণ্ডিত্য এবং গ্রাম্য বর্বরতা"র হাত থেকে আপনাকে নির্মুক্ত করেছিল; বাংলা ভাষার পূর্বকালীন সমাসাড়ম্বর থেকেও তা সে সময় থেকেই মুক্ত, এর শব্দবিন্যাসরীতিও বাংলা গদ্যের স্বাভাবিক ছন্দ-অনুসারে। দেবেন্দ্রনাথ যে তাঁর প্রথম রচনার মধ্যেই বাংলার সর্বজন-ব্যবহার্য গদ্যের রূপটিকে বহুলাংশে আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। এ রূপটি যে রামমোহনের লেখা থেকে আরম্ভ ক'রে ধীরে ধীরে তাঁর অনুবর্তী লোকদের লেখায় ক্রমশ ফুটে

উঠছিল তা আগেই দেখা গিয়েছে। দেবেন্দ্রনাথের প্রবর্তিত গদ্য এদের সকলের লিখন ভঙ্গীর বা রীতির চেয়ে পূর্ণাঙ্গ। এতেই সর্বপ্রথমে সুস্পষ্ট সাহিত্যিক রীতি দেখা দিয়েছে। বাঁশবেড়িয়াতে 'তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা' স্থাপন ( ১৮৪৩ ) উপলক্ষে দেবেন্দ্রনাথ যে বক্তৃতা করেন তা আরও সুন্দর। এর কিয়দংশ নিচে উদ্ধৃত করা গেল :—

> "যে বৃহৎ পৃথিবীর উপরে আমরা বাস করিতেছি ইহার আকৃতি কি ? সূর্য্য চন্দ্র প্রভৃতি এই পৃথিবীর কত দূরে আঁছেন ? সূর্য অস্ত হইয়া কোথায় লুপ্ত হয়েন ? এবং পুনর্বার সূর্য্য পূর্বদিক হইতে কি প্রকারে নিযমিতরূপে উদিত হয়েন ? চন্দ্রের পরিমাণে হ্রাস বৃদ্ধি কেন হয ? প্রবল সমুদ্র আপনার নিয়মিত সীমাকে উল্লঙ্ঘন কেন করিতে না পারে ? শূন্য হইতে জলের উৎপত্তি কি প্রকারে হয় ? ঈশ্বরের এই প্রকারে আশ্চর্য্য সৃষ্টির নিয়ম এই সভাস্থ ব্যক্তিদিগের মধ্যে কাহার না জানিতে ইচ্ছা হয় বিবিধ বিদ্যালয়ে এইক্ষণে বালকেরা এই সমস্ত জ্ঞানেরই অভ্যাস করিতেছে। কোন গ্রন্থকর্ত্তা লিখিয়াছেন তাহার বাক্যকেই প্রমাণ করিয়া সৃষ্টির রচনা জানিতেছে এমত নহে কিন্তু সেই গ্রন্থকর্ত্তার সিদ্ধান্তকে প্রত্যক্ষ পরীক্ষাদ্বারা মান্য করিতেছে। এইরূপে বালক-কালে অত্যন্ত নিপুণরূপে বিচিত্র সৃষ্টির রচনা বিষয়ে অনুশিষ্ট হইয়া জ্ঞানের উদ্রেকে ঈশ্বরের মাহিমা কতক জানিতে শক্য হয়, তখন তাহারদিগের বোধ হয় যে এই অনন্ত সৃষ্টির স্রষ্টা এবং নিয়ন্তা অবশ্য একজন আছেন যিনি অনন্তস্বরূপ, কারণ অনন্ত সৃষ্টির স্রষ্টা অনন্ত-স্বরূপ ভিন্ন সম্ভব হইতে পারে না ; এবং সুতরাং তাঁহার আকার নাই, কারণ যাহার আকার স্বীকার করা যায় তাঁহাকে আর অনন্ত বলা যায় না ; এবং তিনি জ্ঞানস্বরূপ, কারণ কোন জড় বস্তুর দ্বারা এ অচিন্তনীয় রচনার রচনা হইতে পারে না ; এবং এমত যে নিরাকার নির্বিকার আনন্দস্বরূপ অন্তরস্থিত পরমেশ্বর তাঁহার প্রতি আন্তরিক ভক্তি ও শ্রদ্ধা ও তাঁহার নিয়ম প্রতিপালন ভিন্ন তাঁহার উপাসনা হইতে পারে না।"

এ বক্তৃতাংশটির স্থানে স্থানে দু' একটি কঠিন শব্দ এবং এর ব্যাকরণগত প্রাচীনত্বের কথা বাদ দিলে একে প্রায় অনায়াসে আধুনিক সাধু ভাষার গদ্য ব'লে চালানো যেতে পারে। কিন্তু এর সম্বন্ধে এ সর্বোচ্চ প্রশংসা নয়। সুন্দর রীতিক্রমও এতে কিয়ৎ পরিমাণে দেখা দিয়েছে।

এই ১৮৪৮ সালে প্রকাশিত তাঁর কৃত ঋগ্বেদের অনুবাদের ভাষা বেশ প্রাঞ্জল এবং সুখপাঠ্য। নিচে এর কিছু উদ্ধৃত করা গেল :—

হে শোভনীয় বায়ু, এই যজ্ঞে আগমন কর। তোমার নিমিত্ত এ সোমলতার রস সংস্কৃত হইয়া রহিয়াছে। তুমি আসিয়া পান কর। আমারদিগের এই আহ্বান শ্রবণ কর।

হে বায়ু, যাঁহারা অহঃ নামক যজ্ঞ জানেন এবং সোমলতাকে অভিষুত করেন এমত স্তোতারা স্তোত্রদ্বারা তোমাকে লক্ষ্য করিয়া স্তব করেন।" ১।১।২

তাঁর চব্বিশ থেকে আরম্ভ করে একত্রিশ বছর বয়সের রচনার যে সকল নমুনা উদ্ধৃত হ'ল সে সকল থেকে তাঁর গদ্য রচনার উৎকর্ষ ও বৈশিষ্ট্য বোঝা যাচ্ছে। এই বৈশিষ্ট্য হ'ল, দীর্ঘসমাস-বিরল ও জটিলতাহীন বাক্যের দ্বারা প্রাঞ্জলভাবে মনের ভাব প্রকাশ এবং স্থানে স্থানে স্বল্প অলঙ্কার প্রয়োগে বাক্যের সরসত্ব সম্পাদন। তাঁর রচনার বিশেষত্ব পরবর্তী কালের বক্তৃতাদিতে আরো ভালো করো প্রকাশ পেয়েছে। ব্রাহ্ম সমাজে প্রদত্ত নানা উপদেশ ও ব্যাখ্যানাদি এ প্রসঙ্গে পঠিতব্য। যুগপৎ বিরাজমান ভাবের গাম্ভীর্য্য এবং ভাষার প্রাঞ্জলতার জন্যে তাঁর এই রচনাগুলি বহুকাল যাবৎ বাংলা গদ্য সাহিত্যের মহার্ঘ সম্পৎ ব'লে গণ্য হবে।

পরমেশ্বর যে সমগ্র সৃষ্টিকে কিরূপে ধারণ ক'রে আছেন তা বলতে গিয়ে দেবেন্দ্রনাথ লিখেছেন ( ১৮৬১ ) :—

"তাঁর অধিকার সর্বত্রই ; তিনি সর্বসাক্ষীরূপে, অন্তরে বাহিরে, সর্বত্র রহিয়াছেন। যদি উচ্চ পর্বতশিখরে আরোহণ করিয়া তাহার পশ্চাতে অভ্রভেদী আর এক পর্বতশৃঙ্গ দর্শন করি, সেখানে তাহার গম্ভীর ভাব দেখিতে পাই। যদি সমুদ্রতটে দণ্ডায়মান হইয়া সমুদ্রের

ফেনময়, প্রবল তরঙ্গরাজি নিরীক্ষণ করি, সেখানেও তাঁহার রাজত্ব দেখি। যদি নদীকূলের বৃক্ষচ্ছায়া হইতে নদীর লহরীলীলা দেখি, সেখানেও তাঁহার আনন্দলীলা দেখিতে পাই। তিনি সকল দেশেতে সমানরূপে বিদ্যমান। তিনি সকল কালে সমানরূপে বিদ্যমান। তাঁহার নিকটে তামসী নিশা, আর মধ্যাহ্ন দিবস, উভয় সমান। তিনি আত্মার অন্তরতম প্রদেশে অধিষ্ঠান করিতেছেন। তিনি শোভার আকর, সৌন্দর্য্যের সাগর। সকলেই তাঁহার সৌন্দর্য্য হইতে সৌন্দর্য্য ধারণ করিতেছে; তাঁহার প্রভাবে প্রভাকর প্রভা দিতেছে—সুধাকর সুধা বর্ষণ করিতেছে—বিদ্যুৎ মেঘের অন্ধকার মধ্যে আলো দিতেছে।"

পরম ব্রহ্মের আনন্দময় রূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে দেবেন্দ্রনাথ লিখেছেন ( ১৮৬০ ):—

"ভূলোকে দ্যুলোকে আকাশে অন্তরীক্ষে উষাকালে সন্ধ্যাকালে, শ্রদ্ধাবান্ একনিষ্ঠ ধীরেরা সেই স্বপ্রকাশ আনন্দস্বরূপ অমৃতস্বরূপ পরমেশ্বরকে সর্ব্বত্র দৃষ্টি করেন। উষার উন্মীলনের সঙ্গে সঙ্গে সূর্য্য উদিত হইয়া অচেতন প্রাণিগণকে সচেতন করে; রূপহীন বস্তু সকলকে রূপবান্ করে; তখন সেই জ্যোতিষ্মান সূর্য্যের মধ্যে প্রকাশবান্ বরণীয় পুরুষকে তাঁহারা দেখিতে পান। উষার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অন্তরাকাশে তাঁহার আলোক প্রকাশ পায়। যিনি সূর্য্যের অন্তরাত্মা, সকল ভূতের অন্তরাত্মা; তিমিরমুক্ত জগতের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রকাশ হয়। তরুণ সূর্য্যকিরণে সেই জ্যোতির জ্যোতিকে দেখিতে পাই উষার সৌন্দর্য্যে সেই সৌন্দর্য্যের সৌন্দর্য্য আমাদের নিকটে প্রকাশিত হন। * * * * * *

* * সকল স্থানেই তাঁহার আবির্ভাব দেখি। সূর্য্যকে জিজ্ঞাসা করি, তিনি কোথায়? সূর্য্য তাঁহাকে দেখাইয়া দেন। বনের নির্জ্জন বৃক্ষকে জিজ্ঞাসা করি, তিনি কোথায়? তাহা হইতেও উত্তর পাই। তখন দেখিতে পাই, "স এবাধস্তাৎ স উপরিষ্টাৎ, স পশ্চাৎ, স পুরস্তাৎ স দক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ।" ভূলোক ও দ্যুলোকে তাঁহার

এই মহিমা ; তিনি আনন্দরূপে, অমৃতরূপে সর্বত্র প্রকাশ পাইতেছে ; * * * সূর্য্যের অভ্যুদয়ের মধ্যে তাঁহার আবির্ভাব, সূর্য্যের অস্তমিত মহিমার মধ্যেও তাঁহার আবির্ভাব। যেমন উষাতে তেমন সন্ধ্যাতেও তাহার প্রসন্নমূর্তি প্রকাশিত রহিয়াছে, যখন রজনীর ছায়া বসুধাকে শান্তি ও বিশ্রামে নিমগ্ন করে, যখন চন্দ্রমা অনেক সহস্র রশ্মিতে উত্থিত হইয়া জ্যোৎস্না সুধা বর্ষণ করে, যখন তারকাগণ এই জগতের প্রহরীরূপে বিরাজ করিতে থাকে ; তখন তাহার মধ্যে কাহার প্রকাশ দেখা যায় ? 'যশ্চন্দ্রতারকে তিষ্ঠন্ চন্দ্রতারকাদন্তরো যং চন্দ্রতারকং ন বেদ যস্য চন্দ্রতারকং শরীরং যশ্চন্দ্র তারকমন্তরো যময়তি'।"

উল্লিখিত অংশগুলিতে গাম্ভীর্য ও সরসত্ব এ দুটি গুণই বর্তমান এবং এ দুটি গুণ বিশেষভাবে এসেছে রচনারীতির নবীনত্বের জন্যে। রামমোহন যুগের শেষের দিকে বাক্যগ্রন্থের পদ্ধতি, সমাসভার এবং সেকেলে উপমা অনুপ্রাসাদির আবর্জনা থেকে কিয়ৎ পরিমাণে মুক্তিলাভ করলেও ঐ যুগের লেখায় সাহিত্যিক রীতি নামক বস্তুটির সন্ধান কদাচিৎ মেলে। কিন্তু তত্ত্ববোধিনী যুগের প্রারম্ভ থেকেই তা বাংলা গদ্যে ক্রমশ আত্মপ্রকাশ করতে লাগল, এবং দেবেন্দ্রনাথের আর একটি বক্তৃতাযও তাঁর সুন্দর গদ্যরীতি প্রকাশ পেয়েছে।

মন শান্ত ও সমাহিত হলেই তবে তাতে ঈশ্বরের মহিমা উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, এই সত্যটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে দেবেন্দ্রনাথ বলেছেন (১৮৬১) :—

হৃদয়কে পরিষ্কার কর—পরিষ্কার করিয়া ঈশ্বরের অমৃতবারির জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাক। সময়ের নিরূপণ নাই, কখন স্বর্গ হইতে অমৃতবারি পতিত হয়—চাতকের ন্যায় প্রতীক্ষা করিয়া থাক ; যখনি সেই জল বর্ষিত হয় অমনি আগ্রহের সহিত তাহা গ্রহণ কর * * * অদ্যকার চন্দ্রমার মহিমা দেখ, তাঁহার অমৃত কিরণ সহস্রধারে বর্ষিত হইতেছে ; অদ্য রজত রঞ্জনে পৃথিবী রঞ্জিত হইয়াছে, বৃক্ষেরা হরিৎবর্ণ পরিত্যাগ কয়িয়া রৌপ্যবর্ণে শোভিত হইয়াছে। মাসে মাসে চন্দ্রের

শুভ্ররশ্মি এই প্রকারে পতিত হয়; কিন্তু কখন তাহার মাধুর্য্য অবলোকন করিয়া অনন্তের মহিমা অবলোকন করি? তোমারদিগকে জিজ্ঞাসা করি—তোমারদের মধ্যে যাঁহারা গঙ্গাতীরের শুভ্র চড়ার উপরে চন্দ্রকিরণ ভোগ করিয়াছ, তাঁহারদিগকে জিজ্ঞাসা করি যে গঙ্গাতীরে একাকী কি দুই চারি বন্ধুর সঙ্গে, ভ্রমণ করিতে করিতে গঙ্গার স্নিগ্ধ মারুতে শরীর যখন শীতল হইল—সকল জগৎ স্তব্ধ পুলকে চন্দ্রের অমৃত কিরণ পান করিতেছে, দেখিয়া মন যখন আর্দ্র হইল, এমন সময়ে কাহারও মনে অনন্তের মহিমা উদয় হয় নাই?"

ধর্ম ব্যাখ্যানাদিতে দেবেন্দ্রনাথের রচনাশক্তির বিশেষ স্ফুরণ হলেও তাঁর 'আ ত্ম জী ব নী' র রচনা অনেকাংশে অপূর্ব। এর সহজ সরল বাক্যবিন্যাস সোজাসুজি গিয়ে পাঠকের অন্তরকে স্পর্শ করে। এ পুস্তকের অল্প পরিসরের মধ্যে তিনি তাঁর ধ্যানপূত কর্মময় জীবনের চব্বিশ বছরের (১৮শ—৪১শ) যে চমৎকার ছবি দিয়েছেন জিজ্ঞাসু পাঠকের নিকট তা প্রায় উপন্যাসের মত চিত্তাকর্ষক। মানসিক এবং আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্যের জন্যেই মহর্ষির জীবন-কাহিনী পাঠকদের চিত্ত আকর্ষণ করে বটে, কিন্তু অনবদ্য রচনা প্রণালীও এর আকর্ষণকে কম বাড়ায় নি। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা বর্ণনার তো কথাই নেই, তিনি নিজের আধ্যাত্মিক দ্বন্দ্বাদির কথাও এমন সুন্দর ভাষার প্রকাশ করেছেন যে পাঠকের মনশ্চক্ষুর সামনে তার মোটামুটি স্পষ্ট ছবি ভেসে ওঠে। তাঁর সময়কার য়ুরোপীয দর্শনশাস্ত্রের বস্তুতান্ত্রিকতা (materialism) তাঁর মনে যে আঘাত করেছিল সে সম্বন্ধে তিনি বলেছেন:—

"ভাবিলাম প্রকৃতির অধীনতাই কি মনুষ্যের সর্ব্বস্ব? তবে তো গিয়াছি। এই পিশাচীর পরাক্রম দুর্নিবার। অগ্নি স্পর্শমাত্র সমস্ত ভস্মসাৎ করিয়া ফেলে। যানযোগে সমুদ্রে যাও ঘূর্ণাবর্ত্ত তোমাকে রসাতলে দিবে, বায়ু বিষম বিপাকে ফেলিবে। এই পিশাচীর হস্তে কাহারও নিস্তার নাই। ইহার নিকট নতশিরে থাকাই যদি চরম কথা হয় তবে তো গিয়াছি। আমাদের আশা কৈ, ভরসা কৈ? আবার ভাবিলাম, যেমন ফটোগ্রাফের কাচপাত্রে সূর্য্যকিরণের দ্বারা বস্তু প্রতিবিম্বিত হয়, সেইরূপ বাহ্য ইন্দ্রিয়দ্বারা মনের মধ্যে বাহ্যবস্তুর একটা

আভাস হয়। ইহাই তো জ্ঞান। এই পথ ছাড়া জ্ঞানলাভের আর কি উপায় আছে? য়ুরোপের দর্শনশাস্ত্র আমার মনে এইরূপ আভাস আনিয়াছিল।"

প্রকৃতির স্পর্শে মহর্ষি সময়ে সময়ে যে প্রেরণালাভ করতেন তাও তিনি বেশ কবিত্বপূর্ণ অথচ সরল ভাষায় বর্ণন করেছেন :—

"আবার সেই শ্রাবণ ভাদ্র মাসের মেঘবিদ্যুতের আড়ম্বর প্রাদুর্ভূত হইল এবং ঘন ঘন ধারা পর্ব্বতকে সমাকুল করিল। সেই অক্ষয় পুরুষেরই শাসনে পক্ষ, মাস, ঋতু, সম্বৎসর ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাঁহার শাসনকে কেহ অতিক্রম করিতে পারে না। * * * একদিন আশ্বিন মাসে খদে নামিয়া একটা নদীর সেতুর উপর দাঁড়াইয়া তাহার স্রোতের অপ্রতিহত গতি ও উল্লাসময়ী ভঙ্গী দেখিতে দেখিতে বিস্ময়ে মগ্ন হইয়া গেলাম। আহা এখানে নদী কেমন নির্ম্মল ও শুভ্র! *** এ কেন তবে আপনার এই পবিত্রতা পরিত্যাগ করিবার জন্য নীচে ধাবমান হইতেছে? * * * এই প্রকার ভাবিতেছি, এমন সময়ে হঠাৎ আমি আমার অন্তর্য্যামী পুরুষের গম্ভীর বাণী শুনিলাম—তুমি এ উদ্ধতভাব পরিত্যাগ করিয়া নদীর মত নিম্নগামী হও। তুমি যে সত্য লাভ করিলে, যে নির্ভর ও নিষ্ঠা শিক্ষা করিলে, যাও পৃথিবীতে গিয়া তাহা প্রচার কর।"

স্থানে স্থানে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনায় তাঁর গদ্য রচনা কাব্যের স্তরে উন্নীত হয়েছে। যেমন অমৃতসর প্রবাসের কাহিনী প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন :—

"অরুণোদয়ে প্রভাতে আমি যখন সেই বাগানে বেড়াইতাম, যখন আফিমের শ্বেত, পীত, লোহিত ফুল সকল শিশির জলের অশ্রুপাত করিত, যখন ঘাসের রজতকাঞ্চন পুষ্পদল উদ্যানভূমিতে জরির মছলন্দ বিছাইয়া দিত, যখন স্বর্গ হইতে বায়ু আসিয়া বাগানে মধু বহন করিত, যখন দূর হইতে পাঞ্জাবীদের সুমধুর সঙ্গীতস্বর উদ্যানে সঞ্চরণ করিত, তখন তাহাকে আমার এক গন্ধর্ব্বপুরী বোধ হইত।"

আগ্রাতে তাজমহল দেখে দেবেন্দ্রনাথ খুব স্বল্প কথায় তার যে বর্ণনা

দিয়েছেন তাও তাঁর রচনায কাব্যগুণের এক শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। তিনি লিখেছেন :—

> "আগ্রায় আসিয়া 'তাজ' দেখিলাম। এ তাজ পৃথিবীর তাজ। আমি তাজের একটা মিনারের উপর উঠিয়া দেখি, পশ্চিমদিকে সমস্ত রাঙা করিয়া সূর্য্য অস্ত যাইতেছে। নীচে নীল যমুনা। মধ্যে শুভ্র স্বচ্ছ তাজ সৌন্দর্য্যের ছটা লইযা যেন চন্দ্রমণ্ডল হইতে পৃথিবীতে খসিয়া পড়িয়াছে।"

উপরে যে সকল নমুনা উদ্ধৃত হ'ল সে সকল থেকে দেবেন্দ্রনাথের গদ্য রচনায় গুণোৎকর্ষ ভালো করেই বোঝা যাওযার কথা, কিন্তু এ সত্ত্বেও বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁর কৃতিত্ব যে তেমন করে স্বীকৃত হয নি, এর কারণ মনে হয তাঁর লেখার বিষযবস্তু। ভাষাবিশুদ্ধি ও উৎকৃষ্ট রচনারীতির দাম সাধারণ পাঠকপাঠিকার নিকট খুবই কম। প্রথমত ও প্রধানত তাঁরা চান গল্প উপন্যাস, তার পরে লৌকিক জ্ঞানের কথা। ধর্ম বিষয়ক বা আধ্যাত্মিক কথার বক্তা ও শ্রোতা উভয়ই দুর্লভ। বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়-কুমারের সাহিত্যিক খ্যাতি যে দেবেন্দ্রনাথের চেয়ে অনেক বেশি, এই তার কারণ ব'লে মনে হয। অক্ষয়কুমারের সাহিত্যিক খ্যাতি দেবেন্দ্র-নাথের চেয়ে বেশি হযে দাঁড়ালেও, গদ্যলেখক হিসাবে দত্তমহাশয়কে লোকপরিচিত করার কৃতিত্ব দেবেন্দ্রনাথেরই। শুধু তাই নয় গোড়ার দিকে তিনি বিশেষ শ্রম স্বীকারপূর্বক অক্ষয়কুমারের রচনার সংশোধন ক'রে দিতেন। দেবেন্দ্রনাথের সাহিত্যিক গুণপনা ঐতিহাসিকদের চোখে তেমন বড় হযে দেখা না দিলেও বাংলা গদ্য সাহিত্যের উপর তাঁর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব হয়ত নগণ্য নয়। অক্ষয় কুমারের উপর তাঁর প্রভাবের কথা একটু আগেই আলোচিত হয়েছে। এ প্রভাবের ফলে অক্ষয়কুমারের রচনা থেকে অনুপ্রাসপ্রিয়তা এবং অস্বাভাবিক সংস্কৃতগন্ধ (Sanskritism) বিদায লাভ করেছিল। তাঁর সর্বপ্রথম প্রকাশিত পুস্তক 'ভূগোলে'র ভূমিকার সঙ্গে পরবর্তী কালের রচনার তুলনা করলেই এ কথাটি বোঝা যাবে। **ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের** 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'তেও উল্লিখিত দোষ দুটি ছিল, কিন্তু পরবর্তী রচনায়

যে, সে সকল অনেকটা কমে গিয়েছিল তা খুব সম্ভব দেবেন্দ্র নাথের প্রভাবে। সে যাই হোক বিদ্যাসাগরের উপর তাঁর প্রভাব স্বীকার না করলেও কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। সুপ্রসিদ্ধ 'আলালী' ভাষার উদ্ভাবক **প্যারীচাঁদ মিত্রের** উপর দেবেন্দ্রনাথের গদ্যের বিশেষ প্রভাব ছিল। এ 'আলালী' গদ্যই বিদ্যাসাগরী রীতির ক্রমিক তিরোধানে এবং বঙ্কিমের নিজস্ব রীতির উদ্ভবে সাহায্য করেছিল। এ ছাড়া **রাজনারায়ণ** ও **কেশবচন্দ্রের** লেখায় এবং দেবেন্দ্রনাথের কৃতী পুত্রকন্যাগণের (**দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, স্বর্ণকুমারী** এবং বিশেষভাবে **রবীন্দ্রনাথের**) গদ্য রচনায় তাঁর প্রভাব যে কাজ করেছিল এবং তা যে বাংলা গদ্যকে সমৃদ্ধ করার পক্ষে বিশেষ কার্যকরী হয়েছে এ কথা স্বীকার করতেই হবে। তা ছাড়া বঙ্গের নানা স্থানে দেবেন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত (আদি) ব্রাহ্ম সমাজের যে শাখাগুলি স্থাপিত হয়েছিল সে সকলও তাঁর প্রবর্তিত গদ্য রীতিকে প্রচার করবার বিশেষ সাহায্য করেছে। এই সকল শাখা-সমাজের নিয়মিত উপদেশদান ও বক্তৃতাদি প্রকাশ বাংলা গদ্যের এরূপ সহায়তা প্রাপ্তির কারণ।

## (খ) রাজনারায়ণ বসু (১৮২৬—১৮৯৯)

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গদ্য রচনার প্রত্যক্ষ প্রভাব পূর্বোল্লিখিত যে সকল লেখকের উপর পড়েছিল তাঁদের মধ্যে রাজনারায়ণ বসুর কৃতিত্ব সর্বাগ্রে আলোচনার যোগ্য। কারণ এ বিষয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ প্যারীচাঁদ মিত্র তাঁর সমশ্রেণীস্থ হলেও উক্ত মিত্র মহাশয় ১৮৪৬ সালে বা তার আগে বাংলা গদ্যে কোনো রচনা প্রকাশ করেন নি। অথচ ঐ সালে রাজনারায়ণ কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের জন্য যে বক্তৃতা লিখেছিলেন তাতে অনুসৃত বাংলা গদ্যের রীতি বহুল সাধুবাদের যোগ্য। ১৮৪৭ সালে প্রকাশিত

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সর্বপ্রথম গ্রন্থ 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'র ভাষার সহিত উক্ত বক্তৃতার ভাষার তুলনা করলেই রাজনারায়ণের রচনা রীতি কী পরিমাণে উৎকৃষ্টতর তা সহজেই বোঝা যেতে পারে। এ কম প্রশংসার কথা নয়। উক্ত বক্তৃতার কিয়দংশ নিচে উদ্ধার করা গেল :—

পরমেশ্বর কেবল এই সকল আবশ্যক ও কর্ত্তব্য কর্ম্মের সাহিত সুখ সংযুক্ত করিয়া ক্ষান্ত নহেন, তিনি অনায়াসলভ্য বিবিধ সুখের সৃষ্টি করিয়া পৃথিবীকে মনোহর করিয়াছেন। কোন স্থানে বিচিত্র পুষ্পোদ্যানের সুসৌরভ ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত আমোদিত করিতেছে। কোন স্থানে বিহঙ্গ-কূজিত সুশব্দ কর্ণকুহরে অনবরত সুধা বর্ষণ করিতেছে। স্থানে স্থানে নবীন দূর্ব্বাময় ক্ষেত্র রমণীয় শ্যামবর্ণ দ্বারা চক্ষুদ্বয়কে স্নিগ্ধ করিযা তৃপ্ত করিতেছে। কুত্রাপি বা নির্ম্মল সরোবরস্থিত অরবিন্দ রূপ লাবণ্য দ্বারা চিত্ত হরণ করিতেছে। কিন্তু পৃথিবীময় এই সকল বিস্তীর্ণ সুখের দ্বারাও পরমেশ্বরের কৃপা তাদৃশ ব্যক্ত হয় না, যাদৃশ আমাদিগের দুঃখাবস্থাতে তাহার উপলব্ধি হয়। যখন চতুর্দ্দিক হইতে বিপদের দ্বারা আবৃত হই— যখন সকলে আমারদিগকে পরিত্যাগ করে, তখন তিনি পরিত্যাগ করেন না ; তিনি তৎকাল আমাদিগের মনে তিতিক্ষাকে প্রেরণ করেন, যাহার সাহায্যে আমরা সমুদায় দুঃখকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হই।'

পরবর্ত্তীকালে প্রদত্ত বহুল বক্তৃতাতে তাঁর এই গদ্য রচনার রীতি আরো উন্নত হয়েছে দৃষ্টান্ত স্বরূপে ১৮৬৫ সালের একটি বক্তৃতার কিছু অংশ নিচে দেওয়া গেল :—

যেমন গৃহের বাতায়ন উদ্ঘাটন করিলে, সূর্য্য-রশ্মি তাহাতে সহজে প্রবেশ করে, তেমনি হৃদয়-দ্বার উন্মুক্ত করিলেই ঈশ্বর-রশ্মি হৃদয়াকাশে সহজে প্রবেশ করে। তিনি ব্যতীত তৃপ্তিলাভের উপায়ান্তর নাই। তাঁহাকে ছাড়িয়া কোন স্থানেই তৃপ্তি নাই। তৃপ্তির জন্য ধনের দ্বারে উপনীত হই, ধন উত্তর প্রদান করে "তোমাকে ঐশ্বর্য্য প্রদান করিতে পারি, তোমার কোষাগার

সমৃদ্ধিপূর্ণ করিতে পারি, কিন্তু তৃপ্তিফল প্রদান করিতে সক্ষম নই।" মানের দ্বারে উপস্থিত হই, মান উত্তর প্রদান করে, "তোমাকে উচ্চ-পদে উত্থাপিত করিতে পারি, সকলেই তোমাকে সম্মান করিবে, সকলেই তোমার পদানত হইবে, কিন্তু তৃপ্তি দিতে পারি না।" * * * এইরূপে আমরা দ্বারে দ্বারে তৃপ্তির জন্য প্রকৃত সুখের জন্য ভ্রমণ করি, কোথাও তৃপ্তিফল প্রাপ্ত হই না * * * কিন্তু যিনি প্রকৃত সুখ প্রদান করিতে পারেন, তিনি হৃদয়দ্বারে আপনা হইতে আসিযা সুমধুর স্বরে তথায় প্রবেশ প্রার্থনা করিতেছেন, আমাদের পাষাণ হৃদয উদ্ঘাটিত হয় না।"

স্বয়ং নূতন সাহিত্যিক যুগের প্রবর্তক বঙ্কিমচন্দ্র ঐ ১৮৬৫ সালে প্রকাশিত তার প্রথম উপন্যাসে যে বাংলা গদ্য ব্যবহার করেছিলেন তার সঙ্গে তুলনা করলেই রাজনারাযণের উল্লিখিত গদ্য রচনার বিশেষ শক্তি ও সৌন্দর্য্য অনাযাসে বোঝা বেতে পারে।

রাজনারাযণ তাঁর 'ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা' (১৮৬৬—১৮৬৭) ও 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব' (১৮৭৩) নামক পুস্তকগুলিতেও এই ধরণের গদ্যই ব্যবহার করে গেছেন। তবে তাঁর 'সেকাল আর একাল' (১৮৭৪), 'আত্মচরিত' (১৮৮২) এবং 'গ্রাম্য উপাখ্যান' (১৮৮৩ সালে লিখিত) ১ এর চেয়ে একটু হাল্‌কা ভাষায় লিখিত। নিচে শেষোক্ত বইখানি থেকে কিছু অংশ উদ্ধার করা যাচ্ছে:—

কবি পুরাবৃত্ত লেখক ও রাজনীতিজ্ঞ সার ওয়াল্‌টার রেলে (Sir Walter Raleigh) কারারুদ্ধাবস্থায় পৃথিবীর ইতিহাস রচনাকার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। একদিন তাঁহার কারাগৃহের একতলাতে একটি কলহ উপস্থিত হয়। কলহ শেষ হইলে যখন যে ব্যক্তি রেলের দ্বিতলস্থ গৃহে আগমন কবিল, তাঁহাকে তিনি ঐ কলহের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন

---

১। রাজনারায়ণের আধুনিক জীবনী লেখকেরা এই বইখানির সন্ধান পান নি। এ গ্রন্থখানি বাং ১২৯০ সালে অধুনা লুপ্ত সুরভি' নামক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। পরে ১৯১৪ সালে এ বই পুস্তকারেও পুনর্মুদ্রিত হয়।

বিবরণ দিল। রেলে বলিলেন, "যে ঘটনা প্রায় আমার সম্মুখে ঘটিল তাহার প্রকৃত বৃত্তান্ত যখন আমি পাইলাম না তখন হানিবল, সিপিও ও সিজারের প্রকৃত বৃত্তান্ত পাওয়া যাইতেছে তাহা কি করিয়া বলা যাইতে পাবে?" কবি, উপন্যাসলেথক ও পুরাবৃত্ত রচয়িতার ত এই কথা গেল। দার্শনিকও গাঁজাখোর। তিনি সৃষ্টিকর্ত্তার ন্যায় আপনাকে সর্ব্বস্ব মনে করিয়া সৃষ্টির নিগূঢ় তত্ত্ব বিষয়ে স্বীয় কুলকুণ্ডলিনী হইতে কত মত উদ্ভাবন করেন, পরকালে যখন তাঁহার জ্ঞান অনেক উন্নত আকার ধারণ করিবে ও গাঁজার ঝোঁক ভাঙ্গিবে তখন ঐ সকল মত অনেক পরিমাণে গাঁজামূলক ইহা তিনি বুঝিতে পারিয়া আপনা আপনি হাসিবেন এবং সে সকল ভ্রমাত্মক মত পৃথিবীতে প্রচার করিয়াছেন বলিয়া লজ্জিত হইবেন।"

এ গদ্য আধুনিক কালের সাধুভাষার যে কোনো নমুনার সঙ্গে তুলনীয়। ইহা কম প্রশংসার কথা নয়।

# একাদশ অধ্যায়

## ( গ ) অক্ষয়কুমার দত্ত

দেবেন্দ্রনাথের পরেই আলোচনা করতে হয় অক্ষয়কুমার দত্তের (১৮২০-১৮৮৬) রচনারীতির। তাঁর প্রথম গদ্যরচনা, ঈশ্বরগুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত হয়। সে রচনা দেখেই দেবেন্দ্রনাথ লেখকের খোঁজ করেন এবং এ সূত্রেই ঘটে বাংলা গদ্যের দুজন শ্রেষ্ঠ সংস্কারকের পরিচয়, আর 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র কৃতিত্বপূর্ণ পরিচালনা এ উভয়ের পরিচয়েরই ফল। অক্ষয়কুমারের প্রথম লিখিত গদ্যগ্রন্থ 'ভূ গো ল' ১৮৪১ সালে প্রকাশিত হয়। এর ভূমিকায় তিনি যে গদ্য ব্যবহার করেন তাতে মাঝে মাঝে সংস্কৃতানুকারী অনুপ্রাস ও উপমাদির ব্যবহার রয়েছে। রচনার এ লক্ষণটি হয়ত এসেছে গুপ্তকবির প্রভাবে, এবং একে দোষ বলেই গণ্য করা উচিত। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভূগোল-ভূমিকার ভাষায় অক্ষয়কুমারের নিজস্ব রচনারীতি বেশ সুপরিস্ফুট হয়েছে। নিচে উক্ত ভূমিকার কিয়দংশ উদ্ধৃত করা গেল :—

> "ইদানীং দেশহিতৈষী বিদ্যোৎসাহী মহাশয়দিগের দৃঢ় উদ্‌যোগে স্থানে স্থানে যে প্রকার প্রকৃষ্ট পদ্ধতিক্রমে বঙ্গভাষার অনুশীলন হইতেছে, তাহাতে ভবিষ্যতে এ দেশীয় ব্যক্তিগণের বিদ্যাবুদ্ধির উন্নতি হওনের বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে, কিন্তু এ ভাষায় এ প্রকার প্রচুর গ্রন্থ দৃষ্ট হয় না যে, তদ্দ্বারা বালকদিগকে সুচারুরূপে শিক্ষাদান করা যায়। এই সুযোগযুক্ত সময়ে যদি এ অকিঞ্চন হইতে কিঞ্চিৎ দেশের উপকার সম্ভবে, এই মানস করিয়া চন্দ্রসুধালোভী উদ্‌বাহু বামনের ন্যায় দীর্ঘ আশায় আসক্ত হইয়া, বহু ক্লেশে বহু ইংরেজী গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া, বালকদিগের বোধগম্য অথচ সুশিক্ষা-যোগ্য এই ভূগোল প্রস্তুত করিয়াছি।"

আধুনিক কালের শ্রেষ্ঠ গদ্য রচনার সঙ্গে এ ভাষার যতখানি তফাৎ

এ 'ভূগোলে'র অনতিপূর্বে প্রকাশিত প্রায় যে কোন গদ্য রচনার সঙ্গে এর প্রভেদ তার চেয়ে কিছু বেশি বললেই মনে হয়। এ ভাষায় গাম্ভীর্য এসেছে এবং কোন জড়তা বা ক্লিষ্টতা নেই বললেই চলে, অথচ বিদ্যাসাগরের কোন রচনাই এ সময়ে প্রকাশিত হয় নি। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে গেলে অক্ষয়কুমারের এই প্রথম রচনা বিদ্যাসাগরেরও প্রায় ছ'বছর আগে নিজেকে যুগপৎ "গ্রাম্য পাণ্ডিত্য এবং গ্রাম্য বর্বরতা" থেকে নির্মুক্ত করেছিল। এ সম্বন্ধে দেবেন্দ্রনাথের অনুরূপ কৃতিত্বের কথা আগেই উল্লিখিত হয়েছে।

খুব সম্ভব 'ভূগোল' রচনার পরে, ১৮৪১ সালেই অক্ষয়কুমার 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র বার্ষিক উৎসবে যে বক্তৃতা করেছিলেন তার গদ্য, 'ভূগোল' ভূমিকার গদ্যের চেয়েও মার্জিত। সুদীর্ঘ মিশ্র বা যৌগিক বাক্য ব্যবহার ক'রেও বাংলা গদ্য রচনাকে কেমন প্রাঞ্জল করা যায় —অক্ষয়কুমারই বোধ হয় এ বক্তৃতায় তার প্রথম পথ দেখান। এ শ্রেণীর জটিল বাক্য ব্যবহারের কৌশলকে আয়ত্তের ভিতর এনে, তিনি বাংলা গদ্যের মধ্যে যে শ্রুতিসুখকর গাম্ভীর্যের সঞ্চার করেন, তা তাঁর পূর্ববর্তীদের রচনায় প্রায় সুদুর্লভ। তাঁর তত্ত্ববোধিনী সভার বক্তৃতাটি থেকে নিচে যে অংশ উদ্ধার করা হ'ল তার থেকেই এ কথার প্রমাণ মিলবে।

"অদ্য রজনী আমারদিগের কি আনন্দদায়িনী হইয়াছে। যদ্রূপ কোন বন্ধুর উদ্যানস্থিত বা স্বহস্তরোপিত বৃক্ষ সুচারুশাখাসংযুক্ত এবং মনোহর পুষ্প ও ফলবিশিষ্ট দেখিলে মনোমধ্যে বিশেষ আনন্দের উদয় হয়, তদ্রূপ তত্ত্ববোধিনী সভা স্বরূপ বৃক্ষের এ সভাস্থ সমস্ত সভ্যরূপ শাখার শোভা এবং বিবিধ সুকর্ম্মস্বরূপ পুষ্প ও ফল দর্শনে মানসধাম অতুল পুলকে পরিপূর্ণ হইতেছে।

অদ্য পূর্ণ দুই বৎসর হইল তত্ত্ববোধিনীর জন্ম হইয়াছে, ইতিমধ্যেই যে ইনি এরূপ অসীম আনন্দের হেতু হইবেন তাহা কাহার বিশ্বাস ছিল? এইক্ষণে তাঁহার দ্বারা আমরা আশার অতীত আনন্দ ভোগ করিতেছি, কর্ষকেরা নিজক্ষেত্রে বীজ রোপণপূর্ব্বক আশাতিরিক্ত

শস্য প্রাপ্ত হইলে যেরূপ আহ্লাদের সহিত সাক্ষাৎ করে, তত্ত্ববোধিনী আমারদিগের আশাতীত ফল প্রদান করিয়া সেইরূপ সুখি করিতেছেন।"

ছন্দ যে কেবল পদ্যেরই নিজস্ব সম্পত্তি নহে, সে কথাটা প্রায়শ সাধারণ লেখকের ধারণায় আসে না। মানুষের নিশ্বাস-প্রশ্বাসের মধ্যেও ছন্দ আছে, চলবার সময়ে পা ফেলতে হয় তালে তালে; অথচ গদ্য রচনার বেলায় ছন্দ (যতি বা তাল) না মানলেও চলে এ ধারণা একেবারেই ভ্রমাত্মক। যাঁরা যথার্থ ভাষাশিল্পী, এ সম্বন্ধে অলঙ্কার শাস্ত্রের নীরবতা সত্ত্বেও গদ্যের অন্তর্নিহিত এই স্বাভাবিক ছন্দলীলার সূত্রটি সহজেই তাঁদের চোখে পড়ে। অক্ষয়কুমার যে তা দেখেছিলেন তাঁর উল্লিখিত রচনাংশ-গুলি থেকে তা স্পষ্ট বোঝা যায়। তাঁর সমকালেই যে দেবেন্দ্রনাথের দৃষ্টি এসম্বন্ধে জাগ্রত ছিল তা আগেই বলা গিয়েছে। বাঁশবেড়িয়াতে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা স্থাপনের সময় অক্ষয়কুমার যে বক্তৃতা করেছিলেন (১৮৪৩) তার ভাষা আরো ওজস্বিনী। বাংলা গদ্যের দ্বারা যে এমন বাগ্মিতা ফুটিয়ে তোলা যায় অক্ষয়কুমারই তা প্রথমে প্রমাণ করেন। নিচে এ বক্তৃতার কিয়দংশ দেওয়া হ'ল :—

"বঙ্গভাষা বিস্তার দ্বারা স্বজাতীর ধর্ম্মরক্ষার নিমিত্ত যে এইরূপ পাঠশালা স্থাপন করা কিরূপ প্রয়োজনীয় এবং কি অসংখ্যক মঙ্গল-দায়ক, তাহা কাহার না বিদিত হইতেছে? এইক্ষণে যদিও কলিকাতা নগরস্থ এবং তাহার নিকটস্থ কতিপয় গ্রামবাসি অনেক যুবক ইংরাজীভাষায় বিদ্যাশিক্ষা করিতেছে তথাপি ইহার স্থায়িত্বের প্রতি বিশ্বাস করা যাইতে পারে না, যেহেতু ইংরাজী বিদেশীয় লোকের ভাষা, সুতরাং তাঁহারা যদি দৈবাৎ এ দেশ হইতে বিরল হয়েন তবে কোন ব্যক্তি আর ইংরেজী শিক্ষা করিবেক? এবং স্বদেশীয় ভাষার গ্রন্থ এবং উপদেশকের অভাবসত্ত্বে কোন ব্যক্তি আর জ্ঞান অভ্যাস করিতে শক্ত হইবেক? আমরা আর কোন বিষয়ে আমারদিগের উপরে নির্ভর করিতে পারি না। আমরা পরের শাসনের অধীনে রহিতেছি, পরের ভাষায় শিক্ষিত হইতেছি, পরের

অত্যাচার সহ্য করিতেছি, এবং খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মের যেরূপ প্রাদুর্ভাব হইতেছে তাহাতে শঙ্কা হয় কি জানি পরের ধর্ম্ম বা এদেশের জাতীয় ধর্ম্ম হয়। অতএব এইক্ষণে আমারদিগের স্ব স্ব সাধ্যানুসারে আপন ভাষায় শিক্ষা প্রদান করা, এবং এ দেশীয় যথার্থ ধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করা অতি আবশ্যক হইয়াছে নতুবা আর কিয়ৎকাল গৌণে ইংরাজদিগের সহিত আমারদিগের কোন বিষয়ে জাতীয় প্রভেদ থাকিবেক না—তাঁহারদিগের ভাষাই এ দেশের জাতীয় ভাষা হইবেক, তাঁহারদিগের ধর্ম্মই এ দেশের জাতীয় ধর্ম্ম হইবেক, সুতরাং বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, যে হিন্দু নাম ঘুচিয়া আমার দিগকে পরের নামে বিখ্যাত হইবার সম্ভাবনা দেখিতেছি। এই সকল সাংঘাতিক ঘটনার নিরাকরণ করিতে এবং বঙ্গ ভাষায় বিজ্ঞান-শাস্ত্র এবং ধর্ম্ম-শাস্ত্রের উপদেশ প্রদান করিতে তত্ত্ববোধিনী সভা অদ্য ১৭৬৫ শকের ১৮ই বৈশাখ রবিবার এতৎ পাঠশালারূপ নবকুমার প্রসব করিলেন।”

এই বাগ্মিতাপ্রকাশের কাজে তাঁর হাতে গদ্যের যে রীতিকৌশল ফুটে উঠেছে, তা বিদ্যাসাগরের গোড়ার দিকের রচনায় সুদুর্লভ। কিন্তু কেবল বাগ্মিতা প্রকাশে নয়, ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রেও বাংলা গদ্য যেমন সুন্দর রূপ পরিগ্রহ করতে পারে, তাও হয় ত সকলের আগে দেখিয়েছেন অক্ষয়কুমার। ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’য় প্রকাশিত (১৮৪৭)। তাঁর ‘প্রা চী ন উ পা স ক সম্প্রদায়’ নামক প্রবন্ধটির গোড়ার দিকটা দেখলেই তা বোঝা যাবে। নিচে তা উদ্ধৃত করা গেল :—

“প্রথমকালে একমাত্র বেদ যখন এদেশের ধর্ম্মশাস্ত্র ছিল, তখন তদনুসারে সৃষ্টি স্থিতি লয়কর্ত্তা পরমেশ্বরের উপাসনাতে এবং যাগ-যজ্ঞাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠানে এদেশীয় লোক সকল প্রবৃত্ত ছিলেন। বিশেষতঃ সর্ব্বাগ্রে পরব্রহ্মের উপাসনাই বাহুল্যরূপে প্রচলিত ছিল।

আত্মযোগসমাযুক্ত ধর্ম্মোয়ং কৃতলক্ষণঃ।
তদ্যুগে চতুষ্পাদশ্চাতুর্ব্বর্ণস্য শাশ্বতঃ॥

বনপর্ব্ব।

ব্রহ্মযোগবিশিষ্ট যে ধর্ম্ম তাহাই সত্যের লক্ষণ, সত্যযুগে চতুর্ব্বর্গের সেই সনাতন ধর্ম্ম চতুষ্পাদ ছিল। পরন্তু পূর্ব্বে এই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্রহ্মোপাসনার নিমিত্তে কেহ কেহ নিষ্কামকর্ম্ম কেহ বা স্বর্গাদি সুখ লোভে সকাম কর্ম্মে নিযুক্ত হইতেন; তাঁহারা অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য প্রভৃতি মহৎ ও শ্রেষ্ঠ ও দীপ্যমান বস্তু সকলের আরাধনা করিতেন, ও তদ্দ্বারা ক্রমে ঈশ্বরের অসীম জ্ঞান ও মহতী শক্তিকে উপলব্ধি করিয়া এবং বৈদিক নিয়ম পালন দ্বারা ইন্দ্রিয় সকল সংযম করিয়া অনেকে জ্ঞানভূমিতে আরোহণ করিবার যোগ্যতা প্রাপ্ত হইতেন। কিন্তু এই-ক্ষণকার ন্যায় দেবপ্রতিমার উপাসনা তৎকালে প্রকাশ ছিল না।”

উল্লিখিত রচনাংশটি অলঙ্কারবর্জিত হলেও অন্তর্নিহিত প্রাঞ্জলতা ওই গাম্ভীর্য্যের জন্য বেশ সুপাঠ্য হয়েছে। কিন্তু তথ্যমূলক ও বৈজ্ঞানিক রচনা মাত্রেই অক্ষয়কুমার যে সর্ব্বদা অলঙ্কৃত ভাষা প্রযোগ করতেন তা নয়। সমাজতত্ত্ব এবং নীতিশাস্ত্রের তত্ত্ব আলোচনায়ও তিনি মাঝে মাঝে বেশ শোভাসম্পন্ন গদ্যের ব্যবহার করেছেন। যেমন তাঁর ‘বা হ্য ব স্তু র স হি ত মা ন ব প্র কৃ তি র স ম্ব ন্ধ বি চা র’ নামক গ্রন্থে মনুষ্যের মানসিক প্রকৃতি আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন (১৮৪৯):—

“পরমেশ্বর পরায়ণ ভক্তিমান্ ব্যক্তি সকল স্থানেই তাঁহাকে উপলব্ধি করিয়া তাঁহার প্রেমে মগ্ন হয়েন। ঘন বিজন কানন বা তরুশূন্য মরুদেশ, গভীর সিন্ধুগর্ভ বা জনাকীর্ণ রাজধানী, প্রখররশ্মি প্রদীপ্ত মধ্যাহ্নসময় বা ঘোরা দ্বিপ্রহরা তামসী বিভাবরী, সুশীতল সমীরবহ প্রভাতসময় বা বিহঙ্গকোলাহলকলিত শ্রান্তিহর সায়ংকাল, এবং সুললিত তরুণ যৌবন বা পরিপক্ক প্রবীণকাল, সর্ব্বস্থানে, সর্ব্বকালে ও সর্ব্বাবস্থায় পরাৎপর পরমেশ্বরকে সাক্ষিস্বরূপ দেখিয়া তাঁহার চিত্ত ভক্তিরসে দ্রবীভূত হইয়া যায়।” (তত্ত্ববোধিনী ১৭৭১ শক)।

তাঁর ‘ধ র্ম্ম নী তি’ (১৮৫২) থেকে গৃহীত নিচের রচনাংশটিও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য :—

ইন্দ্রিয়বৃত্তি ও নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিজনিত বিহিত সুখেও আমাদের সম্পূর্ণ অধিকার আছে। জগদীশ্বর জগতের কোন পদার্থ নিরর্থক সৃষ্টি

করেন নাই। আমরা ঐ সমস্ত বৃত্তিকে পরিচালিত ও চরিতার্থ করিয়া সুখ সৌভাগ্য লাভ করিব, এই অভিপ্রায়েই তিনি তাহারদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি এক এক ইন্দ্রিয় ও এক এক নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিকে অপর্য্যাপ্ত সুখের আধার করিয়াছেন। বসন্তকালে যখন পৃথিবী নানা রসে পরিপুরিত হইয়া পরমরমণীয় পুষ্পপরিচ্ছদ পরিধানপূর্ব্বক অপূর্ব্ব শোভা প্রকাশ করে, এবং পুষ্পভারাবনত তরুশাখাসকল সুমন্দ মারুতহিল্লোলে কম্পিত হইয়া অবিশ্রান্ত কুসুমবর্ষণপূর্ব্বক চতুর্দ্দিক আমোদিত করে ও বৃক্ষশাখারূঢ় বিহঙ্গসকল মুহুর্মুহু শাখাপরিবর্ত্তনপূর্ব্বক মধুর স্বরে মনের সুখে গানকরত পথিকের মন হরণ করে তখন যাহার নেত্র উন্মীলন করিবার সামর্থ্য আছে এবং শ্রবণেন্দ্রিয় স্ববশ আছে, তাহার অন্তঃকরণ সুখামৃতরসে অভিষিক্ত না হইয়া কতক্ষণ ক্ষান্ত থাকিতে পারে।” ( তত্ত্ববোধিনী ১৭৭৪ শক )

উপরে উল্লিখিত স্থলগুলিতে অক্ষয়কুমার যে সাহিত্যিক রীতি অনুসরণ করেছেন তা রামমোহন যুগের লেখকদের রচনায় দুর্লভ। এই স্থলগুলির সঙ্গে অক্ষয়কুমারের ‘স্বপ্নদর্শন’ নামক প্রবন্ধ-ত্রয়ের ভাষা তুলনীয়। এ সকল তাঁর ভাষাগত সৌন্দর্য্যবোধের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। কিন্তু কেবল সুললিত গদ্য রচনাই অক্ষয়কুমারের লিপি কৌশলের একমাত্র নিদর্শন নয়। তিনি তাঁর বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাদিতে যেমন সহজবোধ্য এবং অনাড়ম্বর গদ্য লিখেছেন তাও বেশ প্রশংসনীয়। এ বিষয়ের দৃষ্টান্তস্বরূপে তাঁর ‘প দা র্থ বি দ্যা’ থেকে কিয়দংশ উদ্ধার করা গেল :—

“যদি জগতে কেবল কতকগুলি পরমাণু ও তাহার আকর্ষণ গুণ থাকিত আর তাহার প্রতিবিধানার্থে কোন শক্তি না থাকিত তবে সমুদায় জড়পদার্থ পরস্পর দৃঢ়তর আকৃষ্ট হইয়া এই ব্রহ্মাণ্ড কেবল একটি প্রকাণ্ড জড়পিণ্ড হইত। কিন্তু তেজ নামে এক পদার্থ থাকাতে, ঐ প্রকার বিপত্তি ঘটনার নিবারণ হইয়াছে। পরমাণ সকল যেমন আকর্ষণ দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত হয়, সেইরূপ তেজদ্বারা বিযুক্ত অর্থাৎ পরস্পর দূরীভূত হয়। তেজের এই গুণকে বিয়োজন গুণ বলে।”

উদ্ধৃতাংশে বিজ্ঞানের তত্ত্ব যেমন সুপাঠ্য অথচ সরল ভাষায় ব্যাখ্যাত হয়েছে সমসাময়িক অন্য লেখকদের রচনায় সেটি সুদুর্লভ। তুলনার জন্যে ইয়েটস্ (Dr. Yates) সাহেবের 'সা র সং গ্র হ' (১৮৪৪) নামক পুস্তক থেকে কিয়দংশ নিচে দেওয়া হ'ল :—

> "কোন বস্তুতে তাপ প্রবেশ করিলে তদ্দ্বারা ঐ বস্তুর বিস্তারতা ও দ্রব্যত্ব ও বাষ্পত্ব এই তিন প্রকার তাপের বিশেষ ফল উপস্থিত হয়। কিন্তু কোন বস্তু হইতে যদি তাপ নির্গত হয় তবে তদ্দ্বারা ঐ বস্তুর সঙ্কোচতা ও কঠিনতা ও স্থূলতা এই তিন প্রকার বিপরীত ফল উপস্থিত হয়। প্রথম বিস্তারতার কথা। তাপের শক্তি জলাকর্ষণের শক্তির বিপরীত হয়, আকর্ষণ শক্তি দ্বারা জলের পরমাণু সকল একত্রীকৃত হয়, কিন্তু তাপের শক্তি দ্বারা সে সমস্ত ভিন্নীকৃত হয়, এই দুই প্রকার শক্তি দ্বারা দ্রব্যের ঘনতা ও দ্রবতা ইত্যাদি গুণ জন্মে।"

উল্লিখিত ইয়েটস্কৃত 'সারসংগ্রহে'র ভাষা যে তত নির্দোষ হয় নি, তার কারণ হয়ত এই বলা যেতে পারে যে পুস্তকখানি ইংরেজীর অনুবাদ। কিন্তু অক্ষয়কুমারের 'পদার্থবিদ্যা'ও নানা ইংরেজী গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত ও অনুবাদিত, অথচ তাঁর রচনারীতি বেশ পরিমার্জিত। তাঁর রীতিতে সংস্কৃত শব্দের বাহুল্য থাকলেও সহজবোধ্যতার হানি হয় নি। বৈজ্ঞানিক রচনাকে তত্ত্বনিষ্ঠ করতে হলে এ জাতীয় সংস্কৃত শব্দের বাহুল্য বোধ হয় অপরিহার্য। তা সত্ত্বেও স্থানে স্থানে সংস্কৃতের আতিশয্য রচনার দুর্বলতা হয়ে দাঁড়াতে পারে। অক্ষয়কুমারের রচনায় যে এরূপ অপকর্ষ কদাচিৎ ঘটেছে তা অস্বীকার করা যায় না। যেমন, তিনি স্থানে স্থানে যে সকল উৎকট সংস্কৃত শব্দ বাংলাতে চালাবার চেষ্টা করেছেন সেগুলিই তাঁর রচনারীতির অপকর্ষের নিদর্শন। যেমন 'বাহ্যবস্তু ইত্যাদি' নামক পুস্তকে তিনি 'জিজীবিষা', 'প্রতিবিধিৎসা', 'নির্ম্মিৎসা', 'জুগোপিষা', 'বিবিৎসা', প্রভৃতি যে সকল সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করেছেন, সেগুলি ব্যবহৃত হলে বাংলা গদ্য উৎকটরূপ ধারণ করবার সম্ভাবনা। এ ছাড়াও তাঁর রচনায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ত্রুটি আবিষ্কৃত হতে পারে, কিন্তু সেগুলি খুব মারাত্মক নয়। নানা শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বিচারের জন্য তিনি যে গদ্য রীতির প্রবর্তন

করে গেছেন, তাই আমাদের আধুনিক সর্বকার্যোপযোগী গদ্যের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করেছে। 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' ১ম খণ্ডের (১৮৭৯) ভূমিকায় অক্ষয়কুমার যে সাধু ভাষার গদ্য ব্যবহার করেছেন, তা আজও পুরাতনের পর্যায়ে পড়েছে বলা যায় না। এ ভাষার কিঞ্চিৎ নমুনা নিচে উদ্ধৃত হ'ল :—

> "মানব জাতির বুদ্ধি বিদ্যা যখন যেরূপ অবস্থাপন্ন হয়, তাহাদের জাতীয় ধর্ম্মও প্রায় তদনুরূপ অবস্থায় অবস্থিত হইয়া থাকে। সভ্য ও অসভ্য জাতিদিগকে সতত এক ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে দেখা যায় বটে, কিন্তু সেটি নাম মাত্র; তাহাদের ধর্ম্মজ্ঞান ও ধর্ম্মানুষ্ঠান কদাচ একরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব আদিম আর্য্য বংশীয়দিগের ধর্ম্মের অবস্থা জানিতে হইলে তাঁহাদের বুদ্ধি বিদ্যা ও সামাজিক অবস্থার বিষয় পরিজ্ঞাত হইলে ভাল হয়। কিন্তু যাহাদের সংজ্ঞামাত্রও জগতে বিদিত ও প্রচারিত নাই, তাঁহাদের সবিস্তর ইতিবৃত্ত লাভের সম্ভাবনা কি? তাঁহাদের পরিচয় প্রদানার্থ একটি হিরোডোটস্ বা যোসিফস্‌ও কস্মিন্‌কালে মহীমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করেন নাই। একটি হোমর অথবা বাল্মীকিও তাঁহাদের যশোগান ও গুণকীর্ত্তন করণাশয়ে কদাচ অবতীর্ণ হন নাই। তাঁহাদের ইতিবৃত্তই একেবারে বিলুপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছে।
>
> কিন্তু ধন্য শব্দবিদ্যা! ইয়ুরোপীয় শাব্দিকদিগকে শতবার ধন্যবাদ! আমরা ঐ মৃতসঞ্জীবনী শব্দবিদ্যাপ্রভাবে অপরিজ্ঞেয়কল্প আর্যবংশীয়দিগের কিছু কিছু পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছি।"

এই প্রাঞ্জল এবং ওজস্বিনী গদ্যরচনা এবং এর সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় উন্নতির উপযোগী বিষয় সকলের আলোচনা দ্বারা অক্ষয়কুমার তাঁর সমসাময়িক ও পরবর্তী যুগের অনেকের লেখনীকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছিলেন। বোধ হয় তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রভাব সর্বপ্রথমে পড়েছিল **রাজেন্দ্রলাল মিত্র** ও **ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের** উপর। তারপরে যে সকল গদ্য লেখক তাঁর প্রবর্তিত রীতির অল্পবিস্তর অনুসরণ ক'রে ছিলেন, তাঁদের মধ্যে **কালীপ্রসন্ন ঘোষ** ও **রজনীকান্ত গুপ্তের** নাম করা যেতে পারে।

# দ্বাদশ অধ্যায়

## ( ঘ ) কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা গদ্যের সংস্কারে **কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়** (১৮১৩-১৮৮৫) কী পরিমাণ যোগ্যতা দেখিয়েছেন ও পরিশ্রম ক'রে গেছেন, তা এ কালের বাঙালীর ভাল ক'রে জানা নেই। এ বিষয়ে তাঁর কৃতিত্ব অক্ষয়কুমার বা বিদ্যাসাগর আদির চেয়ে খুব কম ব'লে মনে হয় না। খ্রীষ্টধর্মের প্রচারের জন্য তিনি বাংলা গদ্য রচনায় হাত দিয়েছিলেন স্পষ্টত ১৮৪০ সাল থেকে। কিন্তু এ ব্যাপারের জন্যও রামমোহন রায়ের প্রভাব পরোক্ষভাবে দায়ী। হেদোর পুকুরের পশ্চিম পার্শ্বে প্রতিষ্ঠিত গির্জায় কৃষ্ণমোহন গোড়া থেকে যে সকল উপদেশ ( sermon ) বিবৃত করেছিলেন তাই তাঁর আদিমতম রচনা ব'লে মনে হয়। 'উপদেশ কথা' নামে এ রচনাগুলি ১৮৪০ সালে মুদ্রিত হয়েছিল। পুস্তকের ভূমিকায় কৃষ্ণমোহন বলেছেন যে, রাজা রামমোহন রায়ের বৈদান্তিক পুস্তিকাগুলির পুনর্মুদ্রণ এবং 'তত্ত্ববোধিনী সভা' কর্তৃক সুসমাচারের ( Gospel ) বিরোধী চেষ্টা এ দুই ব্যাপার লক্ষ্য করেও তিনি খ্রীষ্টতত্ত্বমূলক উপদেশগুলির প্রকাশ সমীচীন মনে করেছেন ( ভূমিকা পৃঃ ৩ )। এ পুস্তকের ভাষার নমুনা নিচে উদ্ধৃত করা গেল :—

"যদি বিবাদ করত কহ যে ঈশ্বরকে কেহ এই জগৎ সৃষ্টি করিতে দেখে নাই এবং সংসার এইরূপ সর্ব্বদাই আছে তবে এ তর্কের যথার্থতা কেমন করিয়া স্বীকৃত হইতে পারে; কি যানি (=জানি) যদি এই জগৎ অনাদি ও নিত্য হইয়া সর্ব্বদাই এইরূপ থাকে? উত্তর, এ বিবাদ যুক্তিসিদ্ধ নহে; কেননা প্রথমতঃ "দেখি নাই" বলিয়া ঈশ্বরকে অগ্রাহ্য করিলে ঘোর অযুক্তির কথা জন্মার, যে হেতু অনেকানেক বস্তু ও কথা আমরা না দেখিয়াও গ্রহণ করিয়া থাকি, দেহের অন্তরঙ্গ মন ও আত্মা কাহারও দৃশ্য হয় নাই, তবে কি এই ছলেতে কেহ বলিতে পারে যে আমার মন ও আত্মা নাই?

"যদি বল যে আমরা ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা মুক্তি পাইব / উত্তর / বেদান্তমতের ব্রহ্মজ্ঞানে কোন উপকার হইতে পারে না, বেদান্তশাস্ত্রের মূল কথাই অগ্রাহ্য / কেননা ইহার বচনানুসারে সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম এই সমস্ত জগৎ ব্রহ্ম, কেবল ব্রহ্মই বর্ত্তমান আছেন আর সকলি মিথ্যা ও বাস্তবিক বর্ত্তমান নহে / মনুষ্যের দেহের মধ্যে যে আত্মা আছে সেও ব্রহ্ম সুতরাং মনুষ্য ও ব্রহ্মেব মধ্যে কোন যথার্থ প্রভেদ নাই। কিন্তু এ সকল কথা কখনো গ্রাহ্য হইতে পারে না ইহাতে জগদীশ্বরের ঘোরতর নিন্দা হয় * * *।"

উল্লিখিত স্থান দুটিতে রামমোহনের 'বেদান্তগ্রন্থে"র রচনারীতির প্রভাব বেশ সুস্পষ্ট লক্ষণীয়; তবে কৃষ্ণমোহনের রচনা সরলতর। তাঁর পূর্ববর্তী কালের গদ্যচর্চার ফলেই অংশত এ সরলতা সম্ভবপর হয়েছিল; আর তাঁর রচনার প্রাঞ্জলতা অংশত ঘটেছিল ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে নিবিড় পরিচয়ের ফলে। সে যাই হোক তাঁর গোড়ার দিকের গদ্যে পূর্ববর্তী যুগের ভাষার প্রভাব বেশ সুস্পষ্ট। কোন খ্রীষ্টধর্ম বিরোধ লেখকের উত্তর স্বরূপে তিনি ১৮৪১ সালে 'স ত্য স্থা প ন ও মি থ্যা-না শ ন' নামক যে পুস্তিকা প্রকাশ করেছিলেন তাঁর গদ্যও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। এ পুস্তকের ভূমিকা থেকে কিয়দংশ নিচে দেওয়া যাচ্ছে :—

"তর্কপঞ্চাননের পুস্তক প্রকাশ হওন সময়ে অনুমান করিয়াছিলাম যে উত্তর লিখিবার প্রয়োজন নাই / কেননা প্রথমতঃ তাহার গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় রচিত হওয়াতে অত্যল্প লোকের বোধগম্য ছিল এবং গৌড়ীয় অক্ষরে মুদ্রাঙ্কিত হওয়াতে বঙ্গদেশের বহির্ভূত পণ্ডিতদের পাঠ করিবার সম্ভাবনা ছিল না / সুতরাং মিথ্যা বর্ণনাতে অনেকের বিড়ম্বনা হইবার আশঙ্কা ছিল না * * * কিন্তু পরে প্রভাকর নামক প্রসিদ্ধ সম্বাদপত্রের সম্পাদক ঐ গ্রন্থ সমাদর পূর্ব্বক বঙ্গ ভাষাতে অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিবাতে এবং বাগবাজার নিবাসী শ্রীযুত কাশীনাথ বসু গৌড়ীয় ভাষাতে খ্রীষ্টধর্ম্মের বিরুদ্ধে এক পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত করিবাতে বোধ করিলাম যে ঐ পুস্তকদ্বয়ের উত্তর রচনা করিয়া এক গ্রন্থ প্রকাশ করা আবশ্যক।"

এ পুস্তকের গদ্য কৃষ্ণমোহনের পরবর্তী রচনার তুলনায় ঢের প্রাচীনত্ব-গন্ধী এবং পুস্তকখানি **হরচন্দ্র তর্কপঞ্চানন** নামক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত লিখিত কটূক্তি সম্বলিত পুস্তকের উত্তরে লিখিত হলেও এতে পাল্‌টা কটূক্তি নেই। এ দিক দিয়ে রামমোহনের বিতর্কমূলক রচনার সঙ্গে কৃষ্ণমোহনের আলোচ্য রচনাটির বেশ সাদৃশ্য আছে।

কৃষ্ণমোহনের গোড়ার দিককার রচিত পুস্তক কয়েকখানি খ্রীষ্টধর্ম বিষয়ক হওয়ায় তাদের প্রভাব হয়ত খুব সীমাবদ্ধ ছিল, কারণ সমসাময়িক বাঙালী সমাজের (রক্ষণশীল ও উদারনীতিক) 'খ্রীষ্টানী' বিদ্বেষের কথা বেশ সুবিদিত। অতএব বাংলা গদ্য সে সকলের দ্বারা সামান্য ভাবেও উপকৃত হয়েছে কিনা সন্দেহ। কিন্তু ১৩ খণ্ড '**বি দ্যা ক ল্প দ্রু ম**' (১৮৪৬-১৮৫০) প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা গদ্যের উপর কৃষ্ণমোহনের প্রভাব পড়বার কারণ ঘটল। এ মহাগ্রন্থ বিষয়গৌরব, রচনাপদ্ধতির প্রাঞ্জলতা এবং স্বল্পমূল্যের জন্যে পাঠক সমাজের মধ্যে বিশেষ প্রচারিত হতে পারল। এরূপ সুলিখিত ও সুপ্রচারিত গ্রন্থ যে বাংলা গদ্যকে কিয়ৎ পরিমাণেও প্রভাবিত করেছিল তাতে সন্দেহ নেই। কৃষ্ণমোহনের রচনার বিশেষত্ব এই যে, এতে সমাসাড়ম্বর একেবারেই অনুপস্থিত, অথচ সংস্কৃত শব্দাবলীই তাঁর গদ্যের মুখ্য অবলম্বন। এদিক দিয়ে কৃষ্ণমোহনের লেখার রীতি 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র রচনাপদ্ধতির সঙ্গে তুলনীয়; কিন্তু এ মত প্রকাশের দ্বারা এরূপ ইঙ্গিত করা যাচ্ছে না যে, 'বিদ্যাকল্পদ্রুমে'র ভাষার উপর 'তত্ত্ববোধিনী'র ভাষার কোন প্রভাব ছিলই। সেরূপ প্রভাব থাকতেও পারে, না'ও থাকতে পারে। তবে ইংরেজী গদ্যের সঙ্গে পরিচয়ের ফলেই যে কৃষ্ণমোহন ও অক্ষয়কুমার আদির গদ্যে অনাড়ম্বর ভাব প্রকটিত হয়েছে তা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে। কিন্তু রচনায় ইংরেজীর প্রভাব পড়লেও বাংলা ভাষার স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য রক্ষার সম্বন্ধে তাঁদের দৃষ্টি বেশ সতর্ক ছিল। নিজে খ্রীষ্টধর্ম অবলম্বন করলেও কৃষ্ণমোহনের বাংলা গদ্যে মোটেই খ্রীষ্টানী গন্ধ নেই। বরং ইংরেজীর উৎকট তর্জমামূলক গদ্য যে তাঁর নিকট তিরস্কৃত ছিল এর প্রমাণ তাঁর লেখাতেই আছে।

'বিদ্যাকল্পদ্রুমে' ব্যবহৃত কৃষ্ণমোহনের ভাষার আলোচনার আগে এর বিষয়বস্তু আদির সম্বন্ধে কিছু জানা প্রয়োজন। তেরো খণ্ডে প্রকাশিত এ পুস্তকের ব্যাপক পরিচয় ছিল :—Encyclopaedia Bengalensis / or a series of publications in English and Bengali, / compiled from various sources, / on history science and literature, / edited / by the Rev. K. M. Banerjea অর্থাৎ [ বাংলা বিশ্বকোষ অথবা বহু স্থান থেকে সংকলিত, ইতিহাস জড়বিজ্ঞান এবং সাহিত্য বিষয়ক ইংরাজী-বাংলা গ্রন্থমালা, রেবঃ 'কে, এম, বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত ]। আলোচ্য গ্রন্থে কৃষ্ণমোহনের নাম সম্পাদকরূপে উল্লিখিত হলেও অধিকাংশ রচনা তাঁর নিজের কৃত ব'লেই মনে হয়। আর যে সকল রচনা তাঁর স্বকৃত নয়, সম্পাদক হিসাবে তিনিই বহুলাংশে সেগুলির দোষগুণের ভাগী। এজন্যে উপস্থিত গ্রন্থে 'বিদ্যাকল্পদ্রুমে'র যে কোন রচনাই কৃষ্ণমোহনের গদ্যরীতির দৃষ্টান্তরূপে উল্লিখিত হবে। পূর্বেই দেখা গিয়েছে যে 'বিদ্যাকল্পদ্রুম' যুগপৎ দু'ভাষায় ( ইংরাজীতে এবং বাংলায় ) রচিত। এ পুস্তকের বামদিকের পাতায় আছে ইংরাজী, আর ডান দিকের পাতায় বাংলা। বাংলা প্রবন্ধগুলিই আগে রচিত ব'লে মনে হয়। তবে দু-এক স্থানে এর ব্যতিক্রম থাকতে পারে। কিন্তু সে যাই হোক, কৃষ্ণমোহনের বাংলা গদ্যে উৎকট ইংরাজী গন্ধ খুব সুলভ নয়। তাঁর ভাষাকে অব্যবহিত পূর্ব যুগের গদ্যের তুলনায় খুব প্রশংসাই করতে হয়। গ্রন্থারম্ভেই নিজের রচনা পদ্ধতির সম্বন্ধে তিনি যে আভাষ দিয়েছেন ( ১৮৪৬ ) তাঁর নিজস্ব রচনার নমুনা স্বরূপে তাই নিচে উদ্ধৃত করা যাচ্ছে :—

"যে যে গ্রন্থ আমি রচনা করিতে প্রবৃত্ত আছি / তাহা উক্ত বিষযক কোন বিশেষ পুস্তক হইতে অনুবাদ না করিয়া / বরং নানা মূল হইতে সংগ্রহ করিতে কল্পনা করিতেছি / এইরূপ সংগ্রহ করিলে দুই প্রকারে উপকার হইতে পারে / ইহাতে প্রথমতঃ ব্যাখ্যাকারক যথার্থ অনুবাদের শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইয়া পাঠকের দুঃশ্রাব্য ও অসাধু শব্দ প্রয়োগের ভয় হইতে উদ্ধার পাইবেন, দ্বিতীয়তঃ এইরূপ সংগ্রহের

বিধানে গৌড়ীয় পাঠকের বিশেষ ব্যবহারার্থে স্বদেশীয় ধারাতে কতিপয় গ্রন্থ প্রস্তুত হইতে পারে, ইহাকে অন্বয়মুখে শ্রেয়ঃ কহিতে হইবে / কেননা গ্রন্থকারক যে ভাষাতে লিখিতেছেন তাহাতে যদি আপনি মনের কল্পনা করিতে পারেন তবে মহা লাভের বিষয় বটে / কিন্তু কেবল অনুবাদ মাত্র করিলে এ প্রকার মানসিক ব্যাপার প্রায় থাকিতে পারে না।"

"...আমার অভিপ্রায় এই যে / বঙ্গভূমির সমস্ত জাতিকে আমার শ্রোতা করি / অতএব যে কেহ পাঠ করিতে পারে সকলের হৃদ্বোধক কথা ব্যবহার করিব তথাচ রচনার মাধুর্য্য দর্শাইয়া মনোরঞ্জক শিক্ষা বিস্তার করিতে সাধ্যক্রমে ক্রটি করিব না / কিন্তু রূপক অলঙ্কারাদি রচনার শোভা স্পষ্টতার বাধক হইলে তাহার অনুরোধে বাক্যের সরলতা নষ্ট করিব না।" মঙ্গলাচরণ (বিদ্যাকল্পদ্রুম ১ম কাণ্ড ১ম খণ্ড ১৮৪৬) ১

১। The works set down in my plan are intended to be compiled gleanings from various sources, rather than literal translations from any particular books embracing the subjects to which they refer. This may, it is hoped, prove both a negative and positive advantage. It may. in the first place, relieve the translator from the fetters, in point of language, diction and style, which might otherwise insensibly force him to appear, in not a few instances, uncouth and inelegant to his readers.........It may also in the next place, ensure to Bengalee readers, a series of works composed with the special object of informing their minds and in adaptation to their own peculiar mode of thinking.........for it is alway an advantage, when the author can *think* in the language in which he is to communicate knowledge—an intellectual process which can hardly be expected in a pure translator's mind.

My object is.........to have this whole *nation for my audience*. I shall therefore strive to be intelligible to all who can read. Every exertion will be made to render the series at once instructive, elegant and interesting. But simplicity will not be sacrificed for figure and ornament, when figure and ornament may inrerfere with perspicuity ( Dedication, *p.* xiii-xiv )

কৃষ্ণমোহনের এ রচনা বেশ অনাড়ম্বর এবং সমাসবর্জিত হইলেও এতে বক্তব্য বিষয় যে খুব সুপরিস্ফুট হয়েছে তা বলা যায় না। উদ্ধৃতাংশ দুটীকে ফুটনোটে উদ্ধৃত তাদের ইংরাজী প্রতিরূপের সঙ্গে তুলনা করলেই এ কথা বোঝা যাবে। কিন্তু 'বিদ্যাকল্পদ্রুমে' এরূপ ত্রুটি খুব বেশি স্থানে দেখা যায় না। কৃষ্ণমোহনের রচনারীতির প্রধান গুণ সরলতা ও গাম্ভীর্য তাঁর গ্রন্থের যে কোন অংশেই লক্ষ্যগোচর হতে পারে। যেমন কালিদাস সম্বন্ধীয় কোন গল্পের বর্ণনায় তিনি লিখেছেন ( ১৮৪৬ ):—

> "বিক্রমাদিত্য রাজসভায় উজ্জ্বলরত্ন কবিবর কালিদাস একদা মৌনব্রত করিয়া এক নির্দ্দিষ্ট তিথির স্থিতি পর্য্যন্ত কথা না কহিতে প্রতিজ্ঞা করিযা ছিলেন, এবং সংকল্পিত ব্রত পালনে কোন বিঘ্ন না জন্মে, এই অভিপ্রায়ে নগরীর গোল ও কোলাহলযুক্ত স্থান পরিত্যাগ করিয়া নির্জন বনে গমন করত একাকী দিবাবসান পর্য্যন্ত অবস্থিতি করিতে স্থির করিলেন। সেখানে চতুর্দ্দিকস্থ বৃক্ষ ও বন দৃষ্টিগোচর হওয়াতে তাহার চিত্তে কত ২ ভাবের উদয় হইতে লাগিল, চন্দ্রের শীতল রশ্মি দ্বারা যে ২ রম্য বস্তুর শোভা প্রকাশমান হইতেছিল তাহা তিনি দার্শনিক কবির চক্ষুতে অবলোকন করণে প্রবৃত্ত হইলেন।"
> ( ৩য় কাণ্ড ১ম খণ্ড )

উল্লিখিত রচনার ভাষায় সঙ্গে আধুনিক সাধুভাষার গদ্যের প্রভেদ খুব বেশি নয়। অথচ কৃষ্ণমোহন যখন ( ১৮৪৬ ) এ গদ্য চালিয়ে ছিলেন তখনো বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কোন গ্রন্থই প্রকাশিত হয় নি। রবীন্দ্রনাথের কথায় বলতে গেলে ইনিও বাংলা গদ্যকে "গ্রাম্য পাণ্ডিত্য এবং গ্রাম্য বর্ব্বরতা"র হাত থেকে রক্ষার সাহায্য করেছেন। এ বিষয়ে তাঁর কৃতিত্ব দেবেন্দ্রনাথ এবং অক্ষয়কুমারের কৃতিত্বের সঙ্গে তুলনীয়। সংস্কৃতের বিপুল সমাসাড়ম্বর এবং পর্যুষিত উপমাদিকে না টেনেও যে, রচনাকে কেমন হৃদয়গ্রাহী করা যায়, উল্লিখিত দুজন গদ্য লেখকের মত কৃষ্ণমোহনও সে বিষয়ে পথ দেখিয়েছিলেন। এ সকল গুণ সত্ত্বেও কৃষ্ণমোহন বিশুদ্ধ সাহিত্যিক রচনায় আত্মনিয়োগ করেন নি। ইতিহাস বিজ্ঞানাদির প্রচারেই তিনি তাঁর রচনাশক্তিকে মুখ্যভাবে ব্যবহার করেছিলেন। ঐতিহাসিক

নিবন্ধগুলিতে ব্যবহৃত তাঁর গদ্যের ভাষাও বেশ প্রাঞ্জল। নিচে রোমের ইতিহাস (১৮৪৮) বিষয়ক এক নিবন্ধ থেকে কিয়দংশ উদ্ধৃত হ'ল :—

"ফার্সেলিয়া ক্ষেত্রে যে যুদ্ধ হইল রোমানরা তদ্রূপ ঘোরতর সংগ্রাম পূর্ব্বে কখনও করে নাই, এবং এমত ২ মহতী সেনা অথবা এতাদৃশ কার্য্যকুশল অধ্যক্ষ কখন পরস্পর রণে প্রবৃত্ত হয় নাই, ঐ যুদ্ধের গত্যানুসারে এক পক্ষে পৃথিবী মণ্ডলের আধিপত্য স্থির হইবার সম্ভাবনা ছিল, পরস্পর বিরোধকারী সেনানীর মধ্যে এক পক্ষের অধ্যক্ষ গাল ও জার্মাণদিগের জয়কারী এবং অপর পক্ষীয় সেনাধ্যক্ষ যিহুদী, আরবি নাবিক দস্যু ও মিথি দেতিসের দমনকারী, .........." (৪র্থ কাণ্ড ২য় খণ্ড)

উল্লিখিত রচনার প্রাঞ্জলতা গুণ বেশ সহজেই বোঝা যায়। 'দিক্তেতর', 'কন্সল', 'সেনেটর', 'ত্রিয়ম্বির' প্রভৃতি ইংরেজী কথাকে বাংলায় চালাবার চেষ্টা এ প্রাঞ্জলতার বাধক ব'লে মনে হতে পারে, কিন্তু এ সকল কথায় খাঁটি সংস্কৃত তর্জমাতেও সে দোষের সম্ভাবনা বর্তমান। সে যাই হোক্, বাংলা গদ্য রচনায় উন্নতি সাধনের বিষয়ে কৃষ্ণমোহনের যে বেশ সুস্পষ্ট ধারণা ছিল তা তাঁর 'বিদ্যাকল্পদ্রুমে'র উপসংহার (১৮৫০) থেকে জানা যায়। এ উপসংহার থেকে প্রয়োজনীয় অংশগুলি নিচে উদ্ধৃত হ'ল :—

"শুদ্ধ স্পষ্ট এবং পরিষ্কাররূপে তাৎপর্য্য প্রকাশ করা গ্রন্থকারের উচিত / কি রচনার মাধুর্য্য এবং অলঙ্কারের নিমিত্ত প্রয়াস করা কর্ত্তব্য ? বঙ্গীয় ভাষা এখনও বিশৃঙ্খল অবস্থাতে আছে ইহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। সম্পূর্ণরূপে নিয়মবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে বহুলভাবে তাহার চর্চ্চা করা আবশ্যক এবং তাহাতে বিবিধ পুস্তক রচনা কিম্বা অনুবাদ করিবার অপেক্ষা আছে। অপর বঙ্গীয় ভাষায় বিশেষ ২ ধারা এখনও স্পষ্টরূপে অঙ্কিত হয় নাই, কালের গতিতে রচনার ধারা রূপান্তর হইয়াছে / এক শত বৎসর হইল বঙ্গ ভাষায় রচনা করিবার যে ধারা চলিত ছিল পঞ্চাশ বৎসরে তাহার রূপান্তর হয় এবং পঞ্চাশ বৎসর গত হইল যে ধারা সকলের গ্রাহ্য হইয়াছিল

তাহা এক্ষণে বিরূপ বোধ হয়। তথাপি সর্ব্বজনের মনোরঞ্জক ধারা কোন পুস্তকে পাওয়া যায় না। ভিন্ন ২ পাঠকের ভিন্ন ২ মত এবং ভিন্ন ২ ভাব / অতএব শুদ্ধতা এবং স্পষ্টতারূপ সর্ব্ববাদিসম্মত গুণ ত্যাগ করিয়া গগণপুষ্পবৎ অলঙ্কার এবং সৌন্দর্য্যের প্রয়াস করিলে মন্দ হইবার সম্ভাবনা / কেননা অলঙ্কার এবং সৌন্দর্য্যে গ্রন্থকার ব্যতীত অন্য কাহারও অধিক সন্তোষ হইবার সম্ভাবনা নাই। কোন প্রসিদ্ধ শব্দ অভ্যাস প্রযুক্ত সর্ব্বজনের কর্ণ এবং চিত্ততোষক হইলে যদি তাহাতে গ্রন্থকার কিম্বা অনুবাদকের তাৎপর্য্য শুদ্ধরূপে প্রতিপন্ন হয় তবে গ্রন্থকার আনন্দপূর্ব্বক তাহা প্রয়োগ করিবেন / এমত শব্দ প্রয়োগ না করিলে মহাদোষ হইতে পারে। কিন্তু তাৎপর্য্যের বৈলক্ষণ্য এবং স্পষ্টতার উপেক্ষা করিয়া কেবল চিত্ততোষক সমাসের অন্বেষণ করিলে / অথবা অনভ্যাস প্রযুক্ত যে ২ বচন কিম্বা ভাব আপাততঃ চিত্তরঞ্জক হয় না সে সকলই অগ্রাহ্য করিলে বঙ্গভাষার উন্নতি কখনই হইবে না।"

"পরন্তু সামান্য দ্রব্য কিম্বা ভাব প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত গৌড়ীয় গ্রন্থকার অপ্রসিদ্ধ কঠিন শব্দ প্রয়োগ করিলে তাহা হাস্যাস্পদ হইবে। কোন ২ স্থলে যদি সংস্কৃত পদ চলিত হইয়া থাকে তবে তাহা প্রয়োগ করিলে হানি নাই বরং তাহাতে রচনার পারিপাট্য হয়। কিন্তু যে স্থলে রসবিস্তার কিম্বা দীর্ঘ বক্তৃতা করা অভিপ্রেত নহে সে স্থলে অপ্রসিদ্ধ শব্দ প্রয়োগ না করিয়া সহজ শব্দ ব্যবহার করাই উচিত।

যাঁহারা গৌড়ীয় ভাষায় গ্রন্থ রচনা করেন তাঁহারদের স্মরণে রাখা কর্ত্তব্য যে যদি তাঁহারা চলিত ভাষার বিপরীত শব্দ প্রয়োগ করিতে সর্ব্বদা প্রয়াস করেন তবে গৌড়ীয় ভাষার কখন উন্নতি হইবে না। গ্রন্থরচনার শব্দ এবং চলিত ভাষা ক্রমশঃ একরূপ হইলেই শ্রেয়ঃ সম্ভাবনা। ইতর এবং মূর্খ লোকদিগের মধ্যে চলিত অপর ভাষা লিপিবদ্ধ করা কর্ত্তব্য আমার অভিপ্রায় নয়, কিন্তু সাধুভাষার অর্থ সাধু লোকের বাণী, অতএব পণ্ডিতেরা কথোপকথন কালে

অভ্যাস বশত যে যে শব্দ প্রয়োগ করেন সামান্য বিষয়ের রচনায় তদপেক্ষা কঠিন শব্দ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য হয় না।

পরন্তু সম্প্রতি উৎকট শব্দ প্রয়োগে নিবৃত্ত হওয়া সহজ নহে/ কেন না বঙ্গদেশীয় পাঠকবর্গ কথোপকথনের ধারায় রচনা দেখিলে বিরক্ত হইয়া থাকেন। আমরাও বিদ্যাকল্পদ্রুম গ্রন্থে আপনাদের এই অভিমতানুযায়ী রচনায় বারম্বার ত্রুটি করিযাছি। কিন্তু কথোপকথন এবং রচনার ধারা পরস্পরের সদৃশ করাই আমারদের তাৎপর্য্য, তদ্বিষয়ে আমরা নিতান্ত অযত্ন করি নাই, যত্ন সফল হইয়াছে কিনা পাঠকবর্গ বিচার করিবেন।" (১২শ কাণ্ড, ২য় খণ্ড)

এ সকল মতামত ও তদনুযায়ী কাজ থেকে জানা যায় যে বাংলা গদ্যের উন্নতিবিধানে কৃষ্ণমোহনের কতখানি সত্যদৃষ্টি ও আন্তরিকতা ছিল। সাহিত্য সৃষ্টির দিক দিয়ে এ আন্তরিকতা বিশেষ ফলপ্রসূ না হ'লেও বাংলা গদ্যকে সবল ও স্বাভাবিক করার দিক দিয়ে কৃষ্ণমোহনের গদ্য কিছু পরিমাণে কার্য্যকরী হয়েছিল এ অনুমান করা যেতে পারে, এবং এ জন্যেই তাঁর রচনা বাংলা গদ্যের ইতিহাসে বিশেষ প্রশংসার সঙ্গে স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। তাঁর রচনারীতিতে সঙ্গে সঙ্গেই সাহিত্য সৃষ্টি না হলেও পরবর্তী কালের লেখকদের গদ্যরীতি বিকাশে এ রীতি যে (পরোক্ষভাবে হলেও) সাহায্য করেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

# ত্রয়োদশ অধ্যায়

## ( ৬ ) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

তত্ত্ববোধিনী যুগের অন্যতম মহারথী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১)। এ যুগের লেখকদের মধ্যে তাঁর নামই সবচেয়ে সুপরিচিত, কিন্তু তাঁর লেখা শুরু হয়েছিল 'তত্ত্ববোধিনী' প্রকাশের চার বৎছর পরে। ১৮৪৭ সালে প্রকাশিত 'বে তা ল প ঞ্চ বিং শ তি'ই বিদ্যাসাগরের প্রথম সাহিত্যিক দান। হিন্দী 'বৈতাল পচ্চীসা' অবলম্বনে রচিত এ পুস্তক কাঁচা হাতের রচনা এবং গোড়ার দিকে তেমন সমাদর পায় নি[১]; কিন্তু তা সত্ত্বেও বলা যেতে পারে যে, বিদ্যাসাগরী রীতি এ গ্রন্থে প্রায় পূরোপূরি ভাবেই আত্মপ্রকাশ করেছে। কিন্তু বিদ্যাসাগরের নিজস্ব রীতি কি? কোথায় তাঁর রচনার বিশেষত্ব? দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার ও কৃষ্ণমোহনের গদ্য সম্পর্কে আলোচনায় দেখা গিয়েছে যে, বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যে হাত দেওয়ার কয়েক বৎছর আগে থেকে তাঁরা তিনজনে উন্নত ভঙ্গীতে গদ্যে রচনা শুরু করেছিলেন। তবে বিদ্যাসাগর গদ্য লেখায় হাত দিয়ে কোন্ দিকে নূতনত্ব আনলেন? এ প্রশ্নের আলোচনার জন্য 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'র প্রথম সংস্করণ ( ১৮৪৭ ) থেকে কিয়দংশ নিচে উদ্ধার করা যাচ্ছে—

> (প্রথম উপাখ্যান)"বেতাল কহিল মহারাজ শ্রবণ কর। বারাণসী নগরীতে প্রতাপমুকুট নামে এক প্রবলপ্রতাপ নরপতি ছিলেন। তাঁহার বজ্রমুকুট নামে নন্দন ও মহাদেবী নাম্নী মহিষী ছিল। এক দিবস রাজকুমার প্রাড্বিবাকপুত্রকে সমভিব্যহারী করিয়া মৃগয়ায় গমন করিলেন। ক্রমে ২ নানা বনে ভ্রমণ করিয়া পরিশেষে কোন নিবিড় অরণ্যানী প্রবেশপূর্ব্বক তন্মধ্যবর্ত্তি পরম রমণীয় এক সুশোভিত সরোবর সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। এবং দেখিলেন ঐ সরসীর তীরে হংস বক চক্রবাক সারস প্রভৃতি নানাবিধ জলচর পক্ষিগণ

১। বিহারীলাল সরকার 'বিদ্যাসাগর' ৩য় সং পৃ ১৭৩।

কলরব করিতেছে। প্রফুল্লকমলসমূহের সৌরভে চারি দিক আমোদিত হইতেছে মধুকরেরা মধুগন্ধে অন্ধ হইয়া গুন ২ ধ্বনি করত ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে। তীরস্থিত তরুগণ অভিনব পল্লবফলকুসুমসমূহে সুশোভিত আছে। তাহাদিগের ছায়া অতি স্নিগ্ধ ও সুশীতল বিশেষতঃ শীতল সুগন্ধ গন্ধবহের মন্দ ২ সঞ্চার দ্বারা পরম রমণীয় হইয়াছে। তথায় শ্রান্ত ও আতপতাপিত ব্যক্তি প্রবেশমাত্রেই গতক্লম হয়।''

বলা বাহুল্য, উদ্ধৃতাংশের রচনা বর্ণিত কাহিনীকে কাব্যের পর্যায়ে উন্নীত করেছে। এমন সুশ্রব্য, সরস, ছন্দোময় অথচ গাম্ভীর্যপূর্ণ রচনা বাংলাসাহিত্যে এর আগে বেশি দেখা যায় নি। বিদ্যাসাগরী গদ্যের বিশেষত্ব এইখানে। তাঁর পূর্ববর্তী গদ্যলেখকেরা, যে গদ্যকে বহুলাংশে সর্বকার্যে ব্যবহারোপযোগী করেছিলেন; তিনি তাতে শোভাসঞ্চারের প্রচেষ্টা করলেন। দেবেন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমারের চেষ্টায় বাংলা, ধর্ম্মতত্ত্ব ও বিবিধ জ্ঞানবিজ্ঞান প্রচারের বাহন হওয়ার যোগ্যতা লাভ করছিল; তাঁদের রচনার স্থানে স্থানে উচ্চাঙ্গের শিল্পবোধের পরিচয় পাওয়া গেলেও, নিছক সাহিত্যরসসৃষ্টির অবসর তাঁদের ছিল না। কিন্তু নবোত্থিত গদ্যসাহিত্যের এ শোচনীয় দৈন্যকে কিয়ৎপরিমাণে দূর ক'রল বিদ্যাসাগরের প্রতিভা। যে ভাষা তথ্যমাত্র প্রচারের সাধন ছিল, তা অংশত কলা-লক্ষ্মীর আরাধনের উপযোগী হয়ে উঠল। নবজাগ্রত বাঙালী জাতির সৌন্দর্যবোধ তথা সংস্কৃতিবিকাশের এক নূতন রাস্তা খুলে গেল।

বিদ্যাসাগর যে বাংলা গদ্যের শোভা সম্পাদনে কিঞ্চিৎ কৃতকার্যতা লাভ করলেন তার মূলে, এক দিকে ছিল সংস্কৃত কাব্যের সঙ্গে তাঁর আশৈশব ও সুনিবিড় পরিচয়, আর অপরদিকে ছিল তাঁর সহজাত শিল্পবোধ এবং সম্মুখে বর্তমান গদ্যের আদর্শ। তারি ফলে সংস্কৃত সাহিত্যে ব্যবহার্য অলঙ্কারকে তিনি বাংলা গদ্যে অনেকটা সুন্দর ভাবে সন্নিবিষ্ট করতে পেরেছিলেন। প্রপিতামহীর বিচিত্র বস্ত্রাভরণসম্ভার থেকে নির্বাচিত প্রসাধনসামগ্রী বালিকা প্রপৌত্রীর গায়ে কিঞ্চিৎপরিমাণে মানানসইভাবে পরানো হয়েছিল। বিদ্যাসাগরের আগে কেউ কেউ (যেমন 'প্রবোধ-চন্দ্রিকা' প্রণেতা) সংস্কৃতোচিত অলঙ্কারকে বাংলায় চালাতে চেষ্টা

করেছিলেন, কিন্তু সামনে গদ্যের কোন সুস্পষ্ট আদর্শ না থাকায় তাঁদের চেষ্টা সেদিক দিয়ে তেমন ফলপ্রসূ হয় নি। সংস্কৃত ভাষার নিজস্ব অলঙ্কারকে বাংলার উপযোগী করার চেষ্টা থেকেই বিদ্যাসাগরের রীতি মুখ্যত তার অনিবার্য রূপটি পেয়েছে। এই রূপটির এক লক্ষণ হচ্ছে, খাঁটি বাংলা ( প্রাকৃতমূলক বা তদ্ভব ) এবং বিদেশী ভাষা থেকে পরিগৃহীত শব্দের আপেক্ষিক অল্পতা, অন্য লক্ষণ হচ্ছে স্থানবিশেষে সমাসবদ্ধ পদের সুপ্রচুর ব্যবহার ; কতিপয় স্থানে সংস্কৃতসুলভ পদ এবং বাগ্‌বিন্যাসও তার সঙ্গে দেখা দিয়েছে।

'বেতাল পঞ্চবিংশতি'র পরে বিদ্যাসাগরের 'বাঙ্গালার ইতিহাস' ( ১৮৪৮ ) ও 'জীবন চরিত' ( ১৮৪৯ ) প্রকাশিত হ'ল। এ দুখানি অনুবাদ বা অনুবাদমূলক গ্রন্থ। বিষয়ানুরোধে এদের ভাষা অনলঙ্কৃত। তা হ'লেও এ পুস্তকদ্বয়ের গদ্য নিতান্ত হালকা বা শ্রীহীন নয়। এ গ্রন্থদ্বয়ের পরেই 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'র দ্বিতীয় সংস্করণ (১৮৫০) প্রকাশিত হ'ল এবং এ সময় থেকে বিদ্যাসাগরের রচনারীতি যে কেমন সমাদর লাভ ক'রল তা বোঝা যায় তাঁর পন্থাবলম্বী শক্তিমান লেখকবর্গের ত্বরিত আবির্ভাবে। ১৮৫৩ সালে **তারাশঙ্কর তর্করত্ন** রচিত 'কাদম্বরী' ( মর্মানুবাদ ) প্রকাশিত হ'ল। এ অনুবাদে বিদ্যাসাগরের প্রভাব বুঝতে কারুরই অসুবিধা হয় না। তারি পরের বছর ( ১৮৫৪ ) রচিত 'শকুন্তলা' বিদ্যাসাগরের গদ্যরচনার যশকে উজ্জ্বলতর ক'রে তুলল। এ পুস্তক থেকে তাঁর লোকপ্রিয় গদ্যের একটি নমুনা নিচে উদ্ধার করা হ'ল :—

"তানলয়বিশুদ্ধস্বরসংযোগবতী গীতি শ্রবণ করিয়া রাজা অকস্মাৎ যৎপরোনাস্তি উন্মনাঃ হইলেন ; কিন্তু কি নিমিত্ত উন্মনাঃ হইতেছেন তাহার কিছুই অনুধাবন করিতে না পারিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, কেন এই মনোহর গীতি শ্রবণ করিয়া আমার মন এমন আকুল হইতেছে। প্রিয়জনবিরহ ব্যতিরেকে মনের এরূপ আকুলতা হয় না ; কিন্তু আমার প্রিয়জনবিরহ উপস্থিত দেখিতেছি না। অথবা মনুষ্য সর্ব্বপ্রকারে সুখী হইয়াও, রমণীয় বস্তু দর্শন কিংবা সুমধুর শ্রবণ করিয়া যে আকুল-

হৃদয় হয়, বোধ করি, অনতিপরিস্ফুট রূপে জন্মান্তরীণ স্থিরসৌহৃদ্য তাহার স্মৃতিপথে আরূঢ় হয়।”

উদ্ধৃতাংশের ভাষার সঙ্গে আজকালকার গদ্যসাহিত্যের ভাষার পূরোপূরি মিল না থাকলেও বাঙালী পাঠক যে দীর্ঘকাল যাবৎ এ রচনার রস অন্তত আংশিক ভাবেও গ্রহণ করতে পারবেন, সে-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। রচনার প্রাঞ্জলতা ও গাম্ভীর্যের সঙ্গে এরূপ রস বাংলা সাহিত্যে খুব সুলভ নয়। বিদ্যাসাগরের ‘শকুন্তলা’ বাংলা গদ্যসাহিত্যের এক স্থায়ী সম্পৎ। এ পুস্তক রচনার সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক লেখক তাঁর প্রদর্শিত পন্থা অবলম্বন করলেন। তাঁদের মধ্যে কয়েক জনের নাম উল্লেখ করা যাচ্ছে। ১৮৫৭ সালে **কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য** ‘দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ’ নামে যে বই লিখলেন তাতে বিদ্যাসাগরের গদ্যের প্রভাব বেশ সুস্পষ্ট দেখা গেল। **রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের** ‘টেলিমেকস’ও (১৮৫৮) বিদ্যাসাগরী ছাঁচে ঢালা; **রামগতি ন্যায়রত্নও** ‘রোমাবতী’ (১৮৬২) রচনায় বিদ্যাসাগরের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন। কিন্তু রামগতির আগেই বিদ্যাসাগর ‘সীতার বনবাস’ (১৮৬০) প্রকাশ করেছিলেন। এখানিও তাঁর অন্যতম উপাদেয় রচনা এবং দ্বিতীয় যুগের বাংলা গদ্যে এক উচ্চশ্রেণীর সৃষ্টি। এই পুস্তকের মধ্যে স্থানে স্থানে তিনি বেশ সুললিত ভাবে সুদীর্ঘ সমাসের ব্যবহার করেছেন। নিচে এর দৃষ্টান্ত উল্লিখিত হচ্ছে:—

“রাম কহিলেন, প্রিয়ে! এই সেই সকল গিরিতরঙ্গিণীতীরবর্ত্তী তপোবন; গৃহস্থগণ বানপ্রস্থ ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক, সেই তপোবনের তরুতলে কেমন বিশ্রামসুখ সেবায় সময়াতিপাত করিতেছেন। লক্ষ্মণ বলিলেন, আর্য্য! এ সেই জনস্থানমধ্যবর্ত্তী প্রস্রবণগিরি; এই গিরির শিখরদেশ আকাশ-পথে সততসঞ্চরমান জলধরমণ্ডলীর যোগে নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অলঙ্কৃত; অধিত্যকাপ্রদেশ ঘনসন্নিবিষ্ট বিবিধ-বনপাদপ সমূহে আচ্ছন্ন থাকতে সতত স্নিগ্ধ, শীতল ও রমণীয়; পাদদেশে প্রসন্নসলিলা গোদাবরী তরঙ্গবিস্তার করিয়া প্রবলবেগে গমন করিতেছে।”

'শকুন্তলা' ও 'সীতার বনবাস' বিদ্যাসাগরের রীতিকে লোকপ্রিয় ক'রে তুলেছে বটে কিন্তু বিধবাবিবাহ এবং বহুবিবাহ সম্পর্কে লিখিত পুস্তকনিচয়ও তাঁর গদ্যকে লোকসাধারণের, বিশেষ ক'রে সংস্কৃতের পণ্ডিতদের মধ্যে প্রচারিত করবার কম সাহায্য করে নি। অবশ্য তাঁর ইস্কুলপাঠ্য গ্রন্থগুলিও [যথা 'বাঙ্গালার ইতিহাস', 'জীবনচরিত', 'বো ধো দ য়' (১৮৫১), 'ব র্ণ প রি চ য়' (১৮৫৫), 'ক থা মা লা' (১৮৫৬), 'চরিতাবলী' (১৮৫৬) আদি] তাঁর গদ্যকে লোকসাধারণের, বিশেষ ক'রে নবীন শিক্ষার্থীদের শ্রদ্ধার্হ করার যথেষ্ট সাহায্য করেছে। এস্থলে উল্লেখ ক'রা উচিত যে গদ্য-সাহিত্য নির্মাণে তাঁর সহযোগী অক্ষয়কুমারের 'চারুপাঠ' তিন ভাগও শিক্ষার্থীমণ্ডলীতে তৎকালে প্রচারিত হচ্ছিল। কিন্তু এ বিষয়ে হয়ত বিদ্যাসাগরের খ্যাতি ছিল তাঁর চেয়ে অনেক বেশী। ১৮৫৬ থেকে ১৮৬ সালের মধ্যে, কি সমাজ-সংস্কার, কি দয়া-বিতরণ, কি সাহিত্য-রচনা সব দিক দিয়ে বিদ্যাসাগর খ্যাতির সর্বোচ্চ শিখরে অধিরূঢ় ছিলেন। কিন্তু এরূপ জাজ্বল্যমান সমসাময়িক খ্যাতি সত্ত্বেও তাঁর রচনারীতি সম্বন্ধে প্রশংসা ও অনুরাগের অজস্র ধারা দীর্ঘকাল স্থায়ী হ'ল না। তাঁর অনুরাগীদের অনেকেই সংস্কৃত সাহিত্যে সুপণ্ডিত, আর এ পাণ্ডিত্যের জন্যই বিদ্যাসাগরী গদ্যের সম্যক্ রসগ্রহণ ছিল তাঁদের পক্ষে সহজসাধ্য। কিন্তু বাংলা দেশে তখন এমন এক শ্রেণীর শিক্ষিত ব্যক্তির আবির্ভাব হয়েছিল, জ্ঞানার্জনের জন্যে যাঁরা সংস্কৃতের চেয়ে ইংরেজীর উপরই বেশী মাত্রায় নির্ভর করতন, এবং ইংরেজীর মত একটি জীবন্ত ভাষার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফলে বাংলা রচনায় সংস্কৃতের অতিমাত্র প্রভাবকে তাঁরা অনাবশ্যক কৃত্রিমতা ব'লে গণ্য করলেন। এ দলের পুরোভাগে ছিলেন প্যারীচাঁদ মিত্র (টেকচাঁদ ঠাকুর) ও **রাধানাথ শিকদার**। তাঁদের প্রচারিত 'মা সি ক প ত্রি কা' (১৮৫৪ সালে স্থাপিত) বিদ্যাসাগরের ভাষার বিরুদ্ধে বিদ্রোহরূপে দেখা দিল। এ পত্রিকায় ক্রমশ মুদ্রিত এবং ১৮৫৭-৫৮ সালে পুস্তকাকারে প্রকাশিত 'আ লা লে র ঘ রে র দু লা ল' বিদ্যাসাগরী রীতির প্রতি প্রকাশ্য সমর-আহ্বান। এ সংগ্রামে 'আলালী' ভাষা অবশ্য অক্ষত শরীরে জয়লাভ করতে পারে নি,

কিন্তু উপাখ্যানাদি রচনায় বিদ্যাসাগরী ভাষার অবিসংবাদিত প্রভাবও আর রইল না। ১৮৭২ সালে 'বিষবৃক্ষে', যে-ভাষা ব্যবহার ক'রে বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে গদ্যরচনাবিষয়ক লৌকিক প্রশংসার দুর্গ থেকে ক্রমশ স্থানচ্যুত করলেন, সে-ভাষা 'আলালী' ভাষার সঙ্গে 'বিদ্যাসাগরী' ভাষার (যথোপযুক্ত মাত্রায়) সংমিশ্রণের ফলে তৈরী। বিশুদ্ধ বিদ্যাসাগরী রীতিকে যে, বঙ্কিমচন্দ্র প্রশংসার চোখে দেখেন নি তার কারণ মুখ্যত তিনটি :—(১) অলঙ্কারাদি ব্যবহারের কৃত্রিমতা, (২) পুররুক্তি দোষ ও (৩) শব্দাড়ম্বর। কবিকল্পনার যে-সকল সৃষ্টি সংস্কৃত কাব্যে শত-শত বৎসর ধ'রে বহুবার ব্যবহারের পর পর্যুষিত হয়েছে, সে সকলকে আবার বাংলায় দেখতে পেলে প্রেক্ষাবান্ পাঠকের ধৈর্য রক্ষা করা কষ্ট হ'য়ে ওঠে। যেমন 'ভ্রান্তি-বিলাসে'র কোন নায়িকা তাঁর স্বামীকে লক্ষ্য ক'রে বলছেন :—

"আমি জীবিত থাকিতে তুমি কখনও অন্যের হইতে পারিবে না। তুমি দিবাকর, আমি কমলিনী, তুমি শশধর আমি কুমুদিনী ; তুমি জলধর, আমি সৌদামিনী। তুমি পরিত্যাগ করিতে চাহিলেও আমি তোমায় ছাড়িব না। অতএব, আর কেন, গৃহে চল ; কেন অনর্থক লোক হাসাইবে বল।"

অথবা 'সীতার বনবাসে' লক্ষ্মণ রামচন্দ্রকে লক্ষ্য ক'রে বলছেন—

"আপনার মুখারবিন্দ, সায়ংকালের কমল অপেক্ষাও ম্লান ও প্রভাতসময়ের শশধর অপেক্ষাও নিষ্প্রভ লক্ষিত হইতেছে।"

বিদ্যাসাগরের রচনায় যে সকল স্থলে পুনরুক্তি দোষের উদাহরণ প্রচুর পরিমাণে মেলে তাদের মধ্যে 'সীতার বনবাসে'র তৃতীয় পরিচ্ছেদ একটি। এর প্রথম চার অনুচ্ছেদে 'অশ্রু' কথাটি পাঁচ বার এবং 'নিতান্ত' ও 'কাতর' শব্দ চার বার এবং 'দুর্ব্বহ', 'বাষ্পবারি', 'সবিশেষ', 'অতি বিষম' এই শব্দগুলি দুবার ক'রে পুনরাবৃত্ত হয়েছে।

বিদ্যাসাগরের শব্দাড়ম্বরের এক দিক হচ্ছে সুপরিচিত ও খাঁটি বাংলা শব্দের যথাসম্ভব পরিহার। যেমন 'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা

এতদ্বিষয়ক ১ম প্রস্তাবে', কোনও পুস্তক থেকে প্রমাণাদি 'বাহির করা' অর্থে তিনি 'বহিষ্কৃত-করা' এই ক্রিয়া পুনঃ পুনঃ ব্যবহার করেছেন।

বিদ্যাসাগরের শব্দাড়ম্বরের অন্য দিক হচ্ছে তাঁর সমাস-প্রিয়তা। সমাসাড়ম্বর স্থানে স্থানে বিদ্যাসাগরের রচনাকে' দুর্বোধ ও সৌন্দর্যহীন করেছে। যেমন, 'জীবনচরিত (১৮৪৯) নামক পুস্তকে বিদ্যাসাগর নিউটনের প্রসঙ্গে লিখেছেন :—

> "একদা, তিনি একটা পুরাতন বাক্‌স লইয়া জলের ঘড়ী নির্ম্মাণ করিযাছিলেন। ঐ ঘড়ীর শঙ্কু, বাক্সমধ্য হইতে 'অবিরতবিনির্গত-জলবিন্দুপাত দ্বারা নিমগ্ন কাষ্ঠখণ্ডপ্রতিঘাতে পরিচালিত হইত; বেলাবোধনার্থ তাহাতে একটি প্রকৃত শঙ্কুপট্ট ব্যবস্থাপিত ছিল।"

নিউটন কর্তৃক মাধ্যাকর্ষণ নিয়মের আবিষ্কার বর্ণনা করিতে গিযে বিদ্যাসাগর লিখেছেন :—

> "একদিবস তিনি উপবনমধ্যে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে দৈবযোগে তাঁহার সম্মুখবর্ত্তী আতাবৃক্ষ হইতে এক ফল পতিত হইল। তদ্দর্শনে তিনি তৎক্ষণাৎ বস্তুমাত্রের পতননিয়ামকসাধারণ-কারণবিষয়িণী পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন।"

বলা বাহুল্য উদ্ধৃত অংশদ্বযে ব্যবহৃত কঠিন সংস্কৃত শব্দ ও দীর্ঘ সমাস কেবল যে এদের দুর্বোধ করেছে তা নয়, এতে বিদ্যাসাগরী গদ্যের স্বাভাবিক ছন্দকেও বাধা দিযেছে। একেবারে নবশিক্ষার্থীদের জন্যে রচিত 'বোধো-দয়ে'র ও দুচার স্থানে সমাস এবং শক্ত সংস্কৃত কথা ব্যবহার ক'রে বিদ্যাসাগর ভাষার দুরূহত্ব সঞ্চার করেছেন। এ-সব কারণই তাঁর গদ্যকে তৎকালীন নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট অপ্রিয় ক'রে তুলেছিল ব'লে মনে হয়। এ নব্যদল বিদ্যাসাগরী রীতির কৃত্রিমতার বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম চালালেন তা শেষ পর্যন্ত স্বয়ং বিদ্যানাগরকেও হয়ত কিয়ৎপরিমাণে প্রভাবিত করে-ছিল। 'সীতার বনবাসা'দির শেষের দিকের সংস্করণগুলিতে তিনি অনেক সমাসবদ্ধ পদকে ভেঙ্গে দিয়েছেন, এবং পূর্ব্ব সংস্করণে ব্যবহৃত সংস্কৃতোদ্ভূত 'কহ' ধাতুর প্রয়োগ প্রায় একেবারে তুলে দিয়ে কেবল খাঁটি বাংলা (প্রাকৃত বা তদ্ভব) 'বল' ধাতুরই প্রয়োগ করেছেন। 'আখ্যানমঞ্জরী' (১৮৬৩,

১৮৬৮ ) 'ভ্রান্তি বিলাস' ( ১৮৬৯ ) নামক তাঁর পরবর্তী গ্রন্থেও এ-জাতীয় ব্যবহার বর্তমান। এ-সকল পরিবর্তনের ফলে তাঁর ভাষা তখন একটু সরল হয়েছে বটে কিন্তু তবু খাঁটি বাংলা শব্দের আপেক্ষিক অপ্রাচুর্যবশত উল্লিখিত গ্রন্থনিচয়ের রচনা তার বিদ্যাসাগরী ভঙ্গী তেমন ক'রে হারায়নি। বিদ্যাসাগরের বেনামী রচনাগুলিও অনেকটা এ শেষোক্ত শ্রেণীর রীতিতে রচিত ; এ তবে বইগুলিতে বাংলা ( প্রাকৃতোদ্ভূত, বিদেশী থেকে গৃহীত এবং তদ্ভব ) শব্দের পরিমাণ একটু বেশি। কিন্তু শব্দসঞ্চয়ের কথা বাদ দিলেও এ রচনাগুলির অন্য আকর্ষণ আছে। এগুলিতে বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহ-বিরোধী কতিপয় সমসাময়িক মহাপণ্ডিতকে ব্যঙ্গবিদ্রূপ ও কটুক্তির কশাঘাত করেছেন। তারি ফলে খানিকটা হাস্যরসের সৃষ্টি হয়েছে।

উক্ত বিরোধী দলের মধ্যে **ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন** নামে এক বিখ্যাত ভট্টাচার্য্য বিদ্যাসাগরের প্রতি বিস্তর কটূক্তি বর্ষণ করেছিলেন। তারই জবাবে 'ব্রজবিলাস' লিখিত হয় (১৮৮৪)। এ পুস্তিকার একস্থলে আছে—

> "এ যাত্রায় খুড়র কাছে দুই চারিটি প্রশ্ন করিব। * * * যদি উপেক্ষা করিয়া অথবা ভয় পাইয়া অথবা আর কোন নিগূঢ় কারণের বশবর্ত্তী হইয়া খুড় মহাশয় উত্তরদানে বিমুখ হন 'দুও' 'দুও' বলিয়া হাততালি দিয়া ইয়ারবর্গ লইয়া কিযৎক্ষণ আনন্দে নৃত্য করিব, পরে রীতিমত বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া মড় মড় করিয়া খুড়র ঘাড় ভাঙ্গিয়া ফেলিব।
>
> যদি বলেন, খুড়র ঘাড় ভাঙ্গিলে, খুড় মরিয়া যাইবেন। তাহার উত্তর এই খুড়র ঘাড় বড় মজবুদ, সহজে ভাঙে কার সাধ্য। আর যদি ভাঙিযাই যায় তাহাতে আমি নাচার। আমি মনকে বুঝাইব খুড়র কপালে লেখা ছিল উপযুক্ত ভাইপোর হস্তে সদ্গতি হইবেক, তাহাই ঘটিযাছে বিধিনির্ব্বন্ধ অতিক্রম করে কার সাধ্য। * * * যদি বল খুড়র ঘাড় ভাঙিলে তোমার পাপ জন্মিবে। তাহার উত্তর এই, পাপের জন্য আমার তত দুর্ভাবনা নাই। * * * খুড়র ঘাড় ভাঙিলে হয় গোহত্যার নয় ব্রহ্মহত্যার পাতক হইবেক। শুনিয়াছি এ উভয়েরই যথোপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত বিধান আছে। যদি স্পষ্ট বিধান না থাকে

বিদ্যাবাগীশ মহাশয়েরা চিরজীবি হউন, মনের মত তৈলবট সামনে ধরিলে, তাঁহারা প্রফুল্লচিত্তে হয় বচন গড়িয়া নয় মজুদবচনের ঘাড় ভাঙিয়া অম্লানবদনে নিখিরকিচ ব্যবস্থা লিখিয়া দিবেন তাহা হইলেই সাধু সমাজে আর কোনও ওজর আপত্তি থাকিবে না।"

বিদ্যাসাগরের বেনামী রচনাগুলি এ শ্রেণীর হাস্যরসে পরিপূর্ণ। তবে এ হাস্যরসকে খুব উচ্চশ্রেণীতে ফেলা যায় না। কিন্তু উক্ত রচনাগুলির কয়েক স্থানে এর চেয়েও নিকৃষ্ট উপায়ে হাস্যসৃষ্টি করা হয়েছে। মোটের উপর দেখতে গেলে বিদ্যাসাগরের সৃষ্ট হাস্যরস সংস্কৃত 'প্রহসন' জাতীয় রচনার হাস্যরসের সঙ্গে তুলনীয়। এ উভয়েরই স্থূলরুচিপ্রসূত এবং স্থানে স্থানে অশ্লীলতাদুষ্ট। অবশ্য বিদ্যাসাগরের বয়ঃকনিষ্ঠ সমসাময়িক পণ্ডিত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য কিন্তু উল্লিখিত বেনামী রচনাগুলির হাস্যরস সম্বন্ধে বলেছেন :—"এই রসিকতা * * * গ্রাম্যতাদোষে দূষিত নহে ; ইহা ভদ্রলোকের সুসভ্য সমাজের যোগ্য ; এবং পিতাপুত্রের একত্র উপভোগ্য। এরূপ উচ্চ অঙ্গের রসিকতা বাঙ্গালা ভাষায় অতি অল্পই আছে।" সুপণ্ডিত কৃষ্ণকমল যে-রুচির আবহাওয়ায় পরিবর্ধিত হয়েছিলেন সে-রুচি অনেক দিন আগে বাংলা দেশের ভদ্রসমাজ থেকে বহুলাংশে বিদায় গ্রহণ করেছে। বিদ্যাসাগরের রচনায় মারাত্মক গ্রাম্যতাদোষ প্রচুর না থাকলেও এমন দু-একটি স্থান আছে, যা শিষ্টাচারসম্পন্ন আধুনিক পিতাপুত্রে একত্র পড়তে কুণ্ঠাবোধ করবে। কিন্তু এজন্যে আমরা বিদ্যাসাগরকে খুব বেশি কঠোরভাবে বিচার করতে পারি না। কারণ, যে-অবস্থায় পড়ে তিনি আঘাত ফিরিয়ে দেবার জন্যে প্রতিপক্ষকে বাঙ্ময় কশাঘাত করেছেন, তা ভাবলে আমরা এই পুরুষসিংহের প্রতি কারুণ্য অনুভব করি। বিধবাবিবাহ প্রবর্তনে উদ্যোগী হওয়ার অব্যবহিত পরেই তাঁর প্রতি যে ঘোরতর উপহাস কটূক্তি এবং নিন্দাকর্দম নিক্ষিপ্ত হয়েছিল তা তিনি বেশ নির্বিকার চিত্তে সহ্য করেছেন। বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে লিখিত দ্বিতীয় পুস্তকের ভূমিকাই এ সম্বন্ধে প্রমাণ। এ-স্থলে তিনি যে উদারতা ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়েছেন তা সম্ভবত রামমোহন ছাড়া তাঁর কোন পূর্ববর্তী লেখকের রচনায় দুর্লভ। এখানে বিদ্যাসাগর লিখেছেন :—

"অধিক আক্ষেপের বিষয় এই যে, উত্তরদাতা মহাশয়দিগের মধ্যে অনেকেই উপহাসরসিক ও কটূক্তিপ্রিয়। এদেশে উপহাস ও কটূক্তি যে ধর্ম্মশাস্ত্রবিচারের এক প্রধান অঙ্গ, ইহার পূর্ব্বে আমি অবগত ছিলাম না।...অনেকের এবংবিধ উত্তরদানপ্রণালী দর্শনে আমার অন্তঃকরণে প্রথমতঃ অত্যন্ত ক্ষোভ জন্মিযাছিল। কিন্তু এই উত্তরটি পাঠ করিয়া আমার সকল ক্ষোভ এককালে দূরীভূত হইয়াছে।...এক বর ঐ উত্তর লিখিযা প্রচার করিযাছেন। এই বর বযসে বৃদ্ধ ও সর্ব্বত্র প্রধান বিজ্ঞ বলিয়া বিখ্যাত হইযাও উত্তরপুস্তকে মধ্যে মধ্যে উপহাস রসিকতা ও কটূক্তিপ্রিযতা প্রদর্শন করিয়াছেন। সুতরাং আমি সিদ্ধান্ত করিযাছি ধর্ম্মশাস্ত্র বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াও বাদীর প্রতি উপহাসবাক্য ও কটূক্তি প্রয়োগ করা এদেশে বিজ্ঞের লক্ষণ।"

উল্লিখিত রচনাংশে প্রকাশিত লোকদুর্লভ ধৈর্য বিদ্যাসাগর দীর্ঘকাল রাখতে পারেন নি। বিধবাবিবাহের বৈধতা রাজবিধি দ্বারা স্বীকৃত হওয়ার পরে তাঁর উপর কটূক্তি ও অন্য অত্যাচার একান্ত ভাবে বেড়ে গিয়েছিল। যে-ধৈর্যকে আঠার বছরেও (১৮৫৫—১৮৭২) তিনি হারান নি, তখন সে ধৈর্য তাঁকে ত্যাগ ক'রল। তিনি প্রতিপক্ষদের যথাশক্তি ও যথাভিরুচি গালাগালি দিযে একাধিক বেনামী পুস্তিকা প্রকাশ করলেন। কিন্তু এ-সকল বেনামী রচনায় বিদ্যাসাগর যা লিখেছেন তাঁর গদ্যের বিচারে সে-সকলকে না ধরলেও বিশেষ ক্ষতি নেই। তাঁর প্রধান রচনানিচয়ে—বিশেষ ক'রে 'শকুন্তলা', 'সীতার বনবাস', মহাভারতের উপক্রমণিকার অনুবাদ (রচনাকাল ১৮৪৮—১৮৬০), বিধবাবিবাহ বিযযক প্রস্তাবদ্বয (১৮৫৫), ও বহুবিবাহ বিষযক বিচারদ্বয়ে (১৮৭১—১৮৭৩) তিনি যে গদ্য ব্যবহার করেছেন বাংলা সাহিত্যের পুষ্টিসাধনে তার সাহায্য অতুলনীয। বিদ্যাসাগরের অনুবাদের আদর্শেই **কালীপ্রসন্ন সিংহ** সমগ্র মহাভারতের বঙ্গানুবাদ (১৮৬০-১৮৬৬) ক'রে ভারতীয় সাধনার এই বিরাট কল্পবৃক্ষ বাঙালীর গৃহদ্বারে রোপণ করেছেন। 'সোমপ্রকাশ', (দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ) আদি জনপ্রিয় সাপ্তাহিক কাগজও এ গদ্যে লিখিত হয়ে বহু বাঙালীর জ্ঞানবৃদ্ধির সাহায্য করেছে। নানা প্রকাশক দ্বারা প্রচারিত

সংস্কৃত পুরাণাদির অনুবাদেও এ বিদ্যাসাগরী ভাষারই পুনঃপুনঃ ব্যবহার দেখা যায়। এ অনুবাদগুলিতে জাতীয় সংস্কৃতির প্রসারবৃদ্ধির কম সাহায্য করে নি। কিন্তু আগেই বলেছি, এদিক দিয়ে সাহিত্যকে করলেও, যে গল্প-উপাখ্যানের ভাষা নিয়ে বিদ্যাসাগর খ্যাতি লাভ করেছিলেন তার প্রভাব অপেক্ষাকৃত স্বল্পকালস্থায়ী হয়েছিল। তা সত্ত্বেও বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর আসন বেশ উঁচুতে।

## ( চ ) তারাশঙ্কর তর্করত্ন

বিদ্যাসাগরের পন্থানুসারী লেখকদের মধ্যে পণ্ডিত তারাশঙ্কর তর্করত্নের নাম সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। তিনি বাংলা গদ্যে সংস্কৃত কা দ ম্ব রী র যে অনুবাদ রচনা করেছিলেন, পরবর্তী গদ্যসাহিত্যের উপর তার প্রভাব নগণ্য নয়। **অক্ষয়চন্দ্র সরকার** মহাশয়ের ( ১৮৪৪-১৯১৭ ) লেখা থেকে এ পুস্তকের সমসাময়িক প্রভাবের কথা জানতে পারা যায়। কিন্তু সরকার মহাশয় যে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য কৃত 'দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণে'র ভাষাকেই বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষার জননী মনে করেন, এ কথা যুক্তিযুক্ত ব'লে মনে হয় না। কারণ, আদর্শ বাংলা গদ্য কি হওয়া উচিত এ সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন, "বাঙ্গালা ভাষার এক সীমায় তারাশঙ্করের 'কাদম্বরী'র অনুবাদ আর এক সীমায় প্যারীচাঁদ মিত্রের "আলালের ঘরের দুলাল।" ইহার কেহই আদর্শ ভাষায় রচিত নয়। "আলালের ঘরের দুলালের" পর হইতে বাঙ্গালি লেখক জানিতে পারিল যে, এই উভয় জাতীয় ভাষার উপযুক্ত সমাবেশ দ্বারা এবং বিষয়-ভেদে একের প্রবলতা ও অপরের অল্পতা দ্বারা, আদর্শ বাঙ্গালা গদ্যে উপস্থিত হওয়া যায়।"

উল্লিখিত স্থলটির সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণকমলের বইখানি পড়লেই বোঝা যাবে বঙ্কিমচন্দ্রের উপর কোন্ কোন্ লেখকের প্রভাব পড়েছিল। কৃষ্ণ-কমলের রচনা যে তারাশঙ্কর ও প্যারীচাঁদের ভাষার মিশ্রণে রচিত নয় একথা বুঝতে খুব কম লোকেরই ভুল হবে। আর এ ভাষার ওপর, চার বছর আগে প্রকাশিত তারাশঙ্করের বইএর প্রভাব বেশ সহজেই বোঝা

যায়। কাজেই বঙ্কিমচন্দ্রের উপর তারাশঙ্কর এবং প্যারীচাঁদের মিলিত প্রভাব কল্পনা করাই বোধ হয় অধিকতর যুক্তিযুক্ত। এ দুই গদ্য লেখকের ভাষার যথাযোগ্য মিশ্রণে গঠিত গদ্য ব্যবহার করাতেই বঙ্কিচন্দ্রের অন্যতম কৃতিত্ব। 'কাদম্বরী' সংস্কৃত গদ্য সাহিত্যের স্বল্প সংখ্যক গ্রন্থের মধ্যে এক উত্তম সৃষ্টি হলেও, এর ভাষা অজস্র সমাস ও অলঙ্কারের ভারে প্রপীড়িত। কিন্তু এ সত্ত্বেও এর ভাষার মধ্যে এক অতি মনোহর গতিমাধুর্য সুশ্রব্যতা ও গাম্ভীর্য আছে। তারাশঙ্করের কৃত স্বাধীন অনুবাদে সংস্কৃত গদ্যের এই হৃদয়গ্রাহী ভঙ্গীটুকু কিয়দংশে বর্তমান ছিল বলেই, তাঁর বই প'ড়ে সমসাময়িক পাঠক মণ্ডলা বিলক্ষণ খুশী হতে পেরেছিলেন। বিদ্যাসাগরের পদাঙ্কানুসারী হলেও তারাশঙ্কর 'কাদম্বরী' অনুবাদে অধিকতর সুরুচি এবং শিল্পজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন। মূল সংস্কৃতের সমাসজাল ও অলঙ্কার-বাহুল্য থেকে মুক্ত ক'রে, তিনি কাদম্বরীর মৌলিক সৌন্দর্যের কিয়দংশ বাংলাতে বজায় রাখতে পেরেছিলেন। এ সৌন্দর্যের জন্যই বাংলার সর্বপ্রথম কৃতী ঔপন্যাসিকের রচনারীতিতে পড়েছিল তাঁর কিঞ্চিৎ প্রভাব। নিচে 'কাদম্বরী' অনুবাদের গদ্য সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাচ্ছে।

যদিও মূল সংস্কৃত 'কাদম্বরী'তে সমাসের অজস্র প্রাদুর্ভাব এবং লেখক নিজে একজন উত্তম সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত, তাঁর অনুবাদে অতি দীর্ঘ সমাস প্রায়শ অনুপস্থিত এবং সমাস ব্যবহার সত্ত্বেও এর ভাষায় আড়ষ্টতা বা গতিহীনতা নেই। নিচে এর ভাষার নমুনা দেওয়া হ'ল :—

"ক্রমে দিবাবসান হইল। মুনিজনেরা রক্তচন্দনসহিত যে অর্ঘ্য দান করিয়াছিলেন, সেই রক্তচন্দনে অনুলিপ্ত হইয়াই যেন, রবি রক্ত-বর্ণ হইলেন। রবির কিরণ ধরাতল পরিত্যাগ করিয়া কমলবনে, কমলবন ত্যাগ করিয়া তরু শিখরে এবং তদনন্তর পর্ব্বতশৃঙ্গে আরোহণ করিল। বোধ হইল যেন, বিহঙ্গদিগকে নিজ নিজ কুলায়ে আগমন করিবার নিমিত্ত অঙ্গুলিসঙ্কেত দ্বারা আহ্বান করিল। বিহঙ্গকুলও কলরব করিয়া যেন তাহার উত্তর প্রদান করিল। মুনিজনেরা ধ্যানে বসিলেন ও বদ্ধাঞ্জলি হইয়া সন্ধ্যার উপাসনা করিতে লাগিলেন।

দুহ্যমান হোমধেনুর মনোহর দুগ্ধধারাধ্বনি আশ্রমের চতুর্দ্দিক ব্যাপ্ত করিল। হরিদ্বর্ণ কুশদ্বারা অগ্নিহোত্র বেদি আচ্ছাদিত হইল।"

"অবন্তিদেশে উজ্জয়িনী নামে নগরী আছে। যে স্থানে ভুবনত্রয়ের সর্গস্থিতিসংহারকারী মহাকালাভিধান ভগবান দেবাদিদেব মহাদেব অবস্থিতি করেন। যে স্থানে শিপ্রা নদী তরঙ্গরূপ ভ্রূকুটি বিস্তারপূর্ব্বক ভাগীরথীর প্রতি উপহাস করিয়া বেগবতী হইয়া প্রবাহিত হইতেছে। তথায় তারাপীড় নামে মহাযশস্বী তেজস্বী প্রবলপ্রতাপ নরপতি ছিলেন। তিনি অর্জ্জুনের ন্যায় নিজ ভুজবলে অখণ্ড ভূমণ্ডল জয় ও প্রজাগণের ক্লেশ দূর করিয়া সুখে রাজ্যভোগ করেন। তাঁহার গুণে বশীভূত হইযা লক্ষ্মী কমলবন পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়াছিলেন; সরস্বতী চতুর্ম্মুখের মুখপরম্পরায় বাস করা ক্লেশকর বোধ করিয়া তাঁহারই রসনামণ্ডলে সুখে অবস্থিতি করিয়াছিলেন।

'কাদম্বরী'র অনুবাদে উল্লিখিত স্থল দুটির চেয়েও সরল ভাষা দেখতে পাওয়া যায়। নিচে একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাচ্ছে:—

"সদ্‌বংশে জন্মিলেই যে, সৎ ও বিনীত হয় একথা অগ্রাহ্য। উর্ব্বরা ভূমিতে কি কণ্টকবৃক্ষ জন্মে না? চন্দনকাষ্ঠের ঘর্ষণে যে অগ্নি নির্গত হয় উহার কি দাহশক্তি থাকে না? ভবাদৃশ বুদ্ধিমান ব্যক্তিরাই উপদেশের যথার্থ পাত্র। মূর্খকে উপদেশ দিলে কোন ফল হয় না। দিবাকরের কিরণ কি স্ফটিকমণির ন্যায় মৃৎপিণ্ডে প্রতিফলিত হইতে পারে? সদুপদেশ অমূল্য ও অসমুদ্রসম্ভূত রত্ন। উহা শরীরিক বৈরূপ্য প্রভৃতি জরার কার্য্য না করিয়াও বৃদ্ধত্ব সম্পাদন করে। ঐশ্বর্য্যশালীকে উপদেশ দেয় এমন লোক অতি বিরল। যেমন গিরিগুহার নিকটে শব্দ করিলে প্রতিশব্দ হয় সেইরূপ পার্শ্ববর্ত্তী লোকের মুখে প্রভুবাক্যের প্রতিধ্বনি হইতে থাকে; * ও *।"

উল্লিখিত অংশের রচনা আজও খুব সেকেলে হয়ে দাঁড়ায় নি এবং অল্পবিস্তর বদল ক'রলে এ শ্রেণীর গদ্য এখনো চালাতে পারা যায়। এ সকল কথা বিচার ক'রলে তারাশঙ্করকে তত্ত্ববোধিনী যুগের শ্রেষ্ঠ গদ্য লেখকদের অন্যতম ব'লে গণ্য ক'রতে হয়।

# পরিশিষ্ট

## বিদ্যাসাগর ও বিদ্যালঙ্কার মৃত্যুঞ্জয়

যে নবীন ঐতিহাসিকগণ বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশের ব্যাপারে রামমোহন রায়ের সুগভীর ও ব্যাপক প্রভাবকে অস্বীকার করতে চান তাঁরা বলেন যে, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের প্রবর্তিত গদ্যরীতির ধারা বিদ্যাসাগরের লিখন ভঙ্গীকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল বলেই তিনি এমন সুন্দর গদ্য লিখতে পেরেছিলেন ; আর বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর গদ্যরীতির মূলসূত্রটিও পেয়েছিলেন বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে। উপস্থিত গ্রন্থ যাঁরা ভালো করে পড়বেন তারাই দেখতে পাবেন এরূপ মতবাদ কী পরিমাণে ভিত্তিহীন ও গ্রহণের অযোগ্য। তবু বিদ্যাসাগরের নিজস্ব গদ্যরীতির উপর মৃত্যুঞ্জয়ের তথাকথিত বিশেষ প্রভাব সম্বন্ধে পৃথক্ আলোচনার প্রয়োজন আছে। মৃত্যুঞ্জয়ের গদ্যের যে যে দোষের কথা রামগতি ন্যায়রত্ন উল্লেখ করেছেন সে গুলি হচ্ছে : ( ১ ) বিষয়বিন্যাসে বিশৃঙ্খলা, ( ২ ) ভাষার বিশৃঙ্খলা, ( ৩ ) ভাষাগত নীরসতা, (৪) অতি দীর্ঘ সমাসের প্রাদুর্ভাব ( ৫ ) মাঝে মাঝে অপ্রচলিত শব্দপ্রয়োগ, ( ৬ ) সংস্কৃতময় রচনার পাশাপাশি অপভ্রংশ ( প্রাকৃত ) শব্দময় রচনা [১]। কিন্তু এসকল দোষ ছাড়া মৃত্যুঞ্জয়ের নামে প্রচারিত 'প্রবোধচন্দ্রিকা'র গদ্যে এক মহৎ দোষ এই ছিল যে, এতে বাংলা গদ্যের স্বাভাবিক ছন্দকে স্বীকার করা হয় নি। এই ছন্দজ্ঞানের অভাবেই মৃত্যুঞ্জয়ের গদ্য অনেকাংশে সুষমাহীন ও উৎকট। অনেকের ধারণা এই যে, অতিদীর্ঘসমাসের ব্যবহারই মৃত্যুঞ্জয়ের গদ্যের মুখ্যদোষ, কিন্তু তা ঠিক নয়। বিদ্যাসাগরের রচনায়ও অতি বৃহৎ সমাস মাঝে মাঝে দেখা দিয়েছে, কিন্তু তাঁর মধ্যে একটা ছন্দবোধ (sense of rhythm ) থাকায় তিনি যা কিছু লিখেছেন সমাসবহুল হলেও তা লালিত্য হারায় নি। গদ্যের এই ছন্দবোধ বিদ্যাসাগর পেয়েছিলেন কোথা থেকে ? বিদ্যাসাগরের অলৌকিক প্রতিভায় বিশ্বাসবান ব্যক্তিরা বলবেন, এ ছন্দবোধ নিয়ে তিনি জন্মেছিলেন, এ তাঁকে কারুর কাছে শিখতে হয় নি। ঐতিহাসিক অবশ্য এরূপ কল্পনাকে কোন মূল্য দিতে রাজী হবেন

( ১ ) বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব। পৃঃ ২৪৫

না। কারণ বাংলা গদ্যের ছন্দবোধ সর্ব্বপ্রথমে দেখা গিয়েছিল রামমোহন রায়ের রচনায় [২]।

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের শ্রেণীস্থ গোঁড়া পণ্ডিতেরা রামমোহন প্রচারিত ধর্মমতের মতো তাঁর প্রবর্তিত গদ্যের সৌন্দর্যকেও বুঝতে পারেন নি, কিন্তু তা সত্ত্বেও সেকালকার সকল ব্রাহ্মণপণ্ডিতই এ বিষয়ে অন্ধ ছিলেন না। এ সকল ব্রাহ্মণপণ্ডিতের মধ্যে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের নাম করতে হয় সকলের আগে। ইনি যে রামমোহনের পরম অন্তরঙ্গ পার্ষদ ছিলেন তা সুবিদিত। এঁর রচিত বাংলা গদ্যের নমুনা শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের চেষ্টায় পাওয়া গিয়েছে [৩]। এ গদ্য রচনাটি প্রকাশিত হয় 'প্রবোধ চন্দ্রিকা'র পূর্বে, এবং এতে লেখকের ছন্দবোধের প্রমাণ বেশ সুস্পষ্ট। বিদ্যাসাগর যখন সংস্কৃত কলেজের ছাত্র তখন এই রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ সেখানকার স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক। এই ঘটনা থেকে কেবল যে, বিদ্যাগরের গদ্যরীতি গঠনের মূলসূত্রের সন্ধান পাই তা নয়, তাঁর পরবর্তী কর্মজীবনের গতিও যে এ ঘটনায় নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল তাও বোঝা যায়। উত্তরকালে বিদ্যাসাগর যে স্মৃতিশাস্ত্রের প্রমাণ উদ্ধার ক'রে বিধবা বিবাহ প্রচলনের জন্যে বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন এটা মোটেই আকস্মিক ঘটনা নয় [৪]। যাক্ এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা উপস্থিত ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক। বিদ্যাসাগরের বাংলা গদ্যের উপর যে তাঁর শিক্ষক রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের গদ্যের প্রভাব থাকতে পারে তা অস্বীকার করা শক্ত। এ ছাড়া বিদ্যাসাগরের গদ্যরীতি গঠনে অন্যান্য প্রভাবও যে নিষ্ক্রিয় ছিল তা বলা যায় না। সে সকলের সঙ্গে মৃত্যুঞ্জয়ের সম্পর্ক কল্পনা করা অত্যন্ত দুঃসাধ্য।

১৮৩৩ সালে সংস্কৃত কলেজের ইংরাজী বিভাগের তিন জন শিক্ষক মিলে 'বিজ্ঞানসারসংগ্রহ' নামে এক পাক্ষিক কাগজ প্রকাশ করেন। এ কাগজ পর বৎসর থেকে মাসিকে পরিণত হয়। সংস্কৃত কলেজের সঙ্গে

(২) পঞ্চম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

(৩) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৪৫, পৃঃ ১০৬-১০৮

(৪) প্রা, গ্র, পৃঃ ১০৩

সংশ্রব থাকলেও এতে পণ্ডিতী রীতির প্রভাব তেমন ছিল না। এতে ব্যবহৃত গদ্যে মাঝে মাঝে ছন্দজ্ঞানের পরিচয় আছে। বিদ্যাসাগরের ছাত্রাবস্থায় প্রচারিত 'জ্ঞানান্বেষণ' নামক সাময়িক পত্রিকার ভাষাও নিতান্ত ছন্দবর্জিত নয়। এ সকল কাগজের রচনা যে, বিদ্যাসাগরের গদ্যরীতি গঠনে খানিকটে সাহায্য করে থাকতে পারে এরূপ অনুমান হয়ত দোষাবহ হবে না। বিদ্যাসাগরের প্রথম প্রকাশিত বই 'বেতাল-পঞ্চবিংশতি' লেখা হওয়ার আগেই বাংলা গদ্যে একাধিক লেখকের ছন্দবোধ আরো স্পষ্টভাবে দেখা দিয়েছিল। এ সময়কার একজন শ্রেষ্ঠ লেখক ছিলেন গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য। ১৮৪০ সালের আগে লেখা বাংলা গদ্যের যে যে নমুনা পাওয়া গিয়েছে ঐ সালে প্রকাশিত গৌরীশঙ্করের 'জ্ঞানপ্রদীপ' ১ম খণ্ডের গদ্য সে সকলেরই চেয়ে উৎকৃষ্ট। এ গদ্যের যে নমুনা আগে উদ্ধৃত হয়েছে তা পড়লে স্পষ্ট মনে হবে যে গৌরীশঙ্করের গদ্যই বিদ্যাসাগরী গদ্যের মূল[৫]। মাঝে মাঝে দীর্ঘ সমাসের বিন্যাস সত্ত্বেও 'জ্ঞানপ্রদীপে'র গদ্য বেশ ছন্দময় ও সুললিত। গৌরীশঙ্কর যে তাঁর বাংলা গদ্যের ছন্দজ্ঞান রামমোহন রায়ের রচনা থেকে পেয়েছিলেন এ অনুমান করা হয়ত অসঙ্গত হবে না। কারণ সতীদাহ নিবারণের আন্দোলনে তিনি রামমোহন রায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সহযোগিতা করেছিলেন। কাজেই রামমোহনের রচনাগুলি যে তিনি খুব মনোযোগ দিয়ে পড়েছিলেন সে সম্বন্ধে সন্দেহ করা কষ্টকর। অতএব দেখা যায় বিদ্যাসাগরের গদ্য, গৌণভাবে হলেও রামমোহনের গদ্য দ্বারাই প্রভাবিত হয়েছিল।

(৫) দ্রঃ পৃঃ ৮৬।

# চতুর্দ্দশ অধ্যায়

## রাজেন্দ্রলাল-প্যারীচাঁদ পর্ব (১৮৫৫—১৮৭২)

### (ক) রাজেন্দ্রলাল মিত্র

তত্ত্ববোধিনী-যুগের দ্বিতীয়পর্ব শুরু হ'ল রাজেন্দ্রলাল (১৮২২-১৮৯১) ও প্যারীচাঁদ মিত্রের হাতে। রাজেন্দ্রলালের 'বিবিধার্থসংগ্রহে'র প্রচার 'তত্ত্ববোধিনীর' চেয়েও বেশি ছিল। যেখানে এ শেষোক্ত কাগজের সর্বোচ্চ গ্রাহকসংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ৭০০, সেখানে 'বিবিধার্থে'র গ্রাহক সংখ্যা হয়েছিল ১২০০। কিন্তু রাজেন্দ্রলালের পত্রিকা যখন প্রথম প্রকাশিত হয় (১৮৫১), তখনো চলছে তত্ত্ববোধিনী যুগের দেবেন্দ্র-অক্ষয় পর্ব (১৮৪৩-১৮৫৫)। তিনি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার পরম অনুরাগী হলেও, এ ভাষার এবং তৎকালের প্রচলিত সংস্কৃত পণ্ডিতদের পৃষ্ঠপোষিত সাধু ভাষার ত্রুটি সম্বন্ধে একেবারে অন্ধ ছিলেন না। তাই 'বিবিধার্থে'র ভাষাকে তিনি একটু সরলতর করবার চেষ্টা করেন। এ কাগজের প্রথম সংখ্যায় রাজেন্দ্রলাল তাঁর রচনারীতি সম্বন্ধে লিখেছেন :—

> "আমাদিগের লিখিবার প্রণালী বিষয়ে পণ্ডিত মহাশয়দিগেয় অসন্তুষ্ট হইবার সম্ভাবনা আছে ; কিন্তু ভরসা করি তদ্বিষয়ে তাঁহারা এতৎপত্রের লক্ষ্য স্মরণকরত আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন। যাহাতে বণিক এবং মোদক আপন আপন কর্ম্ম হইতে অবকাশমতে জগতের বৃত্তান্ত জানিতে পারে, যাহাতে বালক ও বালিকাবর্গে গল্পবোধে ক্রীড়াচ্ছলে এই পত্র পাঠ করিয়া আপন আপন জ্ঞানের বিস্তার করে, যাহাতে যুবকগণ ইন্দ্রিয়োদ্দীপক গ্রন্থ সকল পরিহরণপূর্ব্বক উপকারক বিষয় সকলের চর্চ্চা করে, যাহাতে বৃদ্ধ ব্যক্তি তুষ্টিজনক বিষয়ে সদালাপ করিতে সক্ষম হয়েন এমত উপায় প্রদান করা এই পত্রের লক্ষ্য, এবং ঐ মানসসিদ্ধ্যর্থে যাহাতে এই পত্র সকলে পাঠ করিতে পারেন ইহা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য।"

"পণ্ডিত মহাশয়েরা অপভ্রংশ ও অপর ভাষা অনায়াসে বুঝিতে পারেন, কিন্তু সুকঠিন সাধুভাষা উপদেশ বিরহে কদাপি বোধগম্য হইতে পারে না ; অতএব অপভ্রংশমিশ্রিত প্রচলিত ভাষা যাহা ভদ্র-সমাজে কথোপকথনে সর্ব্বদা ব্যবহার হইয়া থাকে তাহাই এই পত্রের উপযুক্ত পরিচ্ছদ।"

কিন্তু রাজেন্দ্রলাল যাই লিখুন না কেন উল্লিখিত অংশের ভাষার সঙ্গে 'তত্ত্ববোধিনী'র ভাষার প্রভেদ খুবই কম। আর 'বিবিধার্থে'র প্রথম ভূমিকার আরম্ভের সঙ্গে অক্ষয়কুমারের রচনার সাদৃশ্য এতই বেশি যে, একে অনায়াসে দত্ত মহাশয়ের রচনা ব'লে চালানো যেতে পারে। নিচে এই ভূমিকার আরম্ভটি উদ্ধৃত হ'ল :—

"জগদীশ্বরের কি অনুপম মহিমা! তাঁহার ইচ্ছায় এই ব্রহ্মাণ্ড-মধ্যে কি আশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় ব্যাপারসকল অবিরত নিষ্পন্ন হইতেছে! তাঁহার নিয়মে আকাশে চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্রাদি স্ব স্ব কর্ম্মে সর্ব্বদা নিযুক্ত আছে ; কেহ ক্ষণমাত্রের নিমিত্তেও বিশ্রাম করে না। চন্দ্রের পাক্ষিক হ্রাসবৃদ্ধি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে নিয়মে হইয়াছিল অদ্যাপিও তদ্রূপেই হইতেছে, তাহার কিঞ্চিৎ মাত্রও ন্যূনাতিরেক হয় নাই।"

উল্লিখিত অংশটি থেকে বোঝা যাবে যে রাজেন্দ্রলালের গদ্যের উপর অক্ষয়কুমারের প্রভাব গোড়ার দিকে কত বেশি ছিল। স্থানে স্থানে তত্ত্ববোধিনী সম্পাদকের প্রকাশ্য প্রশংসা ক'রেও তিনি এ প্রভাবের আংশিক প্রমাণ রেখে গেছেন। যেমন তিনি লিখেছেন ( ১৮৫১ ) :—

"তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় স্বীয় অতুল্য পারিপাট্য দ্বারা নানক শাহের মতের মর্ম্ম সংগ্রহ করিয়া উক্ত পত্রিকাতে প্রকাশ করিয়াছেন। অতএব যাঁহারা নানক-পন্থিদিগের বিশেষ বিবরণ জানিতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদিগকে অনুরোধ করি, উক্ত পত্রে ঐ প্রস্তাব পাঠ করুন। তথা হইতে এস্থলে কয়েক পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করা গেল।"

রাজেন্দ্রলালের উপর 'তত্ত্ববোধিনী' সম্পাদকের প্রভাবের অন্যতর প্রমাণ এই যে, গোড়াতে 'তত্ত্ববোধিনী'র অনুকরণে 'বিবিধার্থ'ও এক বৎসরের

জন্যে পরীক্ষাধীনভাবে প্রকাশিত হবে ব'লে ঘোষিত হয়েছিল, আর এ কাগজেও বৈজ্ঞানিক এবং ঐতিহাসিক প্রবন্ধেরই ছিল প্রাচুর্য। কিন্তু সেকালের গুরুগম্ভীর সাধু ভাষাকে দুএকদিনেই সরলতর ক'রে তুলতে না পারলেও, 'বিবিধার্থে' ব্যবহৃত তৎকালীন সাধুভাষা ক্রমেই একটু হাল্কা হয়ে আসছিল। নিচে এরূপ হাল্কা ভাষার রচনার (১৮৫১-৫২) নমুনা উদ্ধৃত হ'ল।

"কএক বৎসর হইল অযোধ্যাবাসী রাজদেহরক্ষক দুই অশ্বারোহী সৈনিক পুরুষ গোমতী নদীতীরে উপনীত হইয়া দেখিল যে তিনটা পশু জল পান করিতেছে তন্মধ্যে দুইটা নেকড়িয়া ব্যাঘ্রশাবক প্রত্যক্ষ হইল, তৃতীয়টা পশুবৎ, কিন্তু ভিন্ন জাতি। অশ্বারূঢ়েরা তৎক্ষণাৎ দর প্রতি ধাবমান হইয়া তাহাদিগকে বন্ধন করিয়া দেখিল তাহাদের মধ্যে একটা উলঙ্গ ক্ষুদ্র বালক। সেও পশুবৎ চতুষ্পদে হাঁটিতে শিখিয়াছিল; এবং তাহাতে তাহার কুনি ও হাঁটুতে কড়া পড়িয়াছিল। স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে চলিবার দোষই এই কড়ার কারণ। তাহারা তাহাকে ধরিবার সময়ে সে তাহাদিগকে আঁচড়াইতে লাগিল। অনন্তর, লক্ষ্ণৌ নগরে ঐ বালক আনীত হয়; এবং তথায় কিযৎ কাল ইহা জীবিত ছিল; বোধ হয় এতাবৎ কাল পর্য্যন্তও বাঁচিয়া থাকিতে পারে। তাহার কিছুমাত্র বাক্যস্ফূর্ত্তি হয় নাই; এবং বুদ্ধি কুক্কুর জাতির ন্যায়; অনায়াসেই সঙ্কেতাদি গ্রহণ করিতে পারিত।

"ইমিসা নগরে যাত্রাকালীন ইহারা পথিমধ্যে দেখিল, এক খচ্চর দৌড়িয়া আসিতেছে, এবং তাহার স্বামী চীৎকার করিয়া কহিতেছে "মহাশয়েরা আমার খচ্চরটিকে ধরুন।" বণিক স্বভাবতঃ সরল; খচ্চরস্বামীর বাক্য শ্রবণমাত্র তাহার সাহায্যার্থ অগ্রসর হইল; এবং বহু পরিশ্রমে ঐ খচ্চরকে ধরিতে না পারিয়া দুরন্ত পশুকে স্থির করিবার অভিপ্রায়ে তাহার প্রতি এক লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিল। দৈবাৎ ঐ ঢেলা খচ্চরের চক্ষুর উপর পড়িয়া তাহাকে অন্ধ করাতে তৎস্বামী মহাক্রোধে বণিকের নিকট খচ্চরের মূল্য

চাহিলেক। ইহুদি কহিল; "আদৌ আমার প্রাপ্য লই, তবে তোমার খচ্চরের দাম পাইবে" ইহাতে সেও কাজির নিকটে চলিল।"

স্থানে স্থানে লোকপ্রচলিত অপর ভাষার শব্দ (যেমন, নেকড়িয়া, হাঁটিতে, কড়া, আঁচড়াইতে, খচ্চর, ধরিতে, ঢেলা, দাম) প্রয়োগে এবং সমাসবদ্ধ পদের প্রায় অভাববশত এ রচনাব রীতি 'তত্ত্ববোধিনী'র রচনারীতি থেকে একটু সরল হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু মাঝে মাঝে এরূপ সরলভাষা প্রয়োগ করা সত্ত্বেও 'বিবিধার্থে' সাধুভাভার সমাদর একেবারে কম ছিল না। অবশ্য কখনো কখনো সে ভাষা হয়ত ছিল বাইরের লেখকদের। তবে রাজেন্দ্রলাল মাঝে মাঝে খাঁটি সাধু ভাষাযও লিখতেন ব'লে মনে হয়। নূতন গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে তিনি একবার লিখেছিলেন (১৮৫৪):—

> "আমরা বহু দিবসাবধি মানস করিতেছি যে মধ্যে ২ নূতন গ্রন্থের মহিমাবিষয়ক প্রস্তাব বিবিধার্থে প্রকটিত করিব, কিন্তু অবকাশাভাব প্রবুক্ত সে কল্পনা অদ্যাপি সিদ্ধ করিতে পারি নাই এবং ত্বরায় তাহা ফলিতার্থ করিবার উপাযও দেখি না; অতএব নূতন গ্রন্থের গুণকীর্ত্তন পরিবর্ত্তে অন্ধমাতুলন্যাযে তাহার বিজ্ঞাপন করাই বিহিত বোধে এই প্রস্তাবে নূতন গ্রন্থের নামমাত্র প্রকটিত করিলাম।"

উল্লিখিত স্থলটিতে রাজেন্দ্রলাল, 'নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো' এই প্রবাদবাক্যটিকে যে সংস্কৃত রূপ দিয়েছেন তা খুবই কৌতুকাবহ। কারণ, কোন সংস্কৃত পুস্তকে 'অন্ধমাতুলন্যায়' পদের ব্যাখ্যা মিলবে কি না সন্দেহ। এই সংস্কৃতপ্রীতির জন্যে রাজেন্দ্রলালের গদ্যসংস্কারের চেষ্টা সম্যক ফলবতী; হয় নি। কিন্তু তাঁর চেষ্টার পরিণতি সমসাময়িক অন্য যোগ্য ব্যক্তিদের উদ্যমকে উদ্বুদ্ধ করার সাহায্য ক'রল। সুযোগ্য বিদ্বান্ প্যারীচাঁদ মিত্র ও তাঁর সহকর্মী রাধানাথ শিকদার ১৮৫৪ সালে 'মাসিক পত্রিকা' নামক নূতন কাগজ প্রকাশ ক'রে তাতে এমন সহজবোধ্য ও চলতি ভাষা ব্যবহার করলেন, যা মেয়েদের এবং অল্প শিক্ষিত লোকদেরও বুঝতে অসুবিধা হল না। এই ১৮৫৪ সাল থেকেই তত্ত্ববোধিনী যুগের

দ্বিতীয় পর্বের সূচনা। সে পর্বে রাজেন্দ্রলালের লেখার মাঝে বেশ সরলতা দেখা দিয়েছে। এ কথার দৃষ্টান্ত স্বরূপ ১৮৫৮ সালের 'বিবিধার্থ' থেকে রাজেন্দ্রলালের রচনার কিয়দংশ নিচে দেওয়া যাচ্ছে :—

"কিয়ৎকাল পরে আমাদিগের বাটি হইতে কোন দ্রব্য চুরী যাওয়াতে চালপড়া পরীক্ষার উদ্যোগ হয়। তৎসময়ের আড়ম্বর দেখিয়া আমাদিগের মুখ এ প্রকার শুষ্ক হইয়াছিল যে, গণৎকার আমাদিগকে চালপড়া দিলে, বোধ হয়, চোর ধরিবার কিছুমাত্র বিলম্ব হইত না। কিন্তু তাহা হইলে অপহৃত বস্তু পাইবার কোন সম্ভাবনাও হইত না। এই ঘটনার পরে চোর ধরিবার সদুপায় মধ্যে বাটিচালা, কঞ্চিচালা, বেতচালা প্রভৃতি কএক উপায় দেখিলাম, ও ক্রমশঃ ভূত নাবান প্রকরণ দেখিয়া ভূতের অস্তিত্ব বিষয়ে ও তাহারা যে, মন্ত্রের বশীভূত তাহাতে আর সন্দেহমাত্র রহিল না। বেতাল-পঞ্চবিংশতিতে বেতালের প্রতি পাঠদশায় যে অভক্তি জন্মিয়াছিল তাহা একেবারে অপহৃত হইল।"

রাজেন্দ্রলালের এ রচনাটি যে শুধু সরল তা নয়, এতে কিছু রসও আছে। মন্ত্রতন্ত্রাদির ও occultism-এর প্রতি যে প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ সমগ্র প্রবন্ধে বর্তমান তা বেশ উপভোগ্য। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে বিশুদ্ধ সাহিত্যিক রচনায় তিনি নিজের এই রসদ্বোধিনী শক্তির ব্যবহার করেন নি, এবং তাঁর গদ্যও উত্তরোত্তর সরল হয়ে আসে নি। ১৮৬২ সালে রাজেন্দ্রলাল যে একটি খ্রীষ্টীয় স্তবের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন তাও বেশ সংস্কৃতমূলক সাধু ভাষায় লিখিত। সে অনুবাদটির কিয়দংশ নিচে উদ্ধৃত করা গেল :—

"হে প্রভো! হে জগৎপতে! তোমার পবিত্রতার ভয়কে আমার নেত্রযুগলের সম্মুখে প্রহরীস্বরূপে স্থাপন কর, যাহাতে আমার নেত্র-যুগল যেন লোভাসক্ত হইয়া দর্শন না করে; তাহা আমার কর্ণদ্বয়ের সম্মুখে স্থাপন কর, যাহাতে তদ্দ্বয় পাপকর বাক্য শ্রবণে আস্থা না করে, তাহা আমার মুখের সম্মুখে স্থাপন কর, যাহাতে তাহা আর মিথ্যা উচ্চারণ না করে; তা [হা] আমার মনের সম্মুখে স্থাপন কর

যাহাতে আর দুষ্টতার ভাবনা না হয ; তাহা আমার হস্তদ্বয়ের সম্মুখে স্থাপন কর, যাহাতে তাহারা আর অন্যায না করে ; তাহা আমার পদদ্বয়ের সম্মুখে স্থাপন কর, যাহাতে তাহারা আর অসৎ পথে গমন করিতে না পারে ; পরন্তু, তৎসমুদায়কে এ প্রকারে চালিত কর যাহাতে তাহারা তোমার আজ্ঞানুবর্ত্তী হয। তোমার জীব সকলের প্রতি এবং উৎকট অপরাধী আমার প্রতি দযা কর।"

"হে খ্রীষ্ট! তুমি সুতাক্ষ অগ্নি ; আমার আত্মাকে তোমার সেই প্রেমাগ্নিতে প্রজ্জ্বলিত কর, যাহা তুমি আমার আত্মস্থ (স্থ ত্ম অ) মলা ধ্বংস করিবার নিমিত্ত পৃথিবীতে বিকীর্ণ করিয়াছ। আমার অন্তঃকরণকে নির্ম্মল কর, পাপ হইতে আমার দেহকে বিশুদ্ধ কর, এবং আমার মনে তোমার জ্ঞানের রশ্মি দীপ্ত কর।"

উল্লিখিত খ্রীষ্টীয স্তবটির পরে প্রকাশিত রাজেন্দ্রলালের 'রহস্যসন্দর্ভ' পত্রিকাযও তিনি এ জাতীয ভাষা ব্যবহার করেছেন, এবং তাতে সংস্কৃত শব্দের পরিমাণ আগের চেযে বিশেষ কমে নি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তাঁর লেখা 'মৃ ণা লি নী'র সমালোচনা (১৮৭০) থেকে কিযদংশ নিচে দেওয়া গেল :—

তাঁহার রচনাচাতুর্য্যের ও গল্পবিন্যাসের ক্ষমতা উত্তরোত্তর সমধিক উৎকৃষ্টতালাভ করিয়াছে। ইহা বক্তব্য যে রচনাচাতুর্য্যে আমরা শব্দালঙ্কারের প্রতি লক্ষ্য করি না। যে কেহ সুচারু যমক, কলকলধ্বনিত অনুপ্রাস, চমৎকার শ্লেষ, বা অদ্ভুত বক্রোক্তির অনুমোদন করিতে চাহেন তিনি বাণভট্টের "কাদম্বরী" কি দণ্ডীকৃত "দশকুমারচরিত" কি জয়দেবের "গীতগোবিন্দে"র অনুসরণ করিতে পারেন। বাঙ্গালী অনেক গ্রন্থেও তাহার অভাব নাই। মৃত্যুঞ্জয়-কৃত "প্রবোধচন্দ্রিকায" বাগাড়ম্বরের বিলক্ষণ প্রাচুর্য্য দেখা যায়। অর্থবিন্যাসের ছটাও অপরাপর বাঙ্গালী গ্রন্থে যে প্রকার দৃষ্ট হয় আলোচ্য গ্রন্থে তাহার বিলক্ষণ অসদ্ভাব আছে। পরন্তু ঐ সকল অলঙ্কারের প্রধান উদ্দেশ্য প্রসাদজনন * * * * শ্রীযুক্ত বঙ্কিমবাবুর শেষ রচনায় ঐ প্রসাদগুণ সম্পূর্ণ বর্ত্তমান আছে। * * * * ঐ

প্রসাদগুণ বিনা যমকানুপ্রাসাদি অলঙ্কারে, কেবল বাক্য বিন্যাসের কৌশলে নিষ্পন্ন হওয়ায় বিশেষ প্রীতিকর হইয়াছে।"

এই সমালোচনার ভাষা থেকে দেখা যায় যে রাজেন্দ্রলালের গদ্য শেষ পর্য্যন্ত বেশীর ভাগেই সংস্কৃতঘেঁষা ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর গদ্যে বিদ্যাসাগরাদির রচনার মতো সমাসবাহুল্য নেই, ও তাতে খাঁটি বাংলা শব্দ প্রয়োজনমত, নিঃসঙ্কোচে ব্যবহৃত হয়েছে। এক দিক দিয়ে তাঁর দৃষ্টান্ত বাংলা গদ্যের অগ্রগতির পক্ষে প্রভাববিহীন নয়। তাই তাঁর নাম এ প্রসঙ্গে শ্রদ্ধার স্মরণীয়।

# পঞ্চদশ অধ্যায়

## ( খ ) প্যারীচাঁদ মিত্র

'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' এক সুললিত অথচ অনাড়ম্বর সাধু ভাষার গদ্যরীতির প্রবর্তন করলেও সে রীতিতে ছিল খাঁটি সংস্কৃত শব্দের একান্ত বাহুল্য। প্রাকৃত ( তদ্ভব ), দেশজ বা বিদেশী শব্দ এ ভাষায় নিতান্ত প্রয়োজনের খাতিরে ছাড়া বড় একটা ব্যবহৃত হ'ত না। এ কারণে সাহিত্যের ভাষা ক্রমশ সাধারণ কথাবার্তার ভাষা থেকে একান্ত দূরবর্তী হয়ে পড়ছিল। এ দূরত্ব বিশেষ বৃদ্ধি পাচ্ছিল তারাশঙ্কর ও বিদ্যাসাগর আদির মতো সংস্কৃত সাহিত্যে ব্যুৎপন্ন লেখকদের হাতে। এ ব্যাপার দেখে ইংরেজী শিক্ষিত লেখক ও পাঠকদের মনে এক বিষম আঘাত পড়ল। বাংলা লেখা পড়া পাছে সংস্কৃতজ্ঞানের মতো মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে নিবদ্ধ থেকে, দেশের লোকের জ্ঞানচর্চার প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়, এ আশঙ্কা ক'রে তাঁরা গদ্যকে নূতন রাস্তায় চালাবার চেষ্টা করলেন। রাজেন্দ্রলাল ও প্যারীচাঁদ মিত্র ( ১৮১৪-১৮৮৩ ) প্রভৃতি ছিলেন এ প্রচেষ্টার মূলে। এ বিষয়ে রাজেন্দ্রলালের চেষ্টায় ফলাফল পূর্বাধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। কিন্তু প্যারীচাঁদের কৃতিত্ব তাঁর চেয়ে অনেক বেশি। তিনি রাধানাথ শিকদারের সঙ্গে মিলে 'মাসিক পত্রিকা' নামে যে এক কাগজ বার করলেন ( ১৮৫৪ ) সে কাগজের প্রথম সংখ্যায় লিখিত হয়েছিল, 'যে ভাষায় আমাদিগের সচরাচর কথাবার্ত্তা হয় তাহাতেই প্রস্তাব সকল রচনা হইবেক।' পত্রিকা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে **'টেকচাঁদ ঠাকুর'** এই ছদ্মনামে প্যারীচাঁদ তাঁর সুবিখ্যাত 'আলালের ঘরের দুলাল' নামক উপন্যাস এ কাগজে ক্রমশ প্রকাশ করতে লাগলেন। খুব সহজবোধ্য ভাষায় লিখিত এ উপাখ্যান বেশ লোকপ্রিয় হ'ল। ১৮৫৭ সালের কাছাকাছি সময়ে এ বই পুস্তকাকারে ছাপা হওয়ার অব্যবহিত পরবর্তীকালে বাংলা গদ্যে ক্রমশ দেখা দিল এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন।

অংশত কৃত্রিম ও শ্লথগতি সাধুভাষা বেশ বেগবান্ এবং প্রাণবন্ত হয়ে উঠল। সমাসাড়ম্বরে ও খাঁটি সংস্কৃতশব্দে পূর্ণ বিদ্যাসাগরী ভাষা প'ড়ে প'ড়ে লোকে ভুলেই যাচ্ছিল যে, সাহিত্যের ভাষার সঙ্গে মুখের কথার কোন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। 'আলালের ঘরের দুলাল' এ সম্বন্ধ দেশের লোককে বেশ ভালো ক'রেই জানিয়ে দিল। আর চলিত ভাষার প্রাধান্য স্বীকার করেও লেখার মধ্য দিয়ে যে, উত্তম সাহিত্য রস পরিবেশন করা যায় একথাও প্রমাণ করলেন প্যারীচাঁদ। তাঁর পুস্তকে তৎকাল প্রচলিত নানা শ্রেণীর কথ্যভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথমতঃ কল্‌কাতার ও তার নিকটবর্তী ভদ্রশ্রেণীর কথ্যভাষা। যেমন :—

"রবিবারে কুঠিওয়ালারা বড় ঢিলে দেন, হচ্ছে হবে, খাচ্ছি খাব, বলিয়া অনেক বেলায় আহার করেন। তাহার পরে কেহ বা বড়ে টেপেন, কেহ বা তাস পেটেন, কেহ বা মাছ ধরেন, কেহ বা তবলায় চাটি দেন, কেহ বা সেতার লইয়া পিড়িং পিড়িং করেন, কেহ বা শয়নে পদ্মলাভ ভাল বুঝেন, কেহ বা বেড়াতে যান, কেহ বা বহি পড়েন।"

"বেলেল্লা ছোঁড়াদের আয়েসে আশ মেটে না, প্রতিদিন তাহাদের নূতন নূতন টাট্‌কা টাটকা রং চাই। বাহিরে কোন রকম আমোদের সূত্র না পাইলে ঘরে আসিয়া মাথায় হাত দিয়া বসে। যদি প্রাচীন খুড়া জেঠা থাকে তবেই বাঁচোয়া, কারণ বেসম্পর্ক ঠাট্টা চলে অথবা জো সো করে তাঁহাদিগের গঙ্গাযাত্রার ফিকিরও হইতে পাবে, নতুবা বিষম সঙ্কট—একেবারে চারিকে সরিষাফুল দেখে।"

দ্বিতীয়তঃ কল্‌কাতার বা তার কাছাকাছি জায়গায় বাস করে এমন সাধারণ মুসলমানের ভাষা :—

"ঠকচাচা চৌকির উপর থেকে হুমড়ি খেয়ে পড়িয়া বলিলেন—মোর উপর এতনা টিটকারী দিয়া বাত হচ্চে কেন? মুইতো এ সাদি করতে বলি- একটা নামজাদা লোকের বেটী না আন্‌লে আদমির কাছেবহুত সরমের বাত, মুই রাতদিন ঠেওরে ঠেওরে দেখেছি যে, মণিরামপুরের মাধববাবু আচ্ছা আদমি—তেনার নামে বাগে গরুতে

একঘাটে জল খায়—দাঙ্গা হাঙ্গামের ওক্তে লেঠেল মেংলে লেঠেল মিল্‌বে—আদালতের বিলকুল আদমি তেনার দস্তের বিচ—আপদ্‌ পড়লে হাজার সুরতে মদত্‌ মিল্‌বে। কাঁচড়াপাড়ার রামহরিবাবু সেকস্ত আদ্‌মি—ঘেসাট ঘোসাট করে প্যাট টালে—তেনার সাতে খেসি কামে কি ফায়দা ?"

বাংলা গদ্যের মধ্যে যে এমন সর্বজনভোগ্য রসোদ্রেক ক্ষমতা আছে প্যারীচাঁদের আগে পর্যন্ত তা কেউ ভালোভাবে দেখাতে পেরেছেন কিনা সন্দেহ। উইলিয়ম কেরী তাঁর 'কথোপকথন' (১৮০১) গ্রন্থে সর্বপ্রথম চল্‌তি ভাষার নানা চিত্তাকর্ষক নমুনা প্রকাশ করেছিলেন বটে, কিন্তু 'আলালে'র মত কোনো মনোজ্ঞ উপাখ্যানের অঙ্গীভূত না হওয়ায় সেগুলি রসসৃষ্টির কারণ হযে ওঠে নি। তাই কেরীর কাছে প্যারীচাঁদের ঋণের কোন কথাই ওঠে না। 'প্রবোধচন্দ্রিকার'ও স্থানে স্থানে চলিত ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে বটে কিন্তু খাঁটি সংস্কৃতবহুল ভাষার চাপে প'ড়ে তার নিজের সহজ সৌন্দর্য ফোটে নি। এ সকল কথা বিবেচনা ক'রলে, চলিত ভাষাকে সাহিত্যে তার যথাযোগ্য সম্মান দেওয়ার গৌরব প্যারীচাঁদকেই দিতে হয়। তাঁর এ দান বঙ্গসাহিত্যকে কেমন সমৃদ্ধ করেছে পরবর্তী যুগের সাহিত্য আলোচনা করলেই তা বেশ বোঝা যাবে। বাংলা গদ্যের অন্ততঃ তিনজন খ্যাতনামা লেখক প্রত্যক্ষভাবে প্যারীচাঁদের গদ্যরীতির আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। এঁদের নাম হচ্ছে **মাইকেল মধুসূদন দত্ত** (১৮২৪-১৮৭৩), **দীনবন্ধু মিত্র** (১৮২৯-১৮৭৩) ও কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৪০-১৮৭০)। মাইকেল ও দীনবন্ধুর নাটকাদি এবং কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হু তো ম প্যাঁ চা র ন ক্‌ সা'তে যে ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে প্যারীচাঁদের প্রবর্তিত চলিত ভাষার আদর্শই রয়েছে তার মূলে। কিন্তু চলতি ভাষাকে যথাযোগ্য ব্যবহারে লাগানোই প্যারীচাঁদের একমাত্র কৃতিত্ব নয়। তৎকালে প্রচলিত সাধু ভাষাও তাঁর হাতে বিলক্ষণ সংস্কার প্রাপ্ত হযেছিল। তাঁর লিখিত অন্যান্য পুস্তক পুস্তিকাগুলিতে যে ভাষা তিনি প্রধানভাবে ব্যবহার করছেন সে ভাষা কথ্যভাষা নয়, সাধুভাষা। কিন্তু এ ভাষা বিদ্যাসাগর বা অক্ষয়কুমারের

গদ্যের মতো সংস্কৃতশব্দময় সাধুভাষা নয়। এতে সংস্কৃতশব্দের সঙ্গে অল্পবিস্তর প্রাকৃতমূলক ও অন্যান্য চলতি শব্দ (দেশী, আরবী, পারশী আদি) অকুণ্ঠিতভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। তারি জন্যে প্যারীচাঁদের সাধুভাষা বহুল পরিমাণে কৃত্রিমতাহীন ও প্রাণবন্ত। যুগযুগান্তর ধ'রে ব্যবহৃত সংস্কৃত সাহিত্যের অলঙ্কার (উপমারূপকাদি) যথাসম্ভব পরিত্যাগ ক'রে, বস্তু ব্যক্তি বা ঘটনার যথাযথ বর্ণনার ফলেও তাঁর সাধুভাষা এক নূতন শক্তি লাভ করেছে। নিচে 'আলাল' থেকে তাঁর সাধুভাষার কিছু নমুনা উদ্ধৃত করা গেল :—

"শারদীয় পূজার সময় উপস্থিত—বাজারে ও স্থানে স্থানে অতিশয় গোল—ঐ গোলে মতিলালের গোলে হরিবোল বাড়িতে লাগিল। স্কুলে থাকিতে গেলে ছট্‌ফটানি ধরে—একবার এদিকে দেখে—একবার ওদিকে দেখে—একবার বসে—একবার ডেস্ক বাজায় —এক লহমাও স্থির থাকে না। শনিবারে স্কুলে আসিয়া বক্রেশ্বর বাবুকে বলিয়া কহিয়া হাপ্‌স্কুল করিয়া বাটী যায়। পথে পানের খিলি খরিদ করিয়া দুই পাশে পায়রাওয়ালা ও ঘুড়িওয়ালার দোকান দেখিয়া যাইতেছে—অম্লান মুখ, কাহারও প্রতি দৃকপাত নাই, ইতিমধ্যে কয়েকজন পেয়াদা দৌড়িয়া আসিয়া তাহার হাত ধরিল।"

"যশোহরে নীলকরের জুলুম অতিশয় বৃদ্ধি হইয়াছে। প্রজারা নীল বুনিতে ইচ্ছুক নহে, কারণ ধান্যাদি বোনাতে অধিক লাভ, আর যিনি নীলকরের কুঠীতে যাইয়া একবার দাদন লইয়াছেন তাহার দফা একেবারে রফা হয়। প্রজারা প্রাণপণে নীল আবাদ করিয়া দাদনের টাকা পরিশোধ করে বটে কিন্তু হিসাবের লাঙ্গুল বৎসর বৎসর বৃদ্ধি হয় ও কুঠেলের গমস্তা ও অন্যান্য কারপরদাজের পেট অল্পে পূরে না।"

এ দুটি নমুনা থেকে বেশস্পষ্ট বোঝা যাবে যে, অক্ষয়কুমার বা বিদ্যাসাগরের ভাষার সঙ্গে প্যারীচাঁদের ভাষার তফাৎ কোথায়? প্যারীচাঁদ যে, প্রয়োজনমত চল্‌তি কথা (খাঁটি বাংলা বা বিদেশী ভাষার)

ব্যবহার করতে কুণ্ঠিত হন নি, এই হ'ল তাঁর সাধুভাষার প্রথম ও প্রধান বিশেষত্ব। আর সমাসবদ্ধ পদের যথাসম্ভব পরিবর্জনও তাঁর সাধুভাষার অন্য বিশেষ লক্ষণ; এজন্য বহু খাঁটি সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার ক'রে তিনি যে সাধুভাষা লিখেছেন তা প্রায় চলিত ভাষার মতই সহজবোধ্য এবং লঘুগতি হয়েছে। নিচে এ সাধুভাষার দৃষ্টান্ত দেওয়া হ'ল ঃ—

> "দেশ ভ্রমণের অনেক উপকার। দেশ ভ্রমণ না করিলে লোকের বহুদর্শিতা জন্মে না, নানা প্রকার দেশ ও নানা প্রকার লোক দেখিতে দেখিতে মন দরাজ হয়। ভিন্ন ভিন্ন স্থানের লোকদিগের কি প্রকার রীতি নীতি, কিরূপ ব্যবহার ও কি কারণে তাহাদিগের ভাল অথবা মন্দ অবস্থা হইয়াছে, তাহা খুঁটিয়া অনুসন্ধান করিলে অনেক উপদেশ পাওয়া যায়; আর নানাজাতীয় ব্যক্তির সহিত সহবাস হওয়াতে মনের দ্বেষভাব দূরে যাইয়া সদ্ভাব বাড়িতে থাকে। ঘরে বসিয়া পড়া শুনা করিলে কেতাবি বুদ্ধি হয়—পড়াশুনাও চাই—সৎলোকের সহবাসও চাই—বিষয় কর্ম্মও চাই—নানাপ্রকার লোকের সহিত আলাপও চাই।"

উল্লিখিত স্থানটির ভাষা যে খুব সরল ও সহজবোধ্য, তার আর এক কারণ এতে জটিল বাক্যের অভাব। উপর্যুপরি মিশ্র বা যৌগিক বাক্য প্যারীচাঁদের রচনায় খুবই দুর্লভ। তাঁর রচনার এ লক্ষণটি খুব সম্ভব দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনার প্রভাবে উৎপন্ন। এ মহাপুরুষকে প্যারীচাঁদ যে গভীর শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন তাঁর রচিত 'যৎকিঞ্চিৎ' (১৮৬৫) নামক পুস্তকে তার সুস্পষ্ট প্রমাণ আছে। অতএব ব্রাহ্মসমাজনেতা দেবেন্দ্রনাথের বক্তৃতা ও রচনাবলির সঙ্গে পরিচয়ের ফলে প্যারীচাঁদের এরূপ রচনারীতি গ'ড়ে উঠেছিল, এ অনুমান হয়ত অসঙ্গত হবে না। 'আলালে' প্যারীচাঁদ নানা শ্রেণীর কথ্যভাষা ব্যবহার করলেও তাঁর পরবর্তী রচনায় তিনি ক্রমশ সাধুভাষাই বেশির ভাগে ব্যবহার করেছেন। খানিকটা বিষয়বস্তুর অনুরোধ এবং খানিকটা চলতি কথা চালাবার উৎসাহে, 'আলালে'র সাধু ভাষায় মাঝে মাঝে চলতি ভাষার মিশ্রণ ঘটেছে। এ মিশ্রণের ফলে যা দাঁড়িয়েছে তাকে এ কালের দৃষ্টিতে

দোষ ব'লে গণ্য করা হবে। এ মিশ্রিত রীতির কয়েকটি নিদর্শন নিচে দেওয়া গেল :—

"ফাল্গুণ মাসে গাছপালা গজিয়ে উঠে ও ফুলের সৌগন্ধ্য চারিদিকে ছড়িয়া পড়ে।"

অনেক তেলামাথায় তেল পড়িল—কিন্তু শুখ্‌না মাথা বিনা তৈলে ফেটে গেল।

"শ্রাদ্ধের গোল ক্রমে মিটে গেল। বাঞ্ছারাম ও ঠকচাচা মতিলালের বিজাতীয় খোসামদ করিতে লাগিল।"

"বৈদ্যবাটিতে স্বস্ত্যয়নের ধূম লেগে গেল। সূর্য্য উদয় না হইতে শ্রীধর ভট্টাচার্য্য রামগোপাল চূড়ামণি প্রভৃতি জপ করিতে বসিলেন।"

এ ছাড়াও 'আলালে'র কথ্যভাষায় ব্যাকরণগত কিছু ত্রুটি ছিল ব'লে মনে হয়। কিন্তু এজন্যে প্যারীচাঁদকে তত দোষী করা যায় না, কারণ এতে চলিত ভাষার যে রূপ দেওয়া হয়েছিল, তা হয়ত অনেকটা পরীক্ষামূলক। অথবা এও হতে পারে যে, তাঁর সময়ে চলিত ভাষার রূপও অনেকটা এ রকমেরই ছিল। সে যাই হোক্ 'আলালে'র কথ্যভাষার জের তাঁর পরবর্তী বই 'মদ খাওয়া বড় দায়' (১৮৫৯), 'রামারঞ্জিকা', (১৮৬০) নামক বইগুলিতেও চলেছিল।

'মদখাওয়া—'নামক বই থেকে এর একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি :—

"ভবশঙ্কর। * * * আরে বলা—বলা—বলা!

বলরাম চাকর। এজ্ঞে—এজ্ঞে।

ভবশঙ্কর। আরে বেটা! পাঁচ ডাকের পর আজ্ঞে—নীচে গিয়া দেখদেখি হান্‌পে আসিয়াছে কি না? আর চার পাঁচ বোতল ব্রাণ্ডি ও বরফ শিগ্র আন।

বলরাম। হানিপ ঝুড়ি ঢাকা দিয়া দাঁড়াইয়া আছে; আর মোশাই কাল বলেছিলি যে হানিপ দাড়ি কামায়ে মালা পরে এস্‌বে—সে সব করেছে—এজ্ঞ তাকে গোঁসাই গোবিন্দের মত দেখাচ্চে।"

ভবশঙ্কর। তবে তাকে আস্তে আস্তে আসিতে বল্, আর তুই

বোতল টোতলগুলা এনে দিয়া দোয়ার ভেজাইয়া দাঁড়া। যে আসিবে তাকে বল্‌বি আমার বড় মাথা ধরেছে·—বুঝলি ?"

প্যারীচাঁদের চলিত ভাষার গদ্যে যে ত্রুটিই থাক্, তাতে সাহিত্যিক রস সৃষ্টির বিশেষ বাধা হয় নি। গোপনে মদ্যপানকারী ও যবনস্পৃষ্ট অখাদ্য ভক্ষণকারী ধর্মনেতার যে ছবি 'মদখাওয়া'তে এঁকেছেন তা বোধ বাংলা সাহিত্যে এজাতীয় ব্যঙ্গ রচনার আদি। কি মাইকেল, কি দীনবন্ধু এঁরা সকলেই প্যারীচাঁদের আদর্শ সামনে রেখে তাঁদের হাস্যরসাত্মক নাটকগুলি রচনা করেছেন। হাস্যরস ছাড়াও প্যারীচাঁদের গদ্যে নানা রকমের সৌন্দর্য স্ফূর্ত্তি পেয়েছে। 'য ৎ কি ঞ্চি ৎ' ( ১৮৬৫ ) নামক পুস্তকে প্যারীচাঁদ গল্পের মধ্যে যে ভ্রমণ বৃত্তান্তের কল্পনা করেছেন তার বর্ণনা বেশ হৃদয়গ্রাহী। নিচে এর কিঞ্চিৎ নিদর্শন নেওয়া যাচ্ছে :—

"পরদিন প্রভাতে সিকান্দ্রাবাদ সম্মুখে। চতুর্দ্দিকে উদ্যান—অট্টালিকার ভিতর আকবর শার সমাধি, কিন্তু বহুমূল্য সমাধি নির্ম্মিত হইলে কি ঐ স্থানে আত্মা আটক থাকিতে পারে ? আত্মা স্বস্থানে গমন করে। প্রস্তরে নির্ম্মিত সমাধিরও কালেতে সমাধি হইবে। যে পদার্থ ঊর্দ্ধে গমন করে তাহারই সমাধি নাই।

মথুরা দৃষ্টিগোচর হইতেছে—ঐ উচ্চভূমির উপর কংশ বধ হইয়াছিল—ঐ বিশ্রাম ঘাটে কৃষ্ণ বিশ্রাম করিয়াছিলেন, কিন্তু বিশ্রাম ঘাটে কচ্ছপের ক্ষণমাত্রও বিশ্রাম নাই, অহোরাত্র কিল্ কিল্ করিতেছে। মথুরায় বৈষ্ণব ধর্ম্মের উদয় ও বৃন্দাবনে ঐ ধর্ম্মের মধ্যাহ্নকাল। প্রথমেই গোবিন্দজির মন্দির—মন্দিরের চূড়া কোথায় ? যবন রাজা কর্ত্তৃক ভগ্ন। মুসলমান রাজারা হিন্দুধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব দেখিতে পারিতেন না। এ কারণ বলপূর্ব্বক উন্মূলন করিতে চেষ্টা করিতেন। বল দ্বারা কোন ধর্ম্মই বিস্তৃত বা নির্ম্মূলিত হয় না। ছল ও [ বল ] ধর্ম্ম বিস্তারক বা সংহারক হইতে পারে না। যাহা সত্য তাহা কেবল প্রেমবলে প্রাপ্য, ও বল ছল লোভ বা ভয় দ্বারা আনীত ও বিস্তৃত হইলেও সে সত্য, সত্যস্বরূপ গৃহীত হয় না।"

উল্লিখিত অংশটিতে যে এক সতেজ সুন্দর রীতির স্ফূর্তি হয়েছে তা এ লোকটির পূর্ববর্তী কোন রচনায় বড় একটা দেখা যায় না। এর থেকে বেশ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, প্যারীচাঁদের ভাষা একদিকে যেমন হাল্‌কা বিষয়বস্তু বা হাল্‌কা ভাব নিযে রসোদ্রেক করতে সমর্থ ছিল, অপরদিকে এ ভাষায় ওজস্বী বা গুরুগম্ভীর তত্ত্বমূলক রচনাও হতে পারত; এবং এতেও দেবেন্দ্রনাথ এবং অক্ষয়কুমারের রচনার মত নূতন সাহিত্যরীতি দেখা দিয়েছিল। এ সকল গুণ সত্বেও তৎকালীন সংস্কৃতনবীশ পণ্ডিতগণ বা তাঁদের মতানুবর্তীরা প্যারীচাঁদের গদ্যরীতির কঠোর সমালোচনা করেছিলেন। তাতেও এ গদ্যের অগ্রগতি বাধা পায় নি। ১৮৭১ সালে প্যারীচাঁদ "অ ভে দী" নামক যে নক্‌সা প্রকাশ করলেন, তাতেই তাঁর গদ্যের চরম বিকাশ দেখা যায়। 'যৎকিঞ্চিৎ' এর রচনায় যে রীতিসৌষ্ঠব তিনি দেখিয়েছিলেন 'অভেদী'তে তা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে। সমাসসঙ্কুল এবং সংস্কৃত শব্দময় না করলেও যে গদ্য প্রাণবান্ হয়ে উঠতে পারে, তা শেষোক্ত পুস্তকের রচনায় ভালো করেই প্রমাণিত হ'ল। নিচে এর কিয়দংশ উদ্ধৃত করা যাচ্ছে:—

> "মধ্যাহ্ন উপস্থিত। রবির প্রখর উত্তাপ। মাঠে গোপালেরা গোরু চরাইতেছে। হলের বেগে মৃত্তিকা ভেদ হইতেছে। গো সকল তৃষ্ণাতে আতুর। গোপাল লাঙ্গুল মুচড়াইরা লাঙ্গল চালাইতেছে। আপন লাভ জন্য পশুদিগের প্রতি মনুষ্য সর্ব্বদা দয়াহীন হইয়া থাকে। মাঠে ছায়া নাই, স্থানে স্থানে এক একটি বন্য বৃক্ষ। একদিকে একজন মেষ পালক কতকগুলি মেষ লইয়া যাইতেছে। একদিকে মহিষের পাল বেগে চলিয়াছে। নিকটস্থ দুই একটা ভগ্নবৃক্ষ হইতে কীট অথবা শস্য অম্বেষণার্থে পক্ষিরা এক একবার চুকবু চুকবু করিয়া ডাকিতেছে ও রাখাল বিশ্রাম জন্য মেঠো সুরে গান গাইতেছে। মাঠের উত্তরে একটি সরোবর—পার্শ্বে বকুল ও কদম্ব বৃক্ষ, তাহার ছায়ায় বসিয়া অম্বেষণচন্দ্র ভাবিতে লাগিলেন।"

উল্লিখিত স্থলটিতে স্বল্প কথায় প্যারীচাঁদ মধ্যাহ্ন প্রকৃতির যে চিত্র এঁকেছেন, তা এর আগের কোন লেখায় পাওয়া যাবে না। এমন কি

তৎপূর্বে প্রকাশিত বঙ্কিমের প্রথম উপন্যাসত্রয়েও ('দুর্গেশ নন্দিনী' ১৮৬৫ 'ক পা ল কু ণ্ড লা' ১৮৬৬ 'মৃণালিনী' ১৮৬৯) নয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে 'বঙ্গদর্শনে' (১৮৭২) ক্রমশ প্রকাশিত 'বি ষ বৃ ক্ষে' এ শ্রেণীর ভাষা ও বর্ণনা নিতান্ত সুলভ। শেষোক্ত উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র যে খাটি বাংলাশব্দ-বহুল গদ্য লিখেছেন তারও স্পষ্ট পূর্বাভাষ 'অভেদী'তে আছে। নিচে এ পুস্তকের ভাষার আরো কিছু নমুনা দেওয়া গেল :—

"জেঁকো বাবুর বাটির দালানে ব্রাহ্মণ ভোজন হইতেছে—"অরে দই নিয়ে আয়রে—সন্দেশ নিয়ে আয়রে" এই শব্দ হইতেছে। ব্রাহ্মণেরা প্রচুর ভোজন করিয়াছেন ও সরায় প্রচুর তুলিয়াছেন, এক্ষণে দই ও সন্দেশ মাখিয়া খাইবার হাপুস হুপুস শব্দে বাটি কম্পমান্ হইতেছে। জেঁকো বাবুর পত্নী সরলা ব্রত উদ্‌যাপন করণান্তর উপবাসী রহিয়াছেন। ব্রাহ্মণ ভোজন হইলে আহার করিবেন ইত্যবসরে জেঁকো বাবু ও বাবু সাহেব মস্ মস্ করিয়া আসিয়া উপস্থিত- ব্রাহ্মণ-দিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ড্যাম বেঙ্গালী ড্যাম বেঙ্গালী বলিয়া বৈঠকখানায় যাইয়া বসিলেন। জেঁকো বাবুর সর্ব্ববিষয়ে জাঁক—বিদ্যাবিষয়ে জাঁক—বংশবিষয়ে জাঁক—ধনবিষয়ে জাঁক—মানবিষয়ে জাঁক। সম্প্রতি বাটিতে ব্রাহ্মণভোজন দেখিয়া বাবু সাহেবকে বলিলেন—দেখ বন্ধু! এ সব কিছুই মানি না কিন্তু মান রক্ষার্থে অনেক অর্থ ব্যয় করিতে হয়। বাবু সাহেব বলিলেন তা বটে কিন্তু বিপরীত কার্য্য হইতেছে—ইংরাজেরা এমন রকমে চলে না, আর এক্ষণেও যদি তোমার স্ত্রী ব্রতনিয়ম হইতে ক্ষান্ত না হয়েন তবে আর তোমা হইতে কি হইল।"

'বিষবৃক্ষ' থেকে আরম্ভ ক'রে বঙ্কিম যে কয়খানি উপন্যাস লিখেছেন সে গুলিতে এ শ্রেণীর গদ্য খুবই সুলভ। তিনি যে এক্ষেত্রে প্যারীচাঁদের রচনারীতির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন তা সহজেই অনুমেয়। একথা মনে করলেই বাংলা গদ্যে এবং গদ্য সাহিত্যে প্যারীচাঁদের অসাধারণ প্রভাবের কথা সহজেই বোঝা যায়।

# ষোড়শ অধ্যায়

## (গ) ভূদেব মুখোপাধ্যায়

তত্ত্ববোধিনী যুগের দ্বিতীয় পর্বের অপর শ্রেষ্ঠ লেখক ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৫-১৮৯৪)। ভূদেবের প্রথম গদ্যগ্রন্থ 'বার্ণাকুলার লিটারেচর সোসাইটি' থেকে প্রকাশের জন্যে রচিত হয় (১৮৫১ ?)। এই বইখানি ছিল সুবিখ্যাত রুশ সম্রাট 'পিটর দি গ্রেট' এর ইংরেজী জীবনকাহিনী থেকে সংকলিত। রচনা সমাপ্তির পর এর পাণ্ডুলিপি উক্ত সোসাইটি থেকে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নিকট বিচারার্থ প্রেরিত হ'লে, কৃষ্ণ বন্দ্যো পুস্তকখানি প্রকাশযোগ্য ব'লে মত দিয়েছিলেন, কিন্তু বিদ্যাসাগর এ বিষয়ে বিরুদ্ধ মত পোষণ করায় ভূদেবের প্রথম পুস্তক অমুদ্রিতই রয়ে গেল। বিদ্যাসাগর যে কেন এ বইখানির প্রতি বিরূপ হয়েছিলেন তা নিশ্চিতরূপে জানা যায় না; তবে ভূদেবের প্রথম বইএর রচনারীতি হয়ত তাঁর শেষের দিকের বইগুলির মতোই বিদ্যাসাগরী রীতির চেয়ে বিভিন্ন ধরণের ছিল, এবং এই রীতি বৈষম্যের জন্যেই হয়ত বিদ্যাসাগর মহাশয় ভূদেবের প্রথম বইএর প্রকাশে আপত্তি করেছিলেন। কিন্তু ভূদেবের মতো উৎসাহী ও তেজস্বী ব্যক্তি তাতে নিরুদ্যম হবার লোক ছিলেন না; ১৮৫৫ সালে তিনি 'শিক্ষা বিধায়ক প্রস্তাব' নামে এক নাতিবৃহৎ গদ্য গ্রন্থ প্রকাশ করলেন। এ পুস্তকের ভাষায় দীর্ঘ সমাস এবং কঠিন সংস্কৃত কথা নেই বললেই হয়; আর এর বাক্য সমূহের আপেক্ষিক সরলতাও লক্ষ্য করবার বিষয়। নিচে এ গ্রন্থের আরম্ভ থেকে কিয়দংশ উদ্ধৃত করা গেল:—

"ছাত্রাণাম্ অধ্যয়নং তপঃ' অর্থাৎ বিদ্যাভ্যাসই বিদ্যার্থীদিগের প্রধান তপস্যা। যিনি এই কথার তাৎপর্য্য অবগত হইয়াছেন, তিনি কাহারও পক্ষে বিদ্যাশিক্ষা অপ্রয়োজনীয় বোধ করে না। তিনি জানেন, বিদ্যাভ্যাসের অন্য ফল আর যত হউক বা না হইক, তদ্দ্বারা মানসিক বৃত্তি সকলের অনেক সদ্‌গুণ জন্মে—তিনি জানেন যে, অধ্যয়নরূপ তপস্যা দ্বারা মনের চাঞ্চল্য দমন, ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, পরোক্ষিজ্ঞান, এবং পরিণাম দর্শন প্রভৃতি গুণ সকল অবশ্য কিঞ্চিন্মাত্রও বর্দ্ধিত হয়। ইহা

জানিয়া তিনি কোন ব্যক্তির বিদ্যাশিক্ষার প্রতিবন্ধক হয়েন না—অতি নিকৃষ্টবৃত্তি লোকদিগেরও কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ জ্ঞানযোগ থাকা প্রার্থনীয় বোধ করেন। এই জন্যই অস্মদ্দেশীয় কোন প্রধান পণ্ডিত কহিতেন, যদি কেহ সামান্য কৃষিকর্ম্মও করিতে যায়, তথাপি একরূপ ব্যাকরণ পড়িয়া যাওয়া ভাল।"

উল্লিখিত অংশটিকে 'অক্ষয়কুমার দত্তের 'ধর্ম্মনীতি', বা 'বাহ্যবস্তু ইত্যাদি'র-ভাষা ব'লে অনায়াসে চালানো যেতে পারে। সংস্কৃতানুগ হয়েও গদ্য কতদূর প্রাঞ্জল হতে পারে ভূদেবের রচনা তার অন্যতম দৃষ্টান্ত। তাঁর পরবর্তী প্রবন্ধাদিতে মূলত এরূপ ভাষাই অনুসৃত রয়েছে। কিন্তু এ ভাষা দেখে কেউ যেন মনে না করেন, ভূদেবের কাব্যগুণসম্পন্ন গদ্য রচনার ক্ষমতা ছিল না। কারণ ১৮৫৭ সালে তিনি '**ঐ তি হা সি ক উ প ন্যা স**' নামে যে গ্রন্থ প্রকাশ করেন তা এক বৈচিত্র্যময় গদ্যে রচিত। এ বইএর স্থানে স্থানে দুএকটি সুদীর্ঘ সমাস থাকলেও বিষয়বস্তু এবং কল্পনার অভিনবত্বের জন্যে এর ভাষা বিদ্যাসাগরের 'শকুন্তলা'দির ভাষা থেকে বহুল পরিমাণে পৃথক অথচ উপাদেয় হয়েছে। এ বই থেকেই বাংলা সাহিত্যিক গদ্যের যথার্থ নতুনত্ব শুরু হ'ল বলা যায়। এ পুস্তকের রচনারীতিকে সহজেই বঙ্কিমের গোড়ার দিকে উপন্যাসগুলিতে ব্যবহৃত রীতির পূর্বাভাষ ব'লে মনে করতে ইচ্ছা হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বইখানির আরম্ভের দিক থেকে কিঞ্চিৎ উদ্ধার করা গেল :—

"একদা কোন অশ্বারোহী পুরুষ গান্ধার দেশের নির্জ্জন বনে ভ্রমণ করিতেছিলেন। ক্রমে দিনকর গগনমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী হইয়া খরতর কিরণনিকর বিস্তার দ্বারা ভূতল উত্তপ্ত করিলে, পথিক অধ্বশ্রমে ক্লান্ত হইয়া অশ্বকে তরুণ তৃণ ভক্ষণার্থ রজ্জুমুক্ত করিয়া দিলেন এবং আপনি সমীপবর্ত্তী নির্ঝর তীরে উপবিষ্ট হইয়া চতুর্দ্দিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, স্থানটি ভয়ানক এবং অদ্ভুতরসের আস্পদ হইয়া আছে। নিবিড় বনপত্রে সূর্য্যকিরণ প্রায় সর্ব্বতোভাবেই আচ্ছাদিত; কেবল স্থানে স্থানে কিঞ্চিৎ প্রকাশমান মাত্র। বৃক্ষগণ অতি দীর্ঘ। কাহার কাহার গাত্রে একটিও শাখা

পল্লব না থাকাতে বোধ হয় যেন, উপরিস্থ পূর্ণচন্দ্রাতপ ধারণের স্তম্ভ হইয়া আছে। অদূরে বনহস্তিগণ সুশীতল ছায়াতলে সুষুপ্তি অনুভব করত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বনতরুর পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া আপনাদিগের অপেক্ষাকৃত খর্ব্বতা প্রমাণ করিতেছে। ফলতঃ বিধাতা নিভৃত নির্জ্জন কাননে, অথবা নির্গম গিরিশিখরেই সৃষ্টির পরম রমণীয় শোভা সমস্ত সংস্থাপিত করিয়া থাকেন। সেই মনুষ্য-সম্বন্ধ-বর্জ্জিত, নিঃশব্দ, শান্তরসাস্পদ স্থানে স্থানে নানা অদ্ভুত বস্তুর সন্দর্শন হওয়াতে মন অবশ্যই শ্রদ্ধা ও ঔদার্য্যগুণ অবলম্বন করিয়া সেই মহৈশ্বর্য্যশালী জগৎ কর্ত্তার সন্নিধানে নীত হয়।"

উল্লিখিত স্থলটি সংস্কৃতবাহুল্যে বিদ্যাসাগরী গদ্যের সঙ্গে তুলনীয়, কিন্তু এর বিষয়বস্তুতে বিশেষত উপসংহারটিতে, অক্ষয়কুমারের সুস্পষ্ট প্রভাব বিদ্যমান। 'বাহ্য বস্তু' এবং 'ধর্ম্মনীতি' থেকে ইতিপূর্বে যে দুটি অংশ উদ্ধৃত হয়েছে, তাতেও ঠিক এ ধরণের উপসংহার দেখা যায়। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখে দ্রষ্টার মনে প্রকৃতির মূলকারণ পরমেশ্বরের প্রতি ভক্তিভাবের উদ্রেক কল্পনা করা অক্ষয়কুমারের এক বিশেষত্ব। এই বিশেষত্ব এত প্রকট যে, এ নিয়ে রামগতি ন্যায়রত্ন তাঁকে একটু উপহাসও করেছেন। সে যাই হোক ভূদেবের উল্লিখিত রচনাংশ মাধুর্যগুণে বিদ্যাসাগরের বা অক্ষয়কুমারের গদ্যের বহু উপরে। এরূপ উৎকর্ষের কারণ এই যে, ভূদেব এখানে ইংরেজী রোম্যান্সে অনুসৃত পদ্ধতির ইঙ্গিত নিয়ে গদ্য লিখেছিলেন। তাই প্রচুর সংস্কৃতশব্দ ব্যবহার সত্ত্বেও তাঁর গদ্য গতিমান এবং জীবন্ত হয়ে উঠেছে। এতে সংস্কৃত পণ্ডিতদের মত উপমা অনুপ্রাসাদি ব্যবহার না করলেও, ভাষার গাম্ভীর্য ও সৌন্দর্য কিছু মাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নি। বঙ্কিমচন্দ্র এ ভাষাকেই আদর্শ করে তাঁর দুর্গেশনন্দিনী রচনায় হাত দিয়েছিলেন ব'লে অনুমান করা যেতে পারে।[১] উভয় লেখকের গদ্যবন্ধের সাদৃশ্যের সঙ্গে ভূদেব সম্বন্ধে

১। অক্ষয়চন্দ্র সরকার বলেন যে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য প্রণীত 'দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ'ই বঙ্কিমের ভাষার আদর্শ ('বঙ্গ ভাষার লেখক' পৃঃ ৫২৬); এ মত মোটেই নির্ভর যোগ্য নয়।

বঙ্কিমের প্রশংসাবাদের উদারতা লক্ষ্য করলেও এ অনুমান দৃঢ় হয় ১। এর অধিকতর পোষকতার জন্যে নিচে 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' থেকে আর একটি অংশও উদ্ধৃত করা যাচ্ছে :—

"রাত্রি উপস্থিত হইল। সুধাংশুমণ্ডলনিঃসৃত জ্যোৎস্নারাশি মন্দ মন্দ সমীরণে সঞ্চালিত মহীরুহগণ কর্ত্তৃক সহস্র সহস্র খণ্ডে বিদীর্ণ হইয়া নৃত্যকারী বনদেবতাগণের অলৌকিক অঙ্গপ্রভার ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল, এবং শুষ্কপত্র পতনের মর মর শব্দ, নির্ঝরের ঝর ঝর ধ্বনি ও রাত্রিচর পশুগণের গভীর নিনাদ সমুদয় মিলিত হওয়াতে বোধ হইল যেন জগদ্‌যন্ত্র বাদ্যের মধুর লয় সঙ্গতি হইতেছে এবং উহারই মোহিনী শক্তি প্রভাবে যাবতীয় জীব একেবারে সুপ্তশক্তি হইয়াছে।"

'ঐতিহাসিক উপন্যাস' থেকে উপরে উদ্ধৃত অংশটিতে ভূদেব যে মৌলিক সাহিত্যরস সৃষ্টি করেছেন তা বিদ্যাসাগরের বা তদনুগামী লেখকগণের রচনায় একান্ত দুর্লভ। অথচ অলঙ্কার প্রয়োগের কোন বাহুল্য এতে দেখা যায় না। গদ্য রচনার এরূপ স্বাভাবিক নৈপুণ্য সত্ত্বেও ভূদেব উপন্যাস রচনার দিকে গেলেন না; পরবর্তীকালে 'পুষ্পাঞ্জলি (১৮৭৫ ?) ছাড়া কোন উপন্যাস তাঁর হাত থেকে বেরোয় নি, কিন্তু এই শেষোক্ত গ্রন্থ তেমন উপাদেয় মনে হয় না; তবু এর ভাষা ভূদেবের লেখনীর অযোগ্য একান্ত নয়। নিচে এ বই থেকে কিয়দংশ উদ্ধৃত হ'ল :—

---

১। ভূদেব সম্বন্ধে 'ক্যালকাটা রিবিউতে' প্রকাশিত বেনামী প্রবন্ধে বঙ্কিম বলেন :—"One of the best masters of a pure and vigorous Bengali style—neither characterized by the somewhat pedantic purity of Vidyasagar nor rough and homely like Tekchand and Hutom – one of the best masters, we say, of Bengali style is Babu Bhudev Mukherji. He has, unfortunately, written little, except works of a technical character, but his little volume of historical tales······is enough to show that he might have done a great deal more than he actually has done".

কুরুক্ষেত্র কি শান্তরসাস্পদ স্থান! এখানে কুরুপাণ্ডব হিন্দু মুসলমান, শত্রু মিত্র, সকলেই এক শয্যায় শয়ান হইয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছে। কোন বিবাদ বিসম্বাদ বা বৈরিতার নামগন্ধও নাই। ভয়, বিদ্বেষ, ঈর্ষ্যাদি ভাব একেবারে বিসর্জ্জিত হইয়া গিয়াছে। ইহা সাক্ষাৎ শান্তি নিকেতন! ঐ যে অরবিন্দ নিচয় একই দিবাকরের করস্পর্শে হাস্য করিতেছে, উহারা পুরাতন বীর পুরুষদিগের হৃদয় পদ্ম; ঐ কলহংসমণ্ডলী, উহারা প্রাচীন কবিকুল—এক তানস্বরে বীরগণের গুণগরিমা গান করিতেছে।"

এ পুস্তকের গদ্যও ভূদেবের 'ঐতিহাসিক উপন্যাসে'র গদ্যের মতো সুন্দর ও প্রাণবান্। কিন্তু তিনি গল্প উপন্যাস রচনার দিক ছেড়ে প্রবন্ধ রচনার দিকে গেলে উপন্যাস-সাহিত্য যে পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, ভূদেব সে ক্ষতির পূরণ ক'রে, বাংলাদেশকে লাভবান্ করেছেন তাঁর সুচিন্তিত ও সারগর্ভ প্রবন্ধাবলির দ্বারা। কিন্তু এদের বিষয়বস্তুর আলোচনা এ ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক। তাঁর গদ্যরীতির উৎকর্ষাপকর্ষই ঐ স্থানে বিবেচ্য। সেই রীতির দিক দিয়ে বিচার করলেও তাঁর প্রবন্ধাবলি বাংলা সাহিত্যের প্রশংসনীয় সম্পৎ।

তাঁর প্রবন্ধাবলির অধিকাংশেরই রচনার তারিখ পাওয়া যায় না। মনে হয় এগুলি তাঁর পরিণত বয়সের রচনা। কিন্তু তাঁর এই প্রবন্ধের ভাষা বিবিধ বিদ্যালয় পাঠ্য ঐতিহাসিক পুস্তকের (এবং সম্ভবত 'এডুকেশন গেজেট' সম্পাদনের) মধ্য দিয়ে বিকাশ লাভ করেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁর লিখিত 'ইং ল ণ্ডে র ই তি হা স' থেকে কিয়দংশ নিচে উদ্ধৃত করা গেল:—

'যে সময়ের কথা হইতেছে সেই সময়ে ইংলণ্ড দ্বীপের নাম বৃটেন ছিল এবং তদ্দেশবাসীদিগকে বৃটেন বলিত। সীজর ও অপরাপর রোমক গ্রন্থকারেরা লিখিয়া গিয়াছেন যে তখন বৃটেনদ্বীপ নিবিড় অরণ্যে আচ্ছন্ন ছিল এবং তথাকার লোকসকল অত্যন্ত অসভ্য ছিল। তাহারা বৃক্ষের ত্বক বা বন্য পশুর চর্ম্মদ্বারা যথাকথঞ্চিৎ রূপে আপনাদিগের শরীর অবরণ করিত; গাত্রে রক্ত, কৃষ্ণ, পীত, হরিতাদি

বর্ণবিলেপ করিয়া সংগ্রামস্থানে ঘোররূপ ধারণ করিবার নিমিত্ত প্রয়াস পাইত, এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাষ্ঠ খণ্ড চর্ম্মাবৃত করিয়া সরিৎ ও জলাকীর্ণ ভূমি সমস্ত উত্তীর্ণ হইবার উপযোগী ভেলক প্রস্তুত করিত। বস্তুতঃ কৃষি ও বাণিজ্য দ্বারা যে সকল প্রয়োজনীয় ও সুখোপভাগের সামগ্রী প্রস্তুত এবং সমাহৃত হয় বৃটেনদিগের মধ্যে তাহার কিছু ছিল না।"

উদ্ধৃতাংশটির রচনায় বিশেষ কোন সাহিত্যিক গুণ নেই; এমনকি এতে দুএকটি ছোট খাটো ত্রুটিও আছে, তবু এ রচনা বিশেষ নিন্দনীয় নয়। খুব সম্ভব ইংরাজীগ্রন্থ দৃষ্টে ত্বরিত গতিতে সংকলিত ব'লেই এ পুস্তকে ভূদেবের স্বাভাবিক রচনারীতির স্ফূর্তি হয় নি। কারণ তাঁর 'বাঙ্গালার ইতিহাস' তৃতীয় ভাগে (১৮৬৫) যে গদ্য তিনি লিখেছেন তা বিশেষ অলংকৃত না হলেও সরলতার জন্যে প্রশংসনীয়; এর কিয়দংশ উদ্ধার করা হ'ল:—

"কিন্তু আর একটি সভাও ঐ সময়ে সংস্থাপিত হয়। ইহা উদারতর অভিপ্রায়ে প্রবর্ত্তিত হইযাছিল সুতরাং উহার ফল অধিকতর কালব্যাপি হইয়াছে। এই সভার উদ্দেশ্য সনাতন বৈদিক ধর্ম্মের সংস্থাপন—ইহার নাম তত্ত্ববোধিনী সভা। এই সভা সর্ব্বতোভাবে রাজকীয় কার্য্য বিষয়ে সম্পর্কশূন্য থাকিযা জাতীয় ভাষা এবং ধর্ম্ম প্রণালীর উৎকর্ষ সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। সুতরাং যেমন দূরদর্শিতা সহকারে এই সভার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল, ইহার শুভফল তেমন দূরতর পরবর্ত্তি পুরুষগণের ভোগ্য হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। যে নদী উচ্চতর পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে নির্গত হয় তাহার প্রবাহও তেমনি দূরগামী হইয়া থাকে।"

'বাঙ্গালার ইতিহাসে'র প্রায় দশবৎসর পরে রচিত 'স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস' (১৮৭৫) ও এরই মতো অনলঙ্কৃত এবং প্রাঞ্জল। নিচে এ পুস্তকের কিয়দংশ দৃষ্টান্ত স্বরূপে দেওয়া হ'ল:—

"তখন মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতির চৈতন্য হইল। তিনি বুঝিলেন যে, জাতিভেদে যেমন অন্যান্য বিষয়ের প্রভেদ হয়, তেমনি যুদ্ধ প্রণালীও ভিন্ন হইয়া থাকে। যে যাহার আপনার অভ্যস্ত প্রণালী অবলম্বন

করিয়াই বিজয়ী হইতে পারে, অন্যথা করিলে পরাজিত হয়। যেমন চকিতের ন্যায় এই ভাব তাঁহার মন মধ্যে উদিত হইল, অমনি তিনি সেনানায়কগণকে সম্মুখে সংগ্রাম হইতে অপসৃত হইয়া শত্রুর পার্শ্ব ভাগ আক্রমণ করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। মহারাষ্ট্রীয়েরা তাঁহার অনুজ্ঞার সমগ্র তাৎপর্য্যই বুঝিল, ক্ষণমাত্রে আপনাদিগের ব্যূহের রূপান্তর করিল এবং দেখিতে দেখিতে সেই প্রভূত সেনারাশি অর্দ্ধচন্দ্রের আকার হইয়া দাঁড়াইল।"

'স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস' থেকে উদ্ধৃত অংশটির ভাষা বেশ সহজবোধ্য হলেও এর বাঁধুনি সংস্কৃতবহুল। তিনি 'বি বি ধ প্র ব ন্ধ' ১ম ভাগেও (১৮৮০-১৮৮৭) এ জাতীয় গদ্যই ব্যবহার করেছেন, কিন্তু খুব সম্ভব তার পরে রচিত 'বি বি ধ প্র ব ন্ধ' ২য় ভাগ (১৮৯০), 'সা মা জি ক প্র ব ন্ধ' (১৮৯২), 'পা রি বা রি ক প্র ব ন্ধ' (১৮৯৪), 'আ চা র প্র ব ন্ধ' (১৮৯৪) আদিতে তিনি প্রয়োজনবোধে স্থানে স্থানে সংস্কৃতবাহুল্য একটু শিথিল করতে ইতস্তত করেন নি। এ বিষয়ে গোঁড়া বিদ্যাসাগরপন্থীদের চেয়ে তিনি উদার ছিলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁর 'বিবিধপ্রবন্ধ' ২য় ভাগ থেকে কিয়দংশ নিচে উদ্ধার করা গেল :—

"কৃতবিদ্য" বাঙ্গালীদিগের চলন বলন, হাস্যপরিহাস, শব্দোচ্চারণ মুদ্রা, ব্যবহার সকলেই একটু একটু ইংরেজী গন্ধ পাওয়া যায়। একজন সেকেলে হিন্দু বা মুসলমান তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে তুমি দেখিবে তিনি যত বড় লোকই হউন না কেন ধীরে ধীরে চলিয়া আসিবেন, মুখে হাস্যের একটু মৃদু প্রভামাত্র দেখা দিবে এবং আসন পরিগ্রহ করিয়া তিনি অল্পে অল্পে কোমলস্বরে তোমার সহিত বাক্যালাপ করিবেন। কিন্তু যখন ইংরাজীওয়ালা আসিতেছেন, তখন সিঁড়িতে উঠিবার সময় দম্ দম্ শব্দ হইবে। জুতা মস্ মস্ করিয়া ডাকিবে, ঝণাৎ করিয়া কবাটের শব্দ হইবে। দর্শনমাত্রে অট্টহাস্যের হো হো রব পড়িবে, ঘড়্ ঘড়্ শব্দে চেয়ার সরিবে। অন্তঃপুরবাসিনীরা পর্য্যন্ত জানিতে পারিবেন বাটিতে একজন মানুষ আসিয়াছেন বটে।"

উল্লিখিত স্থলের চেয়েও সংস্কৃতবাহুল্যহীন রচনা ভূদেবের প্রবন্ধাবলিতে পাওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁর 'সামাজিক প্রবন্ধ' থেকে কিয়দংশ নিচে দেওয়া হ'ল :—

"অতি বালককালে একবার শিকারী পাখীর শিকার শিক্ষা দেখিয়াছিলাম। একজন পাখীটিকে হাতের উপর করিয়া লইয়া যাইতেছিল এবং এদিকে ওদিকে চাহিয়া দেখিতেছিল। আমাদের একটি টিয়া পাখি সেইমাত্র পলাইয়া নিকটবর্ত্তী নিমগাছের ডালে বসিয়াছিল। আমি তাহার প্রতি স্থিরদৃষ্টি হইয়া ছিলাম। যে ব্যক্তির হাতে শিকরে বসিয়াছিল সে বোধ হয় আমার দৃষ্টির অনুসারে দৃষ্টিপাত করিয়া টিয়াটিকে দেখিল এবং তাহার শিকরেকে ছাড়িল। তীরবেগে শিকরে গিয়া টিয়ার উপরে পড়িল। আমি চীৎকার করিয়া উঠিলাম। শিকারী বুঝিতে পারিল যে টিয়াটি পোষা। সে একটি শীষ দিল, শিকরে অমনি টিয়াকে ছাড়িয়া তাহার হাতের উপর আসিয়া চঞ্চুপুট দিয়া আপনার পক্ষকুট্টন করিতে লাগিল—কে বলিবে যে এই শিকরে সেই শিকরে।"

প্রয়োজনবোধে কচিৎ সংস্কৃতের সঙ্গে বাংলা শব্দ (তদ্ভব এবং দেশী ইত্যাদি) ব্যবহার করলেও, ভূদেবের রচনা সাধারণভাবে সংস্কৃতবহুলই ছিল, কিন্তু এ সত্ত্বেও তাঁর গদ্য কখনো শব্দাড়ম্বরপূর্ণ বা অযথা গম্ভীর হয়ে ওঠে নি। এ দুর্লভ গুণের জন্যে তাঁর সুচিন্তিত প্রবন্ধাবলি বহুকাল পাঠকবর্গের সমাদর লাভ করবে এরূপ আশা করা যায়। নিচে ভূদেবের শেষের দিককার ভাষার একটি নিদর্শন তাঁর 'সামাজিক প্রবন্ধ' (১৮৯২) থেকে উদ্ধৃত করা গেল :—

"বস্তুতঃ মনুষ্যের ক্রমোন্নতির নিয়ম যাহা আছে তাহার পথ একমাত্র মনস্তত্ত্ব বিচারের দ্বারাই আবিষ্কৃত হইতে পারে। মনুষ্য অনেকগুলি সমপ্রকৃতিক বস্তু দেখিয়া তাহাদিগের সকলগুলির গুণবিশিষ্ট এবং সকলগুলির দোষবিরহিত একটি চিত্তাদর্শ মনে মনে প্রস্তুত করিতে পারেন। শুদ্ধ মনে মনে প্রস্তুত করিতে পারেন এমত নহে। সেই চিত্তাদর্শের প্রতি তৎস্রষ্টা মনুষ্যের প্রীতিও জন্মে,

আর সেই প্রীতিও বহুকাল বন্ধ্যা থাকে না, প্রায়ই সে চিত্তাদর্শের অনুরূপ বাহ্য ব্যাপারের জননী হয়। বিভিন্ন ব্যক্তি বিনির্ম্মিত ঐরূপ অনেকগুলি চিত্তাদর্শ প্রত্যক্ষীভূত হইলে আবার তাঁহাদিগের প্রত্যেকের হইতে উৎকৃষ্টতর একটি চিত্তাদর্শ জন্মে। সেইরূপ আদর্শের অনুরূপ সৃষ্টি হইয়া গেলে, তদপেক্ষাও উৎকৃষ্টতর আদর্শ জন্মিয়া যায়। এইরূপ বহুকাল ধরিয়া চলিতে পারে এবং তাহা চলিলেই ক্রমোৎকর্ষের পথ উন্মুক্ত থাকে। কিন্তু এই কথার একটি প্রতিবাদ আছে। মানুষের উৎকর্ষবোধটী সকল সময়ে একরূপ থাকে না। সুতরাং অবস্থাভেদে চিত্তাদর্শের প্রকৃতি ভিন্ন হইয়া যায়, এবং যাহা প্রকৃত-প্রস্তাবে উৎকৃষ্ট তাহাকেও উৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ না হইয়া অপেক্ষাকৃত অপকৃষ্ট বলিয়া বোধ হয়। এই বিপদ হইতে রক্ষার কোন সমীচীন উপায় নাই। তবে যাহা যাহা পূর্ব্বাগত তাহার প্রতি দৃঢ়ভক্তি এবং যাহা অভিনব তাহাকে সেই পূর্ব্বাগতের সহিত ঘনিষ্ঠরূপে তুলনা করিয়া দেখিলে, চিত্তাদর্শের হঠাৎকারে অপকর্ষ জন্মিতে পারে না।

* * * *

তবে কি প্রাচীন আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চলিলে মনুষ্যের উন্নতির পথ মুক্ত থাকে? তাহাও নয়। প্রাচীন আদর্শ অবিবেচনাপূর্ব্বক অথবা অনুকৃতি পরবশ হইয়া পরিত্যাগ করিলেই দোষ। যদি কোন নূতন ভাব আইসে তাহা ঐ প্রাচীনের সহিত মিলাইয়া দেখিতে হয়। যদি ঐ ভাব তাহাতে সম্মিলিত করিলে পূর্ব্ব চিত্তাদর্শের জ্ঞানচক্ষে ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি হয় তবেই তাহাকে গ্রহণ করিতে হয়, নচেৎ উহাকে গ্রহণ করিতে হয় না।"

উল্লিখিত স্থলে ভূদেব জাতীয় জীবনে নূতন আদর্শ গ্রহণের প্রণালী সম্বন্ধে যে চমৎকার অভিমত দিয়েছেন, তাঁর নিজস্ব গদ্যরীতির গুণে তা যথাসম্ভব সহজবোধ্য ও হৃদয়গ্রাহী হয়েছে। একদিকে প্রাচীনের প্রতি অন্ধ আনুগত্য, অপরদিকে উদ্দাম নবীনত্বপ্রয়াস এ উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য আদর্শের যে অপরিহার্য প্রয়োজন, তা ভূদেবের লেখায় বেশ স্বাভাবিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এহেন রচনার গুণেই বাঙালী পাঠক বহুকাল যাবৎ ভূদেবকে তত্ত্ববোধিনী যুগের গদ্য লেখকদের মধ্যে এক শ্রেষ্ঠ আসন দান করতে বাধ্য হবে।

# সপ্তদশ অধ্যায়

## ওয়েঙ্গার, লঙ্‌ ও অপর খ্রীষ্টান লেখকগণ

রামমোহন যুগে নানা বাঙালী লেখকের সঙ্গে কেরী, মার্শমান, ফিলিক্স কেরী, পিয়ার্স, ইয়েটস্ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বৈদেশিকগণও যে, বিদ্যালয়পাঠ্য ও অন্যান্য পুস্তক লিখে বাংলা গদ্যের সংস্কারে সাহায্য করেছিলেন, তা যথাস্থানে উল্লিখিত হয়েছে; কিন্তু যতই এদেশীয় লেখকেরা বহুসংখ্যায় গদ্য রচনায় হাত দিলেন, স্বাভাবিক কারণে এ ক্ষেত্রে বিদেশীয়দের প্রচেষ্টা ও প্রভাব ততই সীমাবদ্ধ হয়ে প'ড়ল। সাধারণ শিক্ষাবিস্তারের জন্যে পুস্তক রচনা ছেড়ে তাঁরা ক্রমশ ধর্ম প্রচারে ব্যাপৃত রইলেন। তখন তাঁদের হাত থেকে কেবল প্রচারমূলক লেখাই বেরুতে লাগল। এরূপভাবে বাংলা গদ্যের উপর তাঁদের প্রভাব ক্রমশ এত ক'মে গেল যে, তত্ত্ববোধিনীর যুগে সে জিনিষ আর বড় একটা রইল না। তবু এ প্রসঙ্গে ওয়েঙ্গার (John Wenger ১৮১১-১৮৮০) সম্পাদিত 'উপদেশক' পত্রিকাখানিকে স্মরণ না ক'রলে হয় ত ভুল থেকে যেতে পারে। কেবল দেশীয় খ্রীষ্টান মণ্ডলীর জন্যে রচিত এ মাসিক কাগজ খানি, নিতান্ত পরোক্ষভাবে হলেও হয়ত বাংলা গদ্যকে সরলতর করবার একটু সাহায্য করে থাকবে। লেখার ভাষা যে খুব সহজবোধ্য হওয়া দরকার একথা খ্রীষ্টান মিশনারীদেরই হয়ত সর্বাগ্রে বিশেষরূপে ভাবতে হয়েছিল; কারণ গদ্য তাঁদের নিকট মুখ্যত ছিল ধর্ম প্রচারের উপায়। তাই এ গদ্যকে তাঁরা আপামর সাধারণের নিকট সুখবোধ্য করবার কথা ভাবতে বাধ্য ছিলেন। ধর্মোপদেশের ভাষা কেমন হওয়া উচিত, এ সম্বন্ধে 'উপদেশকে' প্রকাশিত (১৮৪৮) একটি প্রবন্ধের কিয়দংশ নিচে তুলে দেওয়া গেল :—

"তাহার ভাষা যেন স্পষ্ট অর্থাৎ শ্রোতৃবর্গের বোধগম্য হয়, ইহাতে বিশেষরূপে যত্ন করা তাহার উচিত, যেহেতুক তাহার বক্তৃত্ব যেন প্রকাশ পায়, তাহা উপদেশের অভিপ্রায় নহে, কিন্তু শ্রোতাসকল যেন ধর্ম্মজ্ঞান লাভ করে, ইহাই উপদেশের অভিপ্রায়।

এবং তাহার ভাষা যেন অশুদ্ধ না হয়। ইহাতেও মনোযোগ করিবে। যে সকল শব্দ কেবল অতি নীচ লোকদের মধ্যে চলিত হওয়াতে তুচ্ছনীয় বোধ হয়, সেই সকল শব্দ ব্যবহার করিলে শ্রোতারা তাহাকে অজ্ঞান কিম্বা অলস জানিয়া তুচ্ছ করিবে। যদি কোনক্রমে এমন ঘটে যে অতি নীচ শব্দ বিনা শুদ্ধ শব্দ শ্রোতাদের বোধগম্য হয় না, তবে অবশ্য সেই নীচ কথা ব্যবহার্য্য হইবে।"

উদ্ধৃতাংশের গদ্য তৎকাল প্রচলিত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ভাষার চেয়ে একটু কটমট মনে হলেও, এর এক গুণ এই যে এতে বক্তব্য বিষয়টি বেশ পরিস্ফুট হয়েছে। কিন্তু উল্লিখিত স্থলটিতে ভাষা আলোচ্য নয়, আলোচ্য এর বিষয়বস্তু। উপদেশের ভাষা সম্বন্ধে যে পদ্ধতি কল্পিত হয়েছে তা যে যথাযথভাবে 'উপদেশকে'র প্রবন্ধগুলিতেও অনুসৃত হয়েছে একথা বলাই বাহুল্য। এই রীতির সম্বন্ধে আর একটি নির্দেশ পাওয়া যায় ১৮৪৯ সালে প্রকাশিত একটি বিজ্ঞাপনে। কোন প্রবন্ধ রচনার জন্যে পারিতোষিক ঘোষণা ক'রতে গিয়ে বিজ্ঞাপন দাতার (=কোন খ্রীষ্টান মিশনারীর) পক্ষ থেকে লেখা হয়েছে যে,—

"রচনার পরিমাণের সীমা নিরূপণ করণ অনাবশ্যক যেহেতুক অনর্থক শব্দাড়ম্বর করিয়া রচনা বিস্তীর্ণ করণাপেক্ষা সার্থক বাহুল্যতা ও রচনার সংক্ষিপ্ততা উৎকৃষ্ট।"

'উপদেশকে' প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি প্রায়শ এই নীতি অনুসরণ করেই লেখা হ'ত। দৃষ্টান্তস্বরূপ ১৮৪৭ সালে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধের কিয়দংশ নিচে উদ্ধৃত হ'ল :—

"যে রাত্রিতে প্রভু যীশুখ্রীষ্ট আমাদের নিমিত্তে মৃত্যুভোগ করণার্থে শত্রুগণের হস্তে [ আত্ম ] সমর্পণ করিতে উদ্যত ছিলেন, সেই রাত্রিতে তিনি অগ্রে আপন শিষ্যদিগকে সান্ত্বনা দিতে আবশ্যক বুঝিয়া তাঁহাদের সহিত অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কথাবার্ত্তা কহিয়া তাঁহাদের মনকে সুস্থির করিতে চেষ্টা করিলেন। তৎকালে তাঁহারা অতিশয় শোকার্ত্ত ছিলেন যেহেতুক যিনি আমাদের অতি প্রিয় গুরু তিনি আমাদের হইতে নীত হইবেন, এবং তাঁহাকে অত্যন্ত ক্লেশ ও অপমান ভোগ

করিতে ও হত হইতে হইবে; এবং যদ্যপি তিনি শেষেতে সকল দুঃখ উত্তীর্ণ হইয়া স্বর্গেতে যাইবেন, তথাপি এমন অপূর্ব্ব বন্ধুর বিচ্ছেদে আমাদের মন তখনও শোকান্বিত থাকিবে; কারণ তাঁহার তুল্য বন্ধু আর কোথায় পাইব? আমরা দুর্ব্বল, তিনি আমাদের নিকটে না থাকিলে কে আমাদিগকে ধর্ম্মপথ দেখাইবে ও পাপ হইতে রক্ষা করিবে ও পরীক্ষার সময়ে শয়তানের ছল হইতে উদ্ধার করিবে। এই প্রকার চিন্তা তাঁহাদের মনেতে উপস্থিত হইতে লাগিল।"

উল্লিখিতাংশের ভাষার সামান্য ত্রুটি থাকলেও এর প্রাঞ্জলতা বেশ প্রশংসনীয়। কিন্তু এর চেয়েও প্রশংসার যোগ্য প্রবন্ধ 'উপদেশকে' মাঝে মাঝে প্রকাশিত হয়েছে। ১৮৪৭ সালে **সুজাত আলী** ( = সুজা আৎ আলী ) নামক শ্রীরামপুরের কোন দেশীয় খ্রীষ্টান, 'ত্রাণকর্ত্তার খেদোক্তি' নামক যে প্রবন্ধ লিখেছিলেন তা এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এ রচনা বেশ প্রাঞ্জল ও সাহিত্যিক গুণসম্পন্ন। নিচে এর কিয়দংশ দেওয়া হ'ল—

"হে প্রিয় পাঠকগণ, যে প্রভু তোমাদের মনোরূপ দ্বারে আঘাত করিতেছেন, তোমরা কি তাঁহার প্রতি দ্বার খুলিবা না? কোন ব্যক্তি আপন মিত্রকে বৃষ্টিতে ও ঝড়েতে কিম্বা শিশিরে ও শীতে কিম্বা সূর্য্যোত্তাপে দ্বারে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিলে কি তাহার বিষয়ে অমনোযোগ কিম্বা তাহাকে অগ্রাহ্য করে? হে প্রিয় বন্ধুগণ তোমাদের জন্যে যিনি স্বর্গ হইতে নামিয়া ক্রুশে হত হইয়া কবরে নিক্ষিপ্ত হইলেন, এমন যীশু অপেক্ষা তোমাদিগকে অধিক প্রেম করে এরূপ মিত্র কে? অতএব তোমরা অহঙ্কার ও আত্মশ্লাঘারূপ চাতাল হইতে নামিয়া, কিম্বা শারীরিক আনন্দ ও সাংসারিক সুখরূপ শয্যা যইতে গাত্রোত্থান করিয়া, এমন পরম বন্ধুর অর্থাৎ খ্রীষ্টের জন্যে কি দ্বার মুক্ত করিবা না?"

১৮৪৭ সালের শেষের দিকে প্রকাশিত দু'একটি প্রবন্ধও উদ্ধৃত প্রবন্ধাংশটির সঙ্গে তুলনীয়। নিচে এরূপ একটি প্রবন্ধের কিয়দংশ উদ্ধার করা হ'ল :—

"হে আমার ভ্রাতৃগণ, শেষ কথা এই, তোমরা প্রভুর উপরে নির্ভর দিয়া তাঁহার বলে বলবান হও। শয়তানের নানাবিধ খলতা নিবারণ করিতে সক্ষম হইবার জন্যে ঈশ্বরদত্ত সজ্জাতে আপনাদের সুসজ্জা কর। কেননা আমরা কেবল রক্তমাংসবিশিষ্টদিগের সহিত যুদ্ধ না করিয়া এই সংসার সম্বন্ধীয় অন্ধকারের প্রধান ও পরাক্রমি জগৎপতিদের অর্থাৎ আকাশস্থ পাপাত্মাদের সঙ্গে সংগ্রাম করিতেছি। অতএব দুঃসময়ে যেন তাহাদের আক্রমণ নিবারণপূর্ব্বক সকলকে জয় করিয়া অটল হইয়া থাকিতে পার, এতন্নিমিত্তে ঈশ্বরদত্ত তাবৎ সজ্জাতে সজ্জীভূত হও। ফলতঃ সত্যতারূপ কটিবন্ধনীতে কটি বন্ধন করিয়া, পুণ্যরূপ বুকপাট্টা বক্ষে দিয়া, শান্তিদায়ক সুসমাচারূপ আবরক পাদুকা পদে অর্পণ করিয়া অটল হইয়া থাক।"

উল্লিখিত প্রবন্ধগুলির ভাষা কিয়ৎপরিমাণে প্রশংসার যোগ্য হলেও 'উপদেশকে'র ভাষায় সাধারণত সরলতা ছাড়া অন্য গুণ প্রায়শ দুর্লভ ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপে ১৮৪৮এর কাগজে প্রকাশিত এ দেশীয় ব্যাপটিষ্ট মিশনের ইতিহাস থেকে কিয়দংশ নিচে উদ্ধৃত হ'ল :—

"* * * কিন্তু অবশেষে যে ঈশ্বর তাহাদের মনে এই সকল ঘটনা করিয়াছিলেন তিনি তাহাদের পথ খোলসা করিলে, ও অনেক কষ্টভোগের পরে একজনকে মদনাবাটী বলিয়া ও অন্যজনকে মইপালদিগী বলিয়া স্থানে বসাইলেন। এই দুই স্থান দিনাজপুরের নিকটবর্ত্তি। এই দুই স্থানও তাহার চতুর্দ্দিগস্থ সকল গ্রামে এই কৃষক বহুদিন অতিবাদ পরিশ্রম করিলেন ও উপদেশের দ্বারা সকলকে শিক্ষা দিলেন। এইকালে তোমরা জানিবা বাঙ্গালি ভাষাতে কোন ছাপা পুস্তক কিম্বা ট্রাক্‌ট ছিল না। তাহারা দুই এক পাঠশালাও বসাইলেন। তাহাদের এই সময়ে আর এক দুঃখের বিষয় ছিল তাহারা নিজে ভালমতে বাঙ্গালা ভাষা জানিল না; তাহা শিক্ষা করা কঠিন ছিল, কেন না পাঠের প্রায় কোন পুস্তক ছিল না,..."

কিন্তু উল্লিখিত অংশের ভাষা যেরূপই হোক না কেন 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' থেকে সাধারণ বাংলাগদ্যর উপর যে প্রভাব পড়ছিল খ্রীষ্টান

সম্প্রদায়ের চালিত পত্রিকার উপরর ধীরে ধীরে তা বিস্তৃত হয়েছিল। ১৮৫২ সালের 'উপদেশক' থেকে নিম্নোদ্ধৃত রচনাংশই একথার প্রমাণ ব'লে গৃহীত হতে পারে।

"পরমেশ্বরের শক্তি অতি অদ্ভুত ও তাঁহার সংকল্প অতি চমৎকার, ফলতঃ তাঁহার সংকল্প মনুষ্যের সংকল্প সদৃশ নয়, তাঁহার কার্য্য-সাধনের রীতি মনুষ্যের ধারার ন্যায় নয়। মনুষ্য অতি আড়ম্বর পূর্ব্বক কার্য্যারম্ভ করিয়াও তাহা নিষ্পাদন করিতে পারে না, কিন্তু ঈশ্বর ইচ্ছামাত্রে অদ্ভুত কার্য্যসাধন করেন। দেখ তিনি আজ্ঞামাত্রে অনন্ত হইতে এই বিচিত্র বিশাল সংসার সৃষ্টি করিলেন, এবং মৃতকল্প ইব্রাহীম হইতে গগনস্থ নক্ষত্র সদৃশ অগণ্য লোক উৎপন্ন করিলেন। তাহা কেবল নয়, তিনি কতিপয় দীন হীন মৎস্যধারিকে মনুষ্যধারী করিয়া তাহাদের দ্বারা জগদ্‌ব্যাপি অনন্তকালস্থায়ি ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন করাইলেন। কোন কার্য্যে তাঁহার সংকল্প হইলে তাঁহার শক্তি দ্বারা তাহা অবাধে সিদ্ধ হয়।"

বাংলা গদ্যের উপকার করেছেন, এমন বিদেশী খ্রীষ্টান লেখকদের মধ্যে ওয়েঙ্গারের পরেই লঙ্ (Rev. J. Long) মহাশয়ের নাম। তাঁর সম্পাদিত 'সত্যার্ণব' পত্রিকা ১৮৫০ সাল থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। এর ভাষা পূর্বোল্লিখিত 'উপদেশ' পত্রিকার ভাষার চেয়ে পরিমার্জিত ও সংস্কৃত-ঘেঁষা। নিচে এর প্রথমসংখ্যার ভূমিকা থেকে রচনা পদ্ধতির নমুনাস্বরূপে কিছু অংশ তুলে দেওয়া গেল :—

"এক্ষণে গৌড়ীয় ভাষায় নানা প্রকার সমাচার-পত্র মুদ্রাযন্ত্র দ্বারা প্রকাশ হইয়া থাকে। প্রাত্যহিক, সাপ্তাহিক পাক্ষিক মাসিক এবম্প্রকার বিবিধ পত্রে বিবিধ বিষয়ের বর্ণনা এবং বিবিধ পোষকতা হইতেছে। * * * * গৌড়ীয় ভাষার গুণগ্রাহি পাঠকেরা এ সকল পত্র পাঠে যথেষ্ট সন্তৃপ্ত হয়েন অতএব পত্রান্তরের অপেক্ষা নাই এমত জ্ঞান করা যাইতে পারে। কিন্তু উক্ত পত্রের সম্পাদকেরা প্রায় সকলেই খ্রীষ্ট ধর্ম্মের বিপক্ষ, তাঁহারা সুযোগ পাইলেই খ্রীষ্ট বিরুদ্ধে রণ করিতে সসজ্জ হয়েন এবং শরক্ষেপ কালে মনের

মধ্যে বিজিগীষা ভাব অত্যন্ত প্রবল হওয়াতে সত্যাসত্যের প্রভেদ করেন না, * * *।

একারণ আমরা সঙ্কল্প করিলাম যে অদ্যাবধি মাসে ২ 'সত্যার্ণব' নামে এক পত্রিকা প্রকাশ করিব।

সংস্কৃতঘেঁষা হলেও 'সত্যার্ণব' পত্রিকার রচনারীতি 'বিবিধার্থ সংগ্রহের' চেয়ে নিন্দনীয় ছিল না। মনে হয় এ পত্রিকার সম্পাদনে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের কিছু হাত ছিল এর লেখকমণ্ডলীতে অন্তত একজন পণ্ডিতকে পাওয়া যায়। ইনি ছিলেন **হরিশ্চন্দ্র তর্কালঙ্কার**। এঁর 'মহারাজ প্রতাপাদিত্য চরিত্র' ১৮৫৩ সালে সত্যার্ণব' পত্রিকায় ক্রমশ প্রকাশিত হয়েছিল।[১] গদ্যরীতির দিক দিয়ে এ পত্রিকা নিন্দনীয় না হলেও সাম্প্রদায়িক কাগজ ব'লে, এর প্রভাব তেমন গভীর ছিল মনে হয় না। তবু বাংলা গদ্যে খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের দাম হিসাবে একে উপেক্ষা করা অনুচিত হবে।

১। এ প্রবন্ধ রামরাম বসু কৃত 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' নামক গ্রন্থের সরলতর পুনর্লিখিত (rewritten রূপ মাত্র।

# অষ্টাদশ অধ্যায়

## বঙ্কিমচন্দ্র—প্রথম তিনখানি উপন্যাস (১৮৬৫-১৮৬৯)

গদ্যে রীতিকৌশলের অবতারণাই হ'ল তত্ত্ববোধিনী যুগের শ্রেষ্ঠ দান। বাংলা গদ্য রচনা যে কেবল তথ্য প্রকাশের বাহন নয়, পরন্তু রসসৃষ্টিরও উপায়, তা প্রথমে প্রমাণ করলেন তত্ত্ববোধিনী যুগের প্রতিনিধিস্থানীয় দুএকজন লেখক; কিন্তু তা সত্ত্বেও' এ রীতিকৌশল তাঁদের হাতে যথেষ্টরূপে বিকাশ লাভ করে নি। এর অবশ্য নানা কারণ ছিল; তার মধ্যে সাহিত্যসৃষ্টির উপযোগী দৃষ্টির অভাব অন্যতম। এ দৃষ্টির অভাবেই লেখকরা সাহিত্যের উপযোগী বিষয় বস্তু খুঁজে পাচ্ছিলেন না। বক্তব্য বিষয়ের সঙ্গে, বিশেষ ক'রে তার সাহিত্যিক রূপের সঙ্গে, রীতিকৌশলের একটা অবিচ্ছেদ্য যোগ আছে। তত্ত্ববোধিনী যুগে বাংলা গদ্যসাহিত্য, সবেমাত্র তার উপযোগী বিষয়বস্তুর সন্ধান পেতে সুরু করেছে; কিন্তু তখনো রচনার সাহিত্যিক রূপ সম্বন্ধে লেখকদের কোন সুস্পষ্ট ধারণা গড়ে ওঠে নি। এ ধারণা সর্বাগ্রে প্রতিফলিত হ'ল বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা-ময় মানসলোকে। যে উপন্যাস সাহিত্যে গদ্যরীতির এক সর্বোত্তম বিকাশ, সে উপন্যাসের কলাকৌশল বাংলায় প্রবর্তন করলেন তিনি। প্যারীচাঁদ বা ভূদেব এ বিষয়ে কিছু কিছু কাজ করেছিলেন বটে, কিন্তু শিল্পবোধ বঙ্কিমের মতো উচ্চশ্রেণীর ছিল না ব'লে, তাঁদের সফলতার পরিমাণ খুব প্রচুর নয়। তবে পথিকৃৎ হিসাবে তাঁদের নাম কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণীয়।

বঙ্কিমের উপন্যাস রচনার কৌশল যে, বহুল পরিমাণে ইংরেজী উপন্যাস থেকে সমাহৃত, তার একাধিক প্রমাণ আছে। ইংরেজী গদ্য সাহিত্যের উপন্যাস-রূপটি যে তাঁর মনে কী গভীর রেখাপাত করেছিল, এর শ্রেষ্ঠ প্রমাণ তাঁর সর্বপ্রথম লিখিত উপন্যাস Rajmohan's Wife (রাজমোহনের স্ত্রী)। বাংলা গদ্যের সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, বঙ্কিম

ইংরেজী ছেড়ে বাংলায় সাহিত্য রচনায় হাত দিলেন। বাংলা গদ্যে আবার নবযুগ আবির্ভাবের কারণ ঘটল। ১৮৬৫ সালে প্রকাশিত হ'ল তাঁর প্রথম বাংলা উপন্যাস ( সংক্ষেপে 'প্রথম উপন্যাস' )। এ পুস্তক দেখেই সেকালের দূরদর্শী সমালোচকেরা বুঝেছিলেন যে, বাংলা গদ্যের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। বলবার ভঙ্গীর গুণে আখ্যায়িকা যে কত সরস হতে পারে, তা এদেশে সর্বপ্রথম প্রমাণ করলেন বঙ্কিম। এদিক দিয়ে তিনিই হলেন বাংলা গদ্যের জয়যাত্রার শ্রেষ্ঠ সারথি। রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয়-কুমার, বিদ্যাসাগর, তারাশঙ্কর, প্যারীচাঁদ, ভূদেব প্রভৃতির প্রযত্নে বাংলা গদ্যের শব্দবিন্যাস, বাক্যগ্রন্থন এবং অনুচ্ছেদবন্ধের ( paragraphing ) মধ্যে ক্রমশ সংযম, শৃঙ্খলা, সুশ্রব্যতা ও সৌন্দর্য কিয়ৎপরিমাণে দেখা দিলেও, যে রীতিপারিপাট্য প্রবন্ধের সমগ্রতাকে আশ্রয় ক'রে বিকশিত হয়, তাঁদের রচনায় সেটি তেমন করে দেখা যায় নি। বঙ্কিম এ দিক দিয়ে বাংলা গদ্যে নূতন শ্রী সঞ্চার করলেন। কিন্তু উপস্থিত গ্রন্থে তাঁর এ কৃতিত্বের পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা সম্পূর্ণভাবে প্রাসঙ্গিক হবে না। বঙ্কিমের সাহিত্যশিল্প সম্বন্ধ ভালো ক'রে জানতে হলেই, কেবল এ বিষয়ের গভীরতার মধ্যে আবগাহন করা প্রয়োজন। বাংলা সাহিত্যিক গদ্যের ক্রমবিকাশের ধারার অনুসরণ প্রসঙ্গে মোটামুটিভাবে এটুকুন দেখলেই চলবে যে, বঙ্কিম তাঁর গদ্যে কোন্ কোন্ অংশে স্পষ্টরূপে নূতন রীতি-কৌশলের পরিচয় দিয়েছিলেন, অর্থাৎ তাঁর গদ্যরচনা পদ্ধতির মোটামুটি বিশ্লেষণেই নিবদ্ধ থাকবে উপস্থিত প্রচেষ্টা।

'দুর্গেশনন্দিনী'তে ব্যবহৃত গদ্যরীতির যে অংশটি বিশেষ ক'রে প্রথমে চোখে পড়ে, সেটি হচ্ছে তাঁর অলঙ্কার প্রয়োগের নতুন কায়দা। যে গ্রন্থনকৌশল গদ্যকে তার দৈনন্দিন তুচ্ছতা থেকে উদ্ধার ক'রে, যুগপৎ শ্রোতার কানের এবং প্রাণের কাছে আকর্ষণময় করে তোলে, অলঙ্কারের স্থান তার মধ্যে খুব বেশী নয়; তবু তা একেবারে ছেড়ে দেওয়া চলে না। এই যে অপরিহার্য অলঙ্কারের প্রয়োগ কৌশল, বঙ্কিমের আগে—বিশেষ ক'রে তত্ত্ববোধিনী যুগের আগে – লেখকগণ তেমন ভালো ক'রে আয়ত্ত করতে পারেন নি। অলঙ্কার বলতে তাঁরা বুঝতেন – উপমা রূপক এবং

অনুপ্রাস যমকাদি। কিন্তু যুগ যুগ ধরে সংস্কৃত সাহিত্যে ব্যবহৃত এ অলঙ্কারগুলি বাংলা সাহিত্যেও চলে আসছিল প্রায় চতুর্দশ শতক থেকে। **বড়ু চণ্ডীদাস, কৃত্তিবাস, মালাধর বসু** আদি লেখকগণ, সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ বা অনুকরণ করতে গিয়ে, বাংলায় এ সকল অলঙ্কারের কিছু কিছু নানা পরিমাণে ব্যবহার করেছিলেন। তাঁব পরেও প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের বহু লেখক (বৈষ্ণব পদকর্তার দল, **কাশীরাম, মুকুন্দরাম** থেকে ভারতচন্দ্র পর্যন্ত এবং তার পবে নব্য বঙ্গের পাঁচালীকার ও কবিওয়ালারা) এঁ সকল অলঙ্কারের ব্যবহার অসংখ্য বার করেছেন। তারি ফলে এ সকলের চাকচিক্য ও সৌন্দর্যদানের ক্ষমতা চিরকালের মতো লুপ্ত হয়ে গেছে, কিন্তু সংস্কৃতবহুল গদ্যের পক্ষপাতী পণ্ডিত লেখকেরা এ বিষয়ে ছিলেন একান্ত দৃষ্টিহীন। এন কি বিদ্যাসাগরের মতো লেখকেরও এ বিষয়ে সূক্ষ্ম দৃষ্টির অভাব ছিল, এবং তিনি গতানুগতিকতার মোহ কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। তবে দেবেন্দ্রনাথ এবং অক্ষয়কুমারের দৃষ্টি এদিক দিয়ে বেশ খোলা ছিল; তাঁরা যেখানে যেখানে ভাষাকে অলঙ্কৃত করেছেন সে কাজ বেমানান হয় নি। কিন্তু তাঁরা বিশুদ্ধ সাহিত্যিক রচনার দিক দিয়ে গেলেন না ব'লে তাঁদের কৃতিত্ব খুব ফলপ্রসূ হয় নি। প্যারীচাঁদ ও ভূদেব এ বিষয়ে তাঁদের চেয়ে বেশী সূক্ষ্মদৃষ্টির পরিচয় দিলেও তাঁদের সাহিত্যিক প্রতিভা, উত্তম উপন্যাস গড়বার পক্ষে প্রচুর ছিল না। তাই তাঁদের রচনায় অলঙ্কার প্রয়োগের নৈপুণ্য তেমন করে দেখা দেয় নি। বঙ্কিমচন্দ্র এদিক দিয়ে অনেক বেশি সৌভাগ্যবান। বাংলা গদ্যে অলঙ্কার প্রয়োগ বিষয়ে মাত্রাজ্ঞান এবং সুরুচির দৃষ্টান্ত তাঁর রচনাতেই পাওয়া গেল সর্বপ্রথমে।

অলঙ্কার ব্যবহারে বাড়াবাড়ি তিনি একেবারেই পরিত্যাগ করলেন। সংস্কৃত সাহিত্যের কবিগণ এবং তাঁদের দেখাদেখি প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কবিযশঃপ্রার্থীর দল, নারীর রূপবর্ণন প্রসঙ্গে উপমা জাতীয় অলঙ্কারের বাহুল্য করতে পারলেই খুসী হতেন, কিন্তু বঙ্কিম তাঁর প্রথম উপন্যাসেই সে দোষ থেকে মুক্ত। 'দুর্গেশনন্দিনী'তে তিনি তিনটি নারীর রূপ বর্ণনা করেছেন, কিন্তু কোনটিতেই ওরূপ অলঙ্কার প্রয়োগের

আতিশয্য নেই। তিনি বিমলার বর্ণনায় মাত্র দুটি, তিলোত্তমার বর্ণনায় চারটি এবং আয়েষার বর্ণনায় ন'টি উপমা জাতীয় অলঙ্কারের ব্যবহার করেছেন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে আয়েষার বেলায় এরূপ অলঙ্কারের বাড়াবাড়ি ঘটেছে, কিন্তু বস্তুত তা হয় নি। এ রূপবর্ণনায় তিলোত্তমার এবং বিমলার রূপকেও তিনি আবার টেনে এনেছেন তুলনার জন্যে এবং সে প্রসঙ্গে চারিটি উপমা ব্যবহৃত হয়েছে। অতএব দেখা যায় যে, বঙ্কিমচন্দ্র আয়েষার রূপ নির্ণয়ে ঐ জাতীয় পাঁচটি অলঙ্কার ব্যবহার করেছেন। সংখ্যাও একটু বেশি মনে হয়, কিন্তু উপমাগুলির নির্বাচনে এবং প্রয়োগকৌশলে বঙ্কিমের বিশেষ সতর্কতা ছিল ব'লে, এগুলি রচনা রীতিকে কোথাও বিকলাঙ্গ তো করেই নি, বরং তার শোভাতিশয়ই ঘটিয়েছে।

যেমন, বঙ্কিম পাঠককে বোঝাতে চান অয়েষার মুখশ্রীর বিশেষত্ব। সাধারণ গ্রন্থকার হলে এখানে শুধু জলপদ্মের আয়েষার মুখের তুলনা ক'রেই ছেড়ে দিতেন। কারণ, পদ্ম যে নারীমুখের সৌন্দর্য্যজ্ঞাপক শ্রেষ্ঠ উপমাদ্রব্য, তা যে কোন লোকেই স্বীকার করবেন; কিন্তু প্রয়োজন বোধে এই বহুব্যবহৃত উপমাটি প্রয়োগ করতে বাধ্য হলেও, বঙ্কিম তাকে গতানুগতিকভাবে ব্যবহার করলেন না। যেমন, ধাতুমুদ্রায় আরোপিত রাজার মুখ বহু ব্যবহারে পুনঃপুন ঘর্ষণে আর রাজোচিত সৌন্দর্য্য প্রকাশ করে না, তেমনি উপমা যতই সুন্দর হোক না কেন, পুনঃপুন রচনায় দেখা দিলে তা আর যথোচিত অর্থ প্রকাশ করে না। এ বিষয়ে বঙ্কিমের দৃষ্টি ছিল বেশ সজাগ; তাই তিনি জলপদ্মকে আয়েষার মুখের তুলনা হিসাবে ব্যবহার করতে বাধ্য হলেও, বহুব্যবহৃত উপমাটির স্পষ্টতা সম্পাদনের জন্যে, এক নূতন পন্থা অবলম্বন করলেন। বক্তব্য পরিষ্কার করবার জন্যে এখানে আগেকার রূপ বর্ণনার আলোচ্য অংশটি তুলে দিচ্ছি। বঙ্কিম লিখেছেন।

> "আয়েষার বয়ঃক্রম দ্বাবিংশতি বৎসর হইবেক। আয়েষা দেখিতে পরমা সুন্দরী, কিন্তু সে রীতির সৌন্দর্য্য দুই চারি শব্দে প্রকটিত করা দুঃসাধ্য। * * * কোন কোন তরুণীর সৌন্দর্য্য

বাসন্তী মল্লিকার স্থায়; নবস্ফুট ব্রীড়াসঙ্কুচিত, কোমল, নির্ম্মল, পরিমলময়। তিলোত্তমার সৌন্দর্য্য সেইরূপ। কোন রমণীর রূপ অপরাহ্নের স্থলপদ্মের ন্যায়, নির্ব্বাস, মুদিতোন্মুখ, শুষ্কপল্লব অথচ সুশোভিত, অধিক বিকশিত, অধিক প্রভাবিশিষ্ট, মধু পরিপূর্ণ। বিমলা সেইরূপ সুন্দরী। আয়েষার সৌন্দর্য্য নবরবিকরফুল্ল জল-নলিনীর ন্যায়; সুবিকশিত সুবাসিত রসপরিপূর্ণ, রৌদ্রপ্রদীপ্ত, না সঙ্কুচিত, না বিশুষ্ক, কোমল অথচ প্রোজ্জল, পূর্ণ দলরাজী হইতে রৌদ্র প্রতিফলিত হইতেছে, অথচ মুখে হাসি ধরে না।"

বাসন্তী মল্লিকা এবং স্থলপদ্মের সহিত উপমিত দুই নারীর সৌন্দর্যকে পাশাপাশি বর্ণনা ক'রে বঙ্কিমচন্দ্র আয়েষার সৌন্দর্য-বৈশিষ্ট্যকে জলপদ্মের উপমার দ্বারা পরিস্ফুট করেছেন। বহু ব্যবহারে পদ্মের মত উপমানের যে স্পষ্টতাহানি ঘটেছিল, বঙ্কিমের কৌশলে তার যে কেবল পুনরুদ্ধার ঘটেছে তা নয়, বক্তব্য বিষয় এখানে এক নূতন সৌন্দর্য নিয়ে দেখা দিয়েছে; কিন্তু এমন সুকৌশলে পদ্মের উপমা দিয়েও তিনি সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। এতে বর্ণিত মুখশ্রীর রমণীয়তা বেশ পরিস্ফুট হলেও তার মহিমা তেমন ক'রে ফোটে নি। তাই বঙ্কিম দ্বিতীয়বার উপমা প্রয়োগ করলেন। তিনি লিখলেন:—

"পাঠক মহাশয়, "রূপের আলো" কখন দেখিয়াছেন? না দেখিয়া থাকেন শুনিয়া থাকিবেন। অনেক সুন্দরী রূপে "দশ দিক্ আলো" করে। * * * বিমলা রূপে আলো করিতেন, কিন্তু সে প্রদীপের আলোর মত; একটু একটু মিটমিটে, তেল চাই নহিলে জ্বলে না; গৃহকার্য্য চলে, নিয়ে ঘর কর, ভাত রান্ধ, বিছানা পাড় সব চলিবে, কিন্তু স্পর্শ করিলে পুড়িয়া মরিতে হয়। তিলোত্তমাও রূপে আলো করিতেন—সে বালেন্দুজ্যোতির ন্যায়; সুবিমল, সুমধুর, সুশীতল; কিন্তু তাহাতে গৃহকার্য্য হয় না; তত প্রখর নয়, এবং দূরনিঃসৃত। আয়েষাও রূপে আলো করিতেন, কিন্তু সে পূর্ব্বাহ্নিক সূর্য্যরশ্মির ন্যায়; প্রদীপ্ত, প্রভাময়, অথচ যাহাতে পড়ে, তাহাই হাসিতে থাকে।

এখানে, বঙ্কিমের প্রয়োগকৌশলে মামুলি উপমা এক নূতন শ্রী লাভ করেছে। কিন্তু সেকালের পাণ্ডিত্যকণ্ডূয়নগ্রস্ত সংস্কৃতনবীশগণ উপমাদি ব্যবহারের বেলায় অতশত মারপ্যাচের ধার ধারতেন না। গতানুগতিক ভাবে অলঙ্কারে পর অলঙ্কার প্রয়োগ ক'রে চলতেন। অতি দীর্ঘ সমাস প্রয়োগ ক'রে রচনাকে ভারাক্রান্ত করাও তাঁদের আর এক মহৎ দোষ ছিল। এ শ্রেণীর রচনা যে, বাংলা সাহিত্যের অগ্রগতিকে কেমন বাধা দিচ্ছিল তা বঙ্কিম যেমন ভাবে অনুভব করেছিলেন তা বোধ হয় তাঁর আগে কেউ করেন নি। এই অনুভূতির ফলেই তিনি 'দুর্গেশনন্দিনী'তে 'ঐ গোঁড়া পণ্ডিতী রীতির এবং পণ্ডিত লেখকদের ভক্তদের নিয়ে হাস্যরস সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন। এ বিষয়ে তাঁর এ অনুভূতি যে কত তীব্র ছিল, তা বোঝাবার জন্যে সেই হাস্যরসযুক্ত রচনাটির বেশির ভাগ নিচে উদ্ধৃত করা গেল :—

আশমানির রূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন :—

"দিগ্‌গজ গজপতির মনোমোহিনী আশমানী কিরূপ রূপবতী জানিতে পাঠক মহাশয়ের কৌতূহল জন্মিয়াছে সন্দেহ নাই। অতএব তাঁহার সাধ পূরাইব। কিন্তু স্ত্রীলোকের রূপ বর্ণন বিষয়ে গ্রন্থকারগণ যে পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া থাকেন, আমার সদৃশ অকিঞ্চন জনের তৎপদ্ধতি বহির্ভূত হওয়া অতি ধৃষ্টতার বিষয়। অতএব মঙ্গলাচরণ করা কর্ত্তব্য।

হে বাগ্‌দেবি! হে কমলাসনে! শরদিন্দুনিভাননে! অমল-কমলদলনিন্দিতচরণে ভক্তজনবৎসলে! আমাকে সেই চরণ কমলের ছায়া দান কর; আমি আশমানীর রূপ বর্ণন করিব। হে অরবিন্দা-ননসুন্দরীকুলগর্ব্বখর্ব্বকারিণি! হে বিশালরসালদীর্ঘসমাসপটলসৃষ্টি-কারিণি! একবার পদনখের এক পার্শ্বে স্থান দাও, আমি রূপ বর্ণন করিব। সমাস পটল সন্ধি বেগুন' উপমা কাঁচা কলার চড়চড়ি র'াধিয়া এই খিচুড়ি তোমায় ভোগ দিব। হে পণ্ডিতকুলে-প্সিতপয়ঃপ্রস্রবিণি! হে মূর্খজনের প্রতি কচিৎকৃপাকারিণি! হে অঙ্গুলিকণ্ডূয়নবিষমবিকারসমুৎপাদিনি! হে বটতলাবিদ্যাপ্রদীপতৈল-প্রদায়িনি! আমার বুদ্ধির প্রদীপ একবার উজ্জ্বল করিয়া দিয়া যাও।

মা! তোমার দুই রূপ; যে রূপে তুমি কালিদাসকে বরপ্রদা হইয়াছিলে, যে প্রকৃতির প্রভাবে রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, মেঘদূত, শকুন্তলা জন্মিয়াছিল, যে প্রকৃতির ধ্যান করিয়া বাল্মীকি রামায়ণ, ভবভূতি উত্তরচরিত, ভারবি কিরাতার্জ্জুনীয় রচনা করিয়াছিলেন, সে রূপে আমার স্কন্ধে আরোহণ করিয়া পীড়া জন্মাইও না; যে মূর্ত্তি ভাবিয়া শ্রীহর্ষ নৈষধ লিখিয়াছিলেন, যে প্রকৃতি প্রসাদে ভারতচন্দ্র বিদ্যার অপূর্ব্ব রূপবর্ণন করিয়া বঙ্গদেশের মনোমোহন করিয়াছেন, যাহার প্রসাদে দাশরথি রায়ের জন্ম, যে মূর্ত্তিতে আজও বটতলা আলো করিতেছে, সে মূর্ত্তিতে এক বার আমার স্কন্ধে আবির্ভূত হও, আমি আশমানীর রূপ বর্ণন করিব।

আশমানীর বেণীর শোভা ফণিনীর ন্যায়; ফণিনী সেই তাপে মনে ভাবিল, যদি বেণীর কাছে পরাস্ত হইলাম তবে আর এ দেহ লোকের কাছে লইয়া বেড়াইবার প্রয়োজন কি! আমি গর্ত্তে যাই। এই ভাবিয়া সাপ গর্ত্তের ভিতর গেলেন। ব্রহ্মা দেখিলেন প্রমাদ; সাপ গর্ত্তে গেলে দংশন করে কে? এই ভাবিয়া তিনি সাপকে লেজ ধরিয়া বাহির করিলেন, সাপ বাহিরে আসিয়া আবার মুখ দেখাইতে হইল এই ক্ষোভে মাথা কুটিতে লাগিল, মাথা কুটিতে কুটিতে মাথা চেপ্টা হইয়া গেল, সেই অবধি সাপের ফণা হইয়াছে। আশমানীর মুখচন্দ্র অধিক সুন্দর, সুতরাং চন্দ্রদেব উদিত হইতে না পারিয়া ব্রহ্মার নিকট নালিশ করিলেন। ব্রহ্মা কহিলেন ভয় নাই তুমি গিয়া উদিত হও আজি হইতে স্ত্রীলোকদিগের মুখ আবৃত হইবে; সেই অবধি ঘোমটার সৃষ্টি।" ইত্যাদি

বাংলায় সংস্কৃত সাহিত্যের বহুব্যবহারজীর্ণ অলঙ্কার যে অচল তা স্পষ্ট বুঝেছিলেন ব'লে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর রচনায় উপমাদির বাহুল্য একবারে করেন নি। আর যেখানে প্রয়োজনবোধ ওরূপ অলঙ্কার প্রয়োগ ক'রতে হয়েছে সেখানে কৌশলের সঙ্গে তাতে নতুনত্বের অবতারণা করেছেন। এবার প্রশ্ন হতে পারে যে, অলঙ্কারবিরল হয়েও বঙ্কিমের রচনা এত লোকপ্রিয় হয়েছিল কি ক'রে? কিসে তাঁর গদ্যরচনাকে এত চিত্তাকর্ষক

করেছিল ? এ প্রশ্নের উত্তরদান প্রসঙ্গে স্বীকার করতে হবে যে, 'দুর্গেশনন্দিনী' লেখার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্কিম লেখক হিসাবে খুব জনপ্রিয়তা লাভ করলেও, সেটা যে প্রধান ভাবে তাঁর রচনারীতির অভিনবত্ব বা শ্রেষ্ঠত্বের জন্য ঘটেছিল তা নয়। গল্পের মনোহারিত্ব এবং কৌতূহলোদ্দীপকতার জন্যেই তিনি অধিকাংশ পাঠকের প্রশংসা লাভ করেছিলেন। তবে এই মনোহারিত্ব এবং কৌতূহল উদ্দীপনের ক্ষমতা উপন্যাসে তিনি সহজেই সঞ্চার করতে পেরেছিলেন, কথাবস্তু অবতারণার নাটকীয় ভঙ্গীর জন্যে। এই নাটকীয় ভঙ্গীটি বঙ্কিমের ভাল আয়ত্ত ছিল বলেই হয়ত, তাঁর উপন্যাস গুলি সহজেই নাট্যীকৃত হয়ে রঙ্গমঞ্চ থেকে দীর্ঘকাল যাবৎ দর্শক ও শ্রোতৃবর্গের মন মুগ্ধ করেছিল। কিন্তু তা হলে কি বঙ্কিমের গদ্যরীতির এমন কোন উৎকর্ষ নেই যাতে লোকে এর প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে ? নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু সে উৎকর্ষ প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী'তে খুব স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায় নি। এতে গদ্যের সৌন্দর্য তেমন প্রচুর ভাবে দেখা দেয় নি, যদিও তার অবশ্যম্ভবী সূচনা এতে হয়েছিল। উপাখ্যান বর্ণনা প্রসঙ্গে কোন বিশেষ ভাবকে বাক্যসমূহের বৈচিত্র্য দ্বারা এমন সুন্দর রূপে প্রকাশ করতে বঙ্কিমচন্দ্রের আগে হয়ত কেউ পারেন নি। জগৎসিংহকে প্রথম বার দেখবার পর তিলোত্তমা কিরূপ আন্‌মনা ভাবে সময় কাটাচ্ছিলেন তা বর্ণন করতে গিয়ে তিনি, যে রীতিকৌশল দেখিয়েছেন তা সত্যই অপূর্ব। বঙ্কিমচন্দ্র এ প্রসঙ্গে লিখেছেন :—

> তিলোত্তমা একাকিনী কক্ষবাতায়নে বসিয়া কি করিতেছেন ? সায়াহ্নগগণের শোভা নিরীক্ষণ করিতেছেন ? তাহা হইলে ভূতলে চক্ষু কেন ? নদীতীরজ কুসুমসুবাসিত বায়ু সেবন করিতেছেন ? তাহা হইলে ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম হইবে কেন ? মুখের এক পার্শ্ব ব্যতীত ত বায়ু লাগিতেছে না। গোচারণ দেখিতেছেন ? তাও নয়, গাভী সকল ত ক্রমে গৃহে আসিল ; কোকিল রব শুনিতেছেন ? তবে মুখ এত ম্লান কেন ? তিলোত্তমা কিছুই দেখিতেছেন না, শুনিতেছেন না, চিন্তা করিতেছেন।"

অচিরোৎপন্ন অনুরাগ তিলোত্তমার হৃদয়কে কেমন উৎকণ্ঠিত ক'রে

তুলেছিল, যথোপযুক্তসংখ্যক প্রশ্নবোধক বাক্যের সাহায্যে বঙ্কিমচন্দ্র তা বেশ নিপুণভাবে স্বল্পপরিসর অনুচ্ছেদের মধ্যে প্রকাশ করেছেন। কতলু খাঁর বন্দিনী হয়ে কী দুঃখে তিলোত্তমার দিন কাটছিল তা প্রকাশ করতে গিয়েও বঙ্কিমচন্দ্র এ জাতীয় কৌশলের পরিচয় দিয়েছেন। ছোট ছোট বাক্যে এবং প্রশ্নপর্যায়ের উত্তরের সাহায্যে বঙ্কিমচন্দ্র এ ব্যাপারের বর্ণনায় লিখেছেন :—

"দিন যায়। তুমি যাহা ইচ্ছা তাহা কর, দিন যাবে রবে না। যে অবস্থায় ইচ্ছা, সে অবস্থায় থাক, দিন যাবে, রবে না। পথিক, বড় দারুণ ঝটিকা বৃষ্টিতে পতিত হইয়াছে? উচ্চরবে শিরোপরি ঘনগর্জ্জন হইতেছে? বৃষ্টিতে প্লাবিত হইতেছে? অনাবৃত শরীরে করকাভিঘাত হইতেছে? আশ্রয় পাইতেছ না? ক্ষণেক ধৈর্য্য ধর, এ দিন যাবে—রবে না! ক্ষণেক অপেক্ষা কর; দুর্দ্দিন ঘুচিবে, সুদিন হইবে; ভানূদয় হইবে; কালি পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর।

কাহার না দিন যায়? কাহার দুঃখ স্থায়ী করিবার জন্য দিন বসিয়া থাকে? তবে কেন রোদন কর?

কার দিন গেল না? তিলোত্তমা ধূলায় পড়িয়া আছে, তবু দিন যাইতেছে।"

উল্লিখিতরূপ ভাবচিত্রণ ছাড়া প্রকৃতিচিত্রণেও বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্য অপূর্ব শ্রী বিকাশ করেছে। নিচে তার একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল :—

"বিমলা দ্বিগুণ উদ্বিগ্নচিত্তে ছাদের আলিসার নিকট গেলেন; তদুপরি বক্ষঃস্থাপনপূর্ব্বক মুখ নত করিয়া দুর্গমূল পর্য্যন্ত দেখিতে লাগিলেন; কিছুই দেখিতে পাইলেন না। শ্যামোজ্জ্বল শাখাপল্লবসকল স্নিগ্ধ চন্দ্রকরে প্লাবিত;—কখন কখন সুমন্দ পবনান্দোলনে পিঙ্গল বর্ণ দেখাইতেছিল; কাননতলে ঘোরান্ধকার; কোথাও কোথাও শাখাপত্রাদির বিচ্ছেদে চন্দ্রালোক পতিত হইয়াছে; আমোদরের স্থিরাম্বুমধ্যে নীলাম্বর, চন্দ্র ও তারা সহিত প্রতিবিম্বিত; দূরে অপর পারস্থিত অট্টালিকাসকলের গগনস্পর্শী মূর্ত্তি, কোথাও বা

তৎপ্রাসাদস্থিত প্রহরীর অবয়ব। এতদ্ব্যতীত আর কিছুই লক্ষ্য করিতে পারিলেন না।"

কেবল উত্তম প্রকৃতিবর্ণনার জন্য নয়, বাক্যসংস্থানের কৌশলেও এ অনুচ্ছেদটির গ্রন্থন বেশ অনবদ্য হয়েছে, কন্তু উপরে বঙ্কিমচন্দ্রের রীতি কৌশলের যে কয়েকটি দৃষ্টান্ত উল্লিখিত হ'ল সেরূপ স্থল 'দুর্গেশনন্দিনী'তে খুবই স্বল্পসংখ্যক। এ উপর সংস্কৃত শব্দ ও সমাসবহুল বাক্যে পরিপূর্ণ হওয়াতেও এ গ্রন্থের গদ্যরীতি স্বাভাবিকতা এবং অনায়াস গতি থেকে বঞ্চিত হয়েছে। কিন্তু এ সত্ত্বেও বইএর সর্বত্রই যে, বঙ্কিমের ভাষা এরূপ কৃত্রিমতাপূর্ণ ও উৎকটভাবে সংস্কৃতপন্থী, তা নয়। আশমানীর রূপবর্ণনার অন্তর্গত যে তিনটি অনুচ্ছেদ পূর্বে উদ্ধৃত হয়েছে তার তৃতীয়টি ('আশমানীর বেণীর শোভা ফণিনীর ন্যায়' ইত্যাদি) এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। এর রচনায় যে গদ্য ব্যবহৃত হয়েছে তাই বঙ্কিমের নিজস্ব এবং অধিকাংশ রচনার গদ্য। তবে 'দুর্গেশনন্দিনী'তে এরূপ ভাষা খুবই বিরল। যে সমাসপটলসৃষ্টিকারিণী বাগ্‌দেবীকে ব্যজস্তুতি করে তিনি হাস্যরসসৃষ্টি করেছেন সেই বাগ্‌দেবীর প্রভাব তিনি তাঁর প্রথম উপন্যাসে ভালো ভাবে কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। তবে সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, সমসাময়িক পাঠকসমাজ তাঁর ভাষাকে ব্রাহ্মণপণ্ডিতদের রাঁধা সমাসপটলের চেয়ে বেশি উপভোগ্য ও সরস মনে করেছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও বঙ্কিম 'মৃণালিনী' (১৮৬৯) রচনার পরেই নিজ রচনারীতিতে সংস্কৃত প্রভাবের বাহুল্য বর্জন সম্বন্ধে সচেতন হয়ে পড়েন।

পূর্বোল্লিখিত ত্রুটিগুলির সঙ্গে 'দুর্গেশনন্দিনী'র গদ্যে আরো ছোটখাট ত্রুটি ছিল যেমন: সংস্কৃত ও ইংরেজীগন্ধী বাগ্‌ভঙ্গী এবং অকারণ শব্দ প্রয়োগ। সংস্কৃতগন্ধী বাক্য প্রয়োগের উদাহরণ:—(রাজপুত্র) 'সমভিব্যাহারিগণের অগ্রসর হইয়া আসিয়াছেন', 'অট্টালিকা আমূল শিরঃ-পর্য্যন্ত কৃষ্ণপ্রস্তরনির্ম্মিত', 'দিগ্‌গজ * * * মহা অকষ্টবন্ধে পড়িলেন', 'তিনি আমাকে সযত্নে নানা বিদ্যা শিখাইবার পদবীতে আরূঢ় করিয়াছিলেন' 'ওসমানের শ্রীমতী মুখকান্তি হর্ষোৎফুল্ল হইল'। ইংরেজীগন্ধী বাক্য প্রয়োগের উদাহরণ:—'তবে ক্ষমা করি যদি পরিচয়

দাও', 'রাজপুত্র সংবর্দ্ধিত বিষাদে আত্মশিবিরাভিমুখ হইলেন।' কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় এই যে ইংরেজীগন্ধ 'দুর্গেশনন্দিনী'র গদ্যে প্রচুর নয় এবং সংস্কৃত গন্ধ পরবর্তী বইগুলিতে ক্রমশ ক'মে ক'মে লোপ পেয়েছে। তবে নিষ্প্রয়োজন শব্দ প্রয়োগের দোষ বহুস্থানে এ বইএর গদ্যের অপক্কতার নিদর্শনরূপে বর্তমান। এ দৃষ্টান্ত 'দুর্গেশনন্দিনী'র আরম্ভেই প্রচুর। আলোচনার জন্যে সে স্থলটি নিচে উদ্ধৃত হ'ল :—

"৯৯৭ বঙ্গাব্দের নিদাঘশেষে একদিন একজন অশ্বারোহী পুরুষ বিষ্ণুপুর হইতে মান্দারণের পথে একাকী গমন করিতেছিলেন। দিনমণি অস্তাচলগমনোদ্যোগী দেখিয়া অশ্বারোহী দ্রুতবেগে অশ্ব সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। কেন না, সম্মুখে প্রকাণ্ড প্রান্তর; কি জানি, যদি কালধর্ম্মে প্রদোষকালে প্রবল ঝটিকাবৃষ্টি আরম্ভ হয়, তবে সেই প্রান্তরে, নিরাশ্রয়ে যৎপরোনাস্তি পীড়িত হইতে হইবে। প্রান্তর পার হইতে না হইতেই সূর্য্যাস্ত হইল; ক্রমে নৈশগগন নীল নীরদমালায় আবৃত হইতে লাগিল। নিশারম্ভেই এমন ঘোরতর অন্ধকার দিগন্তসংস্থিত হইল যে, অশ্বচালনা অতি কঠিন বোধ হইতে লাগিল। পান্থ কেবল বিদ্যুদ্দীপ্তিপ্রদর্শিত পথে কোনমতে চলিতে লাগিলেন।

অল্পকাল মধ্যে মহারবে নৈদাঘ ঝটিকা প্রবাহিত হইল, এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রবল বৃষ্টিধারা পড়িতে লাগিল। ঘোটকারূঢ় ব্যক্তি গন্তব্য পথের আর কিছুমাত্র স্থিরতা পাইলেন না। অশ্ববল্গা শ্লথ করাতে অশ্ব যথেচ্ছা গমন করিতে লাগিল। এইরূপ কিয়দ্দূর গমন করিলে ঘোটকচরণে কোন কঠিন দ্রব্যসংঘাতে ঘোটকের পদস্খলন হইল। ঐ সময়ে একবার বিদ্যুৎপ্রকাশ হওয়াতে পথিক সম্মুখে প্রকাণ্ড ধবলাকার কোন পদার্থ চকিতমাত্র দেখিতে পাইলেন। ঐ ধবলাকার স্তূপ অট্টালিকা হইবে এই বিবেচনায় অশ্বারোহী লাফ দিয়া ভূতলে অবতরণ করিলেন।"

উল্লিখিতস্থলে খুব কাছাকাছি বাক্যে 'গমন', 'অশ্বারোহী', 'প্রান্তর', ও 'ধবলাকার' শব্দের পুনঃ প্রয়োগ একটু শ্রুতিকটু হয়েছ। আর এক

বাক্যমধ্যে 'অশ্ব', 'ঘোটক', 'প্রান্তর' শব্দ পুনরাবৃত্ত হওয়া তার চেয়েও দোষের মনে হয়। 'অশ্ববল্গা শ্লথ করাতে অশ্ব যথেচ্ছ গমন করিতে লাগিল, 'এইরূপ কিয়দ্দূর গমন করিলে ঘোটক চরণে কোন কঠিনদ্রব্যসংঘাতে ঘোটকের পদস্খলন হইল', এই বাক্য দুটি থেকে প্রথম 'অশ্ব' ও প্রথম 'ঘোটক', দ্বিতীয় বাক্যের 'চরণে' তুলে দিলেই তবে তা নির্দোষ হয়।' 'দুর্গেশনন্দিনী'তে, এমন কি তার পরের দুএক খানি বইতেও, এ ধরণের অনাবশ্যক শব্দপ্রয়োগ খুব বিরল নয়। এরূপ নানাদিক দিয়ে কিছু কিছু ত্রুটি থাকলেও বঙ্কিমের প্রথম উপন্যাসখানি যে কেন লোকপ্রিয় হয়েছিল তার কারণ আগেই বলা হয়েছে। কিন্তু তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস 'কপাল-কুণ্ডলা'য় ( ১৮৬৬ ) 'দুর্গেশনন্দিনী'র মতো কিছুকিছু ত্রুটি বর্তমান থাকলেও এর গদ্যে প্রাণশক্তি ও উজ্জ্বলতা সমধিক। কিন্তু উপমাদি অলঙ্কার প্রয়োগের পারিপাট্যেও এ পুস্তক প্রায় 'দুর্গেশনন্দিনী'র সমানই ; আর শব্দচয়নের পারিপাট্য এবং বাক্যসমূহের বিচিত্র সমাবেশের ফলে ভাববিশেষকে ফুটিয়ে তোলার যে-কৌশল বঙ্কিম তাঁর প্রথম উপন্যাসে দেখিয়েছেন তা 'কপালকুণ্ডলা'য় আরো স্ফূর্তিলাভ করেছে। নিপুণ পাঠক এ গ্রন্থের বহু স্থলে ঐ কৌশলের নিদর্শন দেখতে পাবেন। নিচে দুটিমাত্র দৃষ্টান্ত উল্লিখিত হ'ল :—

> "অনন্তর সমুদ্রের জনহীন তীরে এইরূপ বহুক্ষণ দুই জনে চাহিয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ পরে তরুণীর কণ্ঠস্বর শুনা গেল। তিনি অতি মৃদুস্বরে কহিলেন, "পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ ?"
>
> এই কণ্ঠস্বরের সঙ্গে নবকুমারের হৃদয়বীণা বাজিয়া উঠিল। বিচিত্র হৃদয়যন্ত্রের তন্ত্রীচয় সময়ে সময়ে এরূপ লয়হীন হইয়া থাকে যে যত যত্ন করা যায় কিছুতেই পরস্পর মিলিত হয় না। কিন্তু একটি শব্দে, একটি রমণীকণ্ঠসম্ভূত স্বরে সংশোধিত হইয়া যায়। সকলই লয় বিশিষ্ট হয়। সংসারযাত্রা সেই অবধি সুখময় সঙ্গীতপ্রবাহ বলিয়া বোধ হয়। নবকুমারের কর্ণে সেইরূপ এ ধ্বনি বাজিল।
>
> "পথিক তুমি পথ হারাইরাছ" এ ধ্বনি নবকুমারের কর্ণে প্রবেশ করিল। কি অর্থ কি উত্তর করিতে হইবে কিছুই মনে হইল না'

ধ্বনি যেন হর্ষবিকম্পিত হইয়া বেড়াইতে লাগিল; যেন পবনে সেই ধ্বনি বহিল; বৃক্ষপত্রে মর্ম্মরিত হইতে লাগিল; সাগরনাদে যেন মন্দ্রীভূত হইতে লাগিল। সাগরবসনা পৃথিবী সুন্দরী; ধ্বনিও সুন্দর; হৃদয়তন্ত্রীমধ্যে সৌন্দর্য্যের লয় মিলিতে লাগিল।"

সুন্দরী যুবতীর সহানুভূতিসূচক বাণীতে বিদেশস্থ বিপন্ন যুবকের মনোমধ্যে যে অপূর্ব ভাবোদয় হতে পারে তা উপরে উদ্ধৃত রচনায় বঙ্কিমচন্দ্র চমৎকার ভাষায় ফুটিয়েছেন। কপালকুণ্ডলায় প্রকৃতিবর্ণনেও এ বিষয়ে তাঁর রীতিপটুতার পরিচয় পাই। এর একটি দৃষ্টান্ত নিচে দেওয়া গেল:—

"যাঁহারা ক্ষণকালজন্য অপূর্ব্বপরিচিত বনমধ্যে ভ্রমণ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, পথহীন বনমধ্যে ক্ষণমধ্যেই পথভ্রান্তি জন্মে। নবকুমারের তাহাই ঘটিল। কিছু দূর আসিয়া আশ্রম কোন্ পথে রাখিয়া আসিয়াছেন, তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। গম্ভীর জলকল্লোল তাঁহার কর্ণপথে প্রবেশ করিল; তিনি বুঝিলেন যে এ সাগরগর্জ্জন। ক্ষণকাল পরে অকস্মাৎ বনমধ্য হইতে বহির্গত হইয়া দেখিলেন যে সম্মুখেই সমুদ্র! * * * উভয়পার্শ্বে যতদূর চক্ষুঃ যায়, ততদূর পর্য্যন্ত তরঙ্গভঙ্গপ্রক্ষিপ্ত ফেনার রেখা, স্তূপীকৃত কুসুমদামগ্রথিত মালার ন্যায় সে ধবল ফেনরেখা হেমকান্ত সৈকতে ন্যস্ত হইয়াছে; কাননকুন্তলা ধরণীর উপযুক্ত অলকাভরণ। * * যদি কখন এমত প্রচণ্ড বায়ু বহন সম্ভব হয় যে, তাহার বেগে নক্ষত্র মালা সহস্রে সহস্রে স্থানচ্যুত হইয়া নীলাম্বরে আন্দোলিত হইতে থাকে, তবেই সে সাগরতরঙ্গক্ষেপের স্বরূপ দৃষ্ট হইতে পারে। এ সময়ে অস্তগামী দিনমণির মৃদুল কিরণে নীল জলের একাংশ দ্রবীভূত সুবর্ণের ন্যায় জ্বলিতে ছিল। অতিদূরে কোন ইউরোপীয় বণিক্‌জাতির সমুদ্রপোত শ্বেতপক্ষ বিস্তার করিয়া বৃহৎ পক্ষীর ন্যায় জলধিহৃদয়ে উড়িতে ছিল।"

উল্লিখিত অংশগুলিতে রীতিকৌশলের যে দৃষ্টান্ত দেওয়া হ'ল, সে সকলের মধ্যে দীর্ঘসমাস প্রক্ষেপের জন্যে ভাষার প্রাঞ্জলতা ও অনায়াস গতি ক্ষুণ্ণ হলেও, ঐ সমাসপ্রয়োগ অনুচ্ছেদটিকে বৈচিত্র্য দান ক'রে বর্ণিত

বিষয়ের মহিমা বাড়িয়েছে। কিন্তু 'কপালকুণ্ডলা'র রচনার স্থানে স্থানে সমাসবাহুল্য থাকলেও এবং সে সমাস তাঁর গদ্যরীতিকে শ্রী দান করলেও, বঙ্কিমচন্দ্র যে এ বই লেখার কালে সমাসবিরল সুন্দর গদ্য লিখিতে পারতেন তার প্রমাণ এর মধ্যেই পাওয়া যায়। নিচে একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করছি :—

"অনেকদিন আগ্রায় বেড়াইলাম, কি ফল লাভ হইল? সুখের তৃষ্ণা জন্মাবধি বড়ই প্রবল ছিল। সেই তৃষ্ণার পরিতৃপ্তির জন্য বঙ্গদেশ ছাড়িয়া এ পর্য্যন্ত আসিলাম। এ রত্ন কিনিবার জন্য কি ধন না দিলাম? কোন দুষ্কর্ম্ম না করিয়াছি? আর যে যে উদ্দেশ্যে এতদূর করিলাম তাহার কোনটাই বা হস্তগত হয় নই? ঐশ্বর্য্য, সম্পদ্, ধন, গৌরব, প্রতিষ্ঠা সকলই ত প্রচুর পরিমাণে ভোগ করিলাম। এত করিয়াও কি হইল? আজি এইখানে বসিয়া সকল দিন মনে মনে বলিতে পারি যে, এক দিনের তরেও সুখী হই নাই, ক মুহূর্ত্ত-জন্যও কখনও সুখ ভোগ করি নাই। কখন পরিতৃপ্ত হই নাই. কবল তৃষ্ণা বাড়ে মাত্রে। চেষ্টা করিলে আরও সম্পদ্ আরও ঐ লাভ করিতে পারি, কিন্তু কি জন্য? এ সকলে যদি সুখী হইতে পারিতাম তবে এত দিন এক দিনের তরেও সুখী হইতাম। এই সুখাকাঙ্ক্ষা পার্ব্বতী নির্ঝরিণীর ন্যায়—প্রথমে নির্ম্মল ক্ষীণ ধারা বিজন প্রদেশ হইতে বাহির হয়, আপন গর্ত্তে আপনি লুকাইয়া রহে, কেহ জানে না; আপনাআপনি কল কল করে, কেহ শুনে না। ক্রমে যত দিন যায়, তত দেহ বাড়ে, তত পঙ্কিল হয়। শুধু তাহাই নয়; কখনও আবার বায়ু বহে, তরঙ্গ হয়, মকরকুম্ভীরাদি বাস করে। আরও শরীর বাড়ে, জল কর্দ্দমময় হয়, লবণময় হয় অগণ্য সৈকত চর—মরুভূমি নদীহৃদয়ে বিকাশ করে, বেগ মন্দীভূত হইয়া যায়, তখন সেই সকর্দ্দম নদীশরীর অনন্তসাগরে কোথায় লুকায়, কে বলিবে?"

প্রায় সমাসহীন হওয়া সত্ত্বেও উল্লিখিত অংশের রীতিগত সৌন্দর্য এবং অর্থগাম্ভীর্য নগণ্য নয়। কিন্তু তবু সমাসবহুল রচনার মোহ থেকে

মুক্তি লাভ করতে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রায় চার ছ' বছর লাগল। 'বি ষ বৃ ক্ষে' র ক্রমশ প্রকাশ ( ১৮৭২ ) থেকেই তিনি সমাসবর্জিত বা সমাসবিরল রচনাকে মুখ্যভাবে নিজ নিজ গদ্য রীতির আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করলেন। 'মৃণালিনী'তেও (১৮৬৯) বঙ্কিমের ভাষা অনেকটা সমাস পরিহারের দিকে চলেছে, তবে 'বিষবৃক্ষ' রচনার আগে তিনি সমাসের মোহ ভালো করে কাটাতে পারেন নি। 'বিষবৃক্ষ' বা তার পরে লিখিত বইতে বঙ্কিমচন্দ্র কথনো সমাসবহুল বাক্য ব্যবহার করেছেন বটে, কিন্তু সে প্রায়শ রচনার মধ্যে বৈচিত্র্য বা ( স্থলবিশেষে ) গাম্ভীর্য সম্পাদনের জন্য। যে সকল কারণে 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশের সময় থেকে বঙ্কিম যুগের আরম্ভ কল্পনা করা হয়েছে তাঁর রীতির মূলগত নীতির এরূপ পরিবর্তন সে সকলের মধ্যে অন্যতম।

# উনবিংশ অধ্যায়

## বঙ্কিমযুগ ( ১৮৭২-১৮৯২ )

'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই সাহিত্যক্ষেত্রে বঙ্কিমযুগ শুরু হলেও গদ্যরচনার ক্ষেত্রে ও যুগ 'বঙ্গদর্শনে' বিষবৃক্ষ' প্রকাশের ( ১৮৭২ ) আগে আরম্ভ হয় নি। পূর্ব অধ্যায়ে তাঁর প্রথম তিনখানি উপন্যাসে অনুসৃত গদ্যরীতির আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লিখিত হয়েছে যে, সমাসপ্রিয়তা এ রীতিকে কিয়ৎপরিমাণে দোষযুক্ত করেছিল। কিন্তু এ সমাসের বাহুল্য দেখা দিয়েছে শুধু বিশেষ বিশেষ স্থানে। আখ্যানস্থিত কোনো কোনো দৃশ্যে বা চরিত্রাদি বর্ণনার অনুরোধেই বঙ্কিমচন্দ্র ছোট বড় সমাসের ব্যবহার করেছেন। আর অবশিষ্ট স্থানে মোটামুটি সমাসবিরল গদ্যই বর্ত্তমান। কিন্তু সমাসবহুল না হলেও এ গদ্যের এক বিশেষ লক্ষণ ছিল এতে খাঁটি বাংলা ( তদ্ভব ) শব্দের ( অস্বাভাবিক ) মার্জিত রূপ ( যেমন 'কানে কানে কহিলেন' স্থলে 'কর্ণে কর্ণে কহিলেন' 'কাঁকালে' শব্দের বদলে 'কক্ষালে', 'বাওয়া' ( to row ) স্থলে 'বাহন'। এ সকল ছাড়াও গোড়ার দিকের রচনায় বঙ্কিমচন্দ্রের সংস্কৃতের প্রতি অতিমাত্র অনুরাগের অপরাপর চিহ্ন আছে। পাঁচ বছরের মধ্যে উপর্যুপরি তিনখানি উপন্যাস প্রকাশ ক'রে বঙ্কিম বাঙ্গালী পাঠক সাধারণকে যুগপৎ আশ্চর্যান্বিত এবং সন্তুষ্ট করলেও সেকালকার শিক্ষিত বাঙ্গালীরা তাঁর অনুসৃত গদ্য রীতিকে সর্বান্তঃকরণে মেনে নিতে পারেন নি। 'রহস্যসন্দর্ভে' বঙ্কিমের ( 'দুর্গেশনন্দিনী'র ) সুখ্যাতি করলেও রাজেন্দ্রলাল তাঁর 'লম্ফত্যাগ', 'নিদ্রাগমন' প্রভৃতির ন্যায় প্রকাশভঙ্গীর বিরুদ্ধে মন্তব্য করেছিলেন। বঙ্কিমের বয়োকনিষ্ঠ ইংরাজীশিক্ষিত পাঠকগণের মধ্যেও অনেকে তাঁর ব্যবহৃত সংস্কৃতানুসারিণী ভাষার সম্বন্ধে অভিযোগ করেছিলেন। স্বনামখ্যাত অক্ষয়চন্দ্র সরকার এই শেষোক্ত সমালোচক দলের একজন। বঙ্কিমচন্দ্র বহরমপুরে গেলে তিনি বাংলার এই কৃতী

ঔপন্যাসিকের সঙ্গে আলাপের কালে সংস্কৃতপ্রপীড়িত গদ্যের সাহিত্যিক গুণাগুণ সম্বন্ধে মাঝে মাঝে আলোচনা করতেন। কিন্তু এ ঘটনা উল্লেখের অর্থ এ নয় যে, অক্ষয়চন্দ্রের সঙ্গে আলাপ না হ'লে তাঁর প্রথম ব্যবহৃত গদ্যের চেহারা বদলাতো না। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যিক প্রতিভা এত উচ্চশ্রেণীর ছিল যে, এ বিষয়ে তাঁর মনোযোগ বহুদিন অনাকৃষ্ট থাকতো ব'লে মনে হয় না। তাঁর সৃজনী প্রতিভাই যে অসামান্য ছিল তা নয়, একজন উঁচুদরের সমালোচকও ছিলেন তিনি। তাঁর রচনাবলির ভিন্ন ভিন্ন সংস্করণে যে নানা শ্রেণীর পরিবর্তন তিনি করেছিলেন সেই থেকেই অনুমান করা যেতে পারে যে, অন্যের স্পষ্ট নির্দেশ না পেয়েও তিনি তাঁর স্বকীয় গদ্যরীতির প্রবর্তন করতে পারতেন।

সেই যাই হোক ১৮৭২ সালে 'বিষবৃক্ষ' দেখা দিল এক নূতন গদ্যরীতি নিয়ে। এ পুস্তক তখন বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত নবপ্রকাশিত 'বঙ্গদর্শনে' ক্রমশ মুদ্রিত হয়েছিল। বাংলা গদ্য রচনায় সংস্কৃতের প্রভাব কী পরিমাণে স্বীকার্য, আর খাঁটি বাংলাই বা কী পরিমাণে গ্রহণীয়, এ সম্বন্ধে একটি সুস্পষ্ট আদর্শ অনুসৃত হ'ল 'বিষবৃক্ষে'র রচনায়। এ আদর্শটি কী, বঙ্কিমচন্দ্র প্রায় কুড়ি বছর পরে তাঁর লিখিত 'বাঙ্গালা সাহিত্যে প্যারীচাঁদ মিত্রের স্থান' নামক নিবন্ধে বেশ স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করেছিলেন (১৮৯২)। এ রচনার এক জায়গায় তিনি লিখেছেন যে, "গদ্য যত সুখবোধ্য হইবে, সাহিত্য ততই উন্নতিকারক হইবে। যে সাহিত্যের পাঁচ সাত জন মাত্র অধিকারী, সে সাহিত্যের জগতে কোন প্রয়োজন নাই।"

বঙ্কিমচন্দ্রের মতে এই সুখবোধ্য গদ্যের প্রবর্তনই প্যারীচাঁদের কৃতিত্বের এক প্রধান অংশ। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "যে ভাষা সকল বাঙ্গালীর বোধগম্য এবং সকল বাঙ্গালীকর্তৃক ব্যবহৃত, প্রথম তিনিই তাহা গ্রন্থ প্রণয়নে ব্যবহার করিলেন।" অবশ্য এরূপ বলা সত্ত্বেও বঙ্কিমচন্দ্র 'আলালে'র ভাষাকে সর্বাঙ্গসুন্দর মনে করেন নি। এ গ্রন্থ সম্বন্ধে তিনি বলেন :—

"উহাতে গাম্ভীর্য্যের এবং বিশুদ্ধির অভাব আছে এবং উহাতে অতি উন্নত ভাব, সকল সময়ে পরিস্ফুট করা যায় কিনা সন্দেহ। কিন্তু

উহাতেই প্রথম এ বাঙ্গালা দেশে প্রচারিত হইল যে, যে বাঙ্গালা সর্ব্বজনমধ্যে কথিত এবং প্রচলিত, তাহাতে গ্রন্থ রচনা করা যায়, সে রচনা সুন্দরও হয়। এবং যে সর্ব্বজনহৃদয়গ্রাহিতা সংস্কৃতানুযায়িনী ভাষার পক্ষে দুর্ল্লভ, এ ভাষার তাহা সহজ গুণ। এ কথা জানিতে পারা জাতির পক্ষে অল্প লাভ নহে এবং এই কথা জানিতে পারার পর হইতে উন্নতির পথে বাঙ্গালা সাহিত্যের গতি অতিশয় দ্রুত বেগে চলিতেছে। বাঙ্গালা ভাষার এক সীমায় তারাশঙ্করের কাদম্বরীর অনুবাদ, আর এক সীমায় প্যারীচাঁদ মিত্রের "আলালের ঘরের দুলাল।" ইহার কেহই আদর্শ ভাষায় রচিত নয়। কিন্তু "আলালের ঘরের দুলালে"র পর হইতে বাঙ্গালা লেখক জানিতে পারিল যে, এই উভয় জাতীয় ভাষার উপযুক্ত সমাবেশ দ্বারা এবং বিষয় ভেদে একের প্রবলতা ও অপরের অল্পতা দ্বারা, আদর্শ বাঙ্গালা গদ্যে উপস্থিত হওয়া যায়।"

কিন্তু আদর্শ বাংলা গদ্য সম্বন্ধে এ সত্যটি বঙ্কিমচন্দ্র 'বিষবৃক্ষ' রচনার (১৮৭২) আগে ধরতে পেরেছিলেন ব'লে মনে হয় না। ততদিনে প্যারী-চাঁদ তাঁর 'যৎকিঞ্চিৎ' ও 'অভেদী' নামক পুস্তকদ্বয়ের গদ্যে যে ঐ আদর্শকে অনেকটা রূপ দান করেছিলেন একথা আগেই দেখা গিয়েছে। কিন্তু কিঞ্চিৎ বিলম্বে হ'লেও বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা এ আদর্শকে আশ্রয় করার ফলে, বাংলা গদ্য তার দেশকালের উপযোগী এক অপূর্ব শোভা প্রাপ্ত হয়েছিল। 'বিষবৃক্ষ' যে বাংলা দেশের ঘরে ঘরে সকলের মনকে নাড়া' দিতে পেরেছিল এর ষোল আনা কারণ তার বিষয়বস্তুই নয়। 'আমাদের প্রতিদিনের জীবনযাত্রার' অদূরবর্তী ঘটনাগুলিকে আখ্যানের ভিতর দেখতে পেয়ে পাঠকসমাজের অন্তরে যে একটা সহজ আনন্দের আবির্ভাব হয়েছিল তা খুবই সত্যি, কিন্তু সে সঙ্গে সঙ্গে এটাও সত্যি যে, বঙ্কিমচন্দ্র যদি প্রথম তিনখানি উপন্যাসের মতো কেবল সংস্কৃতশব্দ-বহুল ও [illegible] এ পুস্তক লিখতেন তবে খুব আধুনিক সমাজ-সুলভ কথাবস্তু সত্ত্বেও উপন্যাসখানি বিশেষভাবে বাঙ্গালীর অন্তর হয় তো তেমন ক'রে স্পর্শ করতে পারত না। এ দেশের বা দেশবাসী

নরনারীর যে মনোজ্ঞ ছবি তিনি এ উপন্যাসে এঁকেছেন সে সবই খাঁটি বাংলা শব্দময় অভিনব গদ্যে রচিত; যেমন নগেন্দ্রনাথের নৌকাভ্রমণের বর্ণনায় তিনি লিখেছেন :—

"নগেন্দ্রনাথ দেখিতে দেখিতে গেলেন, নদীর জল অবিরল চল চল চলিতেছে—ছুটিতেছে—বাতাসে নাচিতেছে—রৌদ্রে হাসিতেছে—আবর্ত্তে ডাকিতেছে। জল অশ্রান্ত—অনন্ত—ক্রীড়াময়। জলের ধারে তীরে তীরে মাঠে মাঠে রাখালেরা গোরু চরাইতেছে, কেহ বা বৃক্ষের তলায় বসিয়া গান করিতেছে, কেহ বা তামাকু খাইতেছে, কেহ বা মারামারি কবিতেছে, কেহ কেহ ভুজা খাইতেছে। কৃষকে লাঙ্গল চষিতেছে, গোরু ঠেঙ্গাইতেছে, গোরুকে মানুষের অধিক করিয়া গালি দিতেছে,, কৃষাণকেও কিছু কিছু ভাগ দিতেছে। ঘাটে ঘাটে কৃষকের মহিষীরাও * * * * * ময়লা পরিধেয় বস্ত্র, মসীনিন্দিত গায়ের বর্ণ, রুক্ষ কেশ লইয়া বিরাজ করিতেছেন। তাহার মধ্যে কোন সুন্দরী মাথায় কাদা মাখিয়া ঘষিতেছেন। কেহ ছেলে ঠেঙ্গাইতেছেন, কেহ কোন অনুদ্দিষ্টা,. অব্যক্তনাম্নী, প্রতিবাসিনীর সঙ্গে উদ্দেশে কোন্দল করিতেছেন, কেহ কাষ্ঠে কাপড় আছড়াইতেছেন। কোন কোন ভদ্র গ্রামের ঘাটে কুলকামিনীরা ঘাট আলো করিতেছেন। প্রাচীনারা বক্তৃতা করিতেছেন - মধ্যবয়স্কারা শিব পূজা করিতেছেন—যুবতীরা ঘোমটা দিয়া ডুব দিতেছেন—আর বালক-বালিকারা চেঁচাইতেছে, কাদা মাখিতেছে, পূজার ফুল কুড়াইতেছে, সাঁতার দিতেছে, সকলের গায়ে জল দিতেছে, কখন কখন ধ্যানে নিমগ্না মুদ্রিতনয়না কোন গৃহিণীর সম্মুখস্থ কাদায শিব লইয়া পলাইতেছে। ব্রাহ্মণ ঠাকুরেরা নিরীহ ভালমানুষের মত আপন মনে গঙ্গাস্তব পড়িতেছেন, পূজা করিতেছেন, এক একবার আকণ্ঠ নিমজ্জিতা কোন যুবতীর প্রতি অলক্ষ্যে চাহিয়া লইতেছেন। আকাশে সাদা মেঘ রৌদ্রতপ্ত হইয়া ছুটিতেছে, তাহার নীচে কৃষ্ণ বিন্দুবৎ পাখী উড়িতেছে, নারিকেল গাছে চিল রাজমন্ত্রীর মত চারিদিক্ দেখিতেছে, কাহার কিসে ছোঁ মারিবে। বক ছোটলোক, কাদা

ঘাঁটিয়া বেড়াইতেছে, ডাহুক রসিক লোক, ডুব মারিতেছে, আর আর পাখী হাল্কা লোক, কেবল উড়িয়া বেড়াইতেছে। হাটুরিয়া নৌকা হটর হটর করিয়া যাইতেছে—আপনার প্রয়োজনে। খেয়া নৌকা গজেন্দ্রগমনে যাইতেছে—পরের প্রয়োজনে। বোঝাই নৌকা যাইতেছে না।—তাহাদের প্রভুর প্রয়োজন মাত্র।

নগেন্দ্রপ্রথম দুই একদিন দেখিতে দেখিতে গেলেন। পরে একদিন আকাশে মেঘ উঠিল, মেঘ আকাশ ঢাকিল, নদীর জল কালো হইল, গাছের মাথা কটা হইল, মেঘের কোলে বক উড়িল, নদী নিস্পন্দ হইল।"

বঙ্কিমচন্দ্রের উল্লিখিত স্থলটির রচনায় প্যারীচাঁদের 'অভেদী' ও 'যৎকিঞ্চিৎ' নামক গ্রন্থদ্বয়ের প্রভাব বেশ সুস্পষ্ট। বহু খাঁটি বাংলা শব্দ ব্যবহার ক'রে তিনি এতে যে সুস্পষ্টতা, মাধুর্য এবং স্বাভাবিকতা এনেছেন, সে সকল তাঁর পূর্ববর্তী রচনায় যে পরিমাণ দুর্লভ পরবর্তী রচনায় সে পরিমাণে সুলভ। এ উক্তির দৃষ্টান্ত স্বরূপে বহু স্থল তাঁর শেষের দিকের রচনাবলি থেকে উদ্ধৃত হতে পারে। কেবল গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে সে কার্যে বিরত থাকতে হ'ল। কিন্তু 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশের পর থেকে বঙ্কিমচন্দ্র দীর্ঘসমাসযুক্ত সংস্কৃতশব্দবহুল গদ্যের মোহ পরিহার করলেও সংস্কৃতবহুল ভাষাকে পরিত্যাগ করেন নি। যে 'রজনী'র (১৮৭৪-৭৫) মতো উপন্যাস পাঠকবর্গের পরিচিত জীবনের কাহিনী নিয়ে রচিত, তাতেও বঙ্কিমচন্দ্র মাঝে মাঝে সংস্কৃতবহুল ভাষা ব্যবহার করছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপে এই বই থেকে কিয়দংশ নিচে তুলে দেওয়া গেল :—

"রজনী জন্মান্ধ, কিন্তু তাহার চক্ষু দেখিলে অন্ধ বলিয়া বোধ হয় না। চক্ষে দেখিতে কোন দোষ নাই। চক্ষু বৃহৎ, সুনীল, ভ্রমরকৃষ্ণতারাবিশিষ্ট। অতি সুন্দর চক্ষু কিন্তু কটাক্ষ নাই। চাক্ষুষ স্নায়ুর দোষে অন্ধ। স্নায়ুর নিশ্চেষ্টতাবশতঃ রেটিনাস্থিত প্রতিবিম্ব মস্তিষ্কে গৃহীত হয় না। রজনী সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী; বর্ণ উদ্ভেদপ্রমুখ নবীন কদলীপত্রের ন্যায় গৌর, গঠন বর্ষাজলপূর্ণ তরঙ্গিণীর ন্যায় সম্পূর্ণতাপ্রাপ্ত, মুখকান্তি গম্ভীর, গতি অঙ্গভঙ্গীসকল মৃদু, স্থির এবং

অন্ধতাবশতঃ সর্ব্বদা সঙ্কোচজ্ঞাপক, হাস্য দুঃখময়। সচরাচর এর স্থির-প্রকৃতি সুন্দর শরীরে সেই কটাক্ষহীন দৃষ্টি দেখিয়া কোন কর্ম্মপটু শিল্পকারের যত্ননির্ম্মিত প্রস্তরময়ী স্ত্রীমূর্ত্তি বলিয়া বোধ হইত।”

বঙ্কিমের সর্বশেষে রচিত (১৮৮৭) উপন্যাস ‘সীতারামে’ও এরূপ সংস্কৃতবহুল রচনা বিরল নয়। দৃষ্টান্তরূপে এ গ্রন্থ থেকে কিয়দংশ নিচে দেওয়া হ’ল:—

“সেই ললিতগিরি আমার চিরকাল মনে থাকিবে। চারিদিকে যোজনের উপর যোজন ব্যাপিয়া হরিদ্বর্ণ ধান্যক্ষেত্র—মাতা বসুমতীর অঙ্গে বহুযোজনবিস্তৃতা পীতাম্বরী শাটী! তাহার উপর মাতার অলঙ্কারস্বরূপ তালবৃক্ষশ্রেণী—সহস্র সহস্র, তার পর সহস্র সহস্র তাল বৃক্ষ; সরল, সুপত্র, শোভাময়, মধ্যে নীলসলিলা বিরূপা নীল-পীত পুষ্পময় হরিৎক্ষেত্রমধ্য দিয়া বহিতেছে—সুকোমল গালিচার উপর দিয়া কে নদী আঁকিয়া দিয়াছে। তা যাক্—চারি পাশে মৃত মহাত্মাদের কীর্ত্তি। পাথর এমন করিয়া কে পালিশ করিয়াছিল, সে কি আমাদের মত হিন্দু? এমন করিয়া বিনা বন্ধনে কে বাঁধিয়াছিল, সে কি আমাদের মত হিন্দু? আর এই প্রস্তরমূর্ত্তিসকল কে খোদিয়াছিল—এই দিব্য পুষ্পমাল্যাবরণভূষিত বিকম্পিতচেলাঞ্চলপ্রবৃদ্ধ সৌন্দর্য্য, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর গঠন, পৌরুষের সহিত লাবণ্যের মূর্ত্তিমান্ সম্মিলনস্বরূপ পুরুষমূর্ত্তি যাহারা গড়িয়াছে, তাহারা কি হিন্দু? এইরূপ কোপ-প্রেমগর্ব্ব-সৌভাগ্যস্ফুরিতাধরা চীনাম্বরা তরলিতরত্নহারা, পীবরযৌবনভারাবনতদেহা—তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী মধ্যে ক্ষামা চকিতহরিণীপ্রেক্ষণা নিম্ননাভিঃ—এই সকল স্ত্রীমূর্ত্তি যাহারা গড়িয়াছে তাহারা কি হিন্দু? তখন হিন্দুকে মনে পড়িল। তখন মনে পড়িল, উপনিষদ্, গীতা, রামায়ণ, মহাভারত, কুমারসম্ভব, শকুন্তলা, পাণিনি, কাত্যায়ন, সাংখ্য, পাতঞ্জল, বেদান্ত, বৈশেষিক। এ সকলই হিন্দুর কীর্ত্তি—এ পুতুল কোন ছার। তখন মনে করিলাম হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া জন্ম সার্থক করিয়াছি।”

কিন্তু স্বীয় রচনার স্থানে স্থানে বিষয়ানুরোধে এরূপ গুরু গম্ভীর সংস্কৃত-

বহুল রীতি ব্যবহার করলেও 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশের পরবর্তীকালে বঙ্কিম-চন্দ্রের সংস্কৃত শব্দের মোহ অনেক পরিমাণে কেটে গিয়েছিল। সংস্কৃত-বহুল বাক্যের সঙ্গে মাঝে মাঝে খাঁটি বাংলা শব্দময় বাক্য বসাতেও তিনি দ্বিধাবোধ করেন নি। তাতে সংস্কৃতবাহুল্যের উৎকটতা অনেক কমে গিয়েছে।

এপর্যন্ত বঙ্কিমের রচনারীতি সম্বন্ধে যা কিছু বলেছি তাতে প্রশ্ন হতে পারে যে, যদি বঙ্কিমচন্দ্র সংস্কৃত বহুল এবং খাঁটি বাংলাবহুল দুরকম গদ্যই লিখে থাকেন তবে তাঁর উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব কোন্ খানে? ইতিপূর্বে এ জিজ্ঞাসা পরিতৃপ্তির অনুকূল দুএকটি আভাস দেওয়া হ'লেও এ স্থানে তার যথাসম্ভব বিশদ আলোচনার প্রয়োজন আছে। বক্তব্য বিষয়কে পরিস্ফুট ক'রে তার সাহায্যে রসোদ্রেক করতে গেলে ভাষা যথাসম্ভব সরল হওয়া দরকার; কিন্তু কেবলমাত্র সহজবোধ্য বাক্য-পরম্পরা দ্বারা এ কার্য সুসিদ্ধ হয় না। সুসমালোচক মাত্রেই জানেন যে, অনেকস্থানেই বৈচিত্র্য শিল্পকার্যের প্রাণ। যে বাক্যসমূহের দ্বারা কোন ভাব বা চিত্র বিশেষকে প্রকাশ করা হয় তার মধ্যে যদি বৈচিত্র্যের অভাব ঘটে অর্থাৎ সেগুলি যদি একই ধরণের হয়, তবে অনেক ক্ষেত্রেই পাঠকের বা শ্রোতার পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠ্‌তে পারে। বঙ্কিমচন্দ্র এ তত্ত্বটি বেশ ভালো ক'রে বুঝেছিলেন, এজন্যে তার উপন্যাসগুলির মর্মরূপী অনুচ্ছেদ-চয় বেশ গাঢ়বন্ধ ও সুশ্রব্য হয়ে উঠেছে। বর্তমান গ্রন্থে উল্লিখিত বঙ্কিমচন্দ্রের প্রায় রচনাংশই একথার প্রমাণ স্বরূপ গৃহীত হতে পারে। যথাযোগ্যস্থানে এরূপ নিপুণ অনুচ্ছেদবন্ধের দ্বারাই তিনি তাঁর উপন্যাস সমূহকে কথাবস্তুনিরপেক্ষ এক অপূর্ব সৌন্দর্য দান করতে পেরেছিলেন। এই সৌন্দর্যের জন্যই তাঁর রচনাবলি দীর্ঘকাল যাবৎ বাংলা গদ্যরীতির সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসুবর্গের প্রশংসা লাভ করবে। তাঁর ব্যবহৃত নানা শ্রেণীর বাক্যপর্যায়ের গঠনে ছোটখাটো দোষ আবিষ্কার করা সুসাধ্য হলেও অনুচ্ছেদবন্ধনে বঙ্কিমচন্দ্র যে নৈপুণ্য দেখিয়েছেন তা খুবই উঁচু দরের। এই নৈপুণ্য কী পদ্ধতিতে আত্মপ্রকাশ করছে, তা এখানে মোটামুটিভাবে আলোচনার যোগ্য।

সাধারণ কথাবার্তায় এবং রচনায় যে সব বাক্য সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় তাদের দুই রূপ :—(১) যে সকলে ক্রিয়া উল্লিখিত, এবং (২) যে সকলে ক্রিয়া অনুল্লিখিত। নিচে এদের দৃষ্টান্ত দেওয়া যাচ্ছে :—

"একে এই বিস্তৃত অতিনিবিড় অন্ধতমোময় অরণ্য, তাহাতে রাত্রিকাল। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর। রাত্রি অতিশয় অন্ধকার; কাননের বাহিরেও অন্ধকার; কিছু দেখা যায় না। কাননের ভিতরে তমোরাশি ভূগর্ভস্থ অন্ধকারের ন্যায়।

পশু পক্ষী একেবারে নিস্তব্ধ। কত লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ সেই অরণ্যমধ্যে বাস করে। কেহ কোন শব্দ করিতেছে না। বরং সে অন্ধকার অনুভব করা যায়—শব্দময়ী পৃথিবীর সে নিস্তব্ধ ভাব অনুভব করা যাইতে পারে না। সেই অন্তশূন্য অরণ্য মধ্যে, সেই সূচীভেদ্য অন্ধকারময় নিশীথে, সেই অননুভবনীয় নিঃস্তব্ধতা মধ্যে শব্দ হইল, "আমার মনস্কাম কি সিদ্ধ হইবে না ?" (আনন্দমঠ)

উল্লিখিত অনুচ্ছেদ দ্বয়ের প্রথমটিতে 'কিছু দেখা যায় না', এই একটি বাক্যের ক্রিয়াই উল্লিখিত, আর সকলের ক্রিয়া অনুল্লিখিত। আর দ্বিতীয় অনুচ্ছেদটীর প্রথম বাক্যে ('পশুপক্ষী একেবারে নিস্তব্ধ') ক্রিয়া অনুল্লিখিত, এ ছাড়া সকল বাক্যেই ক্রিয়া উল্লিখিত। এই শেষোক্ত শ্রেণীর বাক্যই (যাতে ক্রিয়া উল্লিখিত) সাধারণ কথাবার্তায় এবং রচনায় সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হয়। আবার ঐ দুশ্রেণীর বাক্যেরই একাধিক রূপ আছে :—যেমন, (১) নি দে´শ ক indicative (২) প্র শ্ন সূ চ ক interrogative (৩) আ জ্ঞা সূ চ ক imperative ইত্যাদি; কিন্তু এগুলির মধ্যে নির্দেশক বাক্যেরই ব্যবহার সবচেয়ে বেশি, কি সাধারণ কথাবার্তায়, কি প্রচলিত নানা শ্রেণীর রচনায়। উপরে উদ্ধৃত অনুচ্ছেদ দুটির একটি ছাড়া সব কটি বাক্যই নির্দেশক, কেবল দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের সর্বশেষ বাক্যই ('আমার মনস্কামনা কি সিদ্ধ হইবে না ?') প্রশ্নসূচক। অতএব দেখা যায় যে, যার ক্রিয়া উল্লিখিত এমন নির্দেশক বাক্যরই প্রচলন সর্বাপেক্ষা বেশি—কি মুখের কথায়, কি লেখায়। কিন্তু পরপর বহু বাক্য একই ছাঁচের

হলে, অনুচ্ছেদের ভাষা দুর্বল মনে হতে পারে, যদি না বক্তব্য বিষয়ের কোন বিশেষ আকর্ষণ থাকে। এই জাতীয় দুর্বলতা পরিহারের জন্যে এবং অনুচ্ছেদের মধ্যে সৌন্দর্যসৃষ্টি করবার জন্যে, মাঝে মাঝে বিভিন্ন শ্রেণীর বাক্যের সন্নিবেশ প্রয়োজন। এই বাক্যগঠনে বৈচিত্র্য সঞ্চারের মধ্যেই গদ্যশিল্পীর কৃতকার্যতার বীজ নিহিত।

কিন্তু এ দিকে বৈচিত্র্য আনা খুব সহজসাধ্য নয়; নির্দেশক বাক্য প্রয়োগের অভ্যাস ব্যক্তি মাত্রেরই এত মজ্জাগত যে, এবং. স্বাভাবিক কারণে এর প্রয়োগ এত বেশি হতে বাধ্য যে, লেখকের দৃষ্টি খুব জাগ্রত না থাকলে তিনি অনুচ্ছেদবন্ধের মধ্যে বাক্য-বৈচিত্র্যের সঞ্চার করতে পারেন না। এ বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের চোখ খুব সজাগ ছিল। তিনি প্রয়োজন মত বাক্যপ্রয়োগের কৌশলে অনুচ্ছেদকে গাঢ়বন্ধ এবং শ্রুতিমধুর করে তুলেছেন। যে যে উপায়ে তিনি এরূপ করতে পেরেছিলেন তার প্রধান কয়েকটি এখানে দৃষ্টান্ত সহ দেওয়া যাচ্ছে:—

(১) অনুক্তক্রিয় বাক্যের প্রয়োগ ক'রে, যথা:—

"গৃহটি নিতান্ত সামান্য নহে। কিন্তু এখন তাহাতে সম্পদ্ লক্ষণ কিছুই নাই। প্রকোষ্ঠ সকল ভগ্ন, মলিন, মনুষ্যসমাগমচিহ্নবিরহিত কেবলমাত্র পেচক, মূষিক ও নানাবিধ কীট পতঙ্গাদি সমাকীর্ণ। একটি মাত্র কক্ষে আলো জ্বলিতেছেল। সেই কক্ষমধ্যে নগেন্দ্র প্রবেশ করিলেন; দেখিলেন, কক্ষমধ্যে মনুষ্যজীবনোপযোগী দুই একটা সামগ্রী আছে মাত্র, কিন্তু সে সকল দারিদ্র্যব্যঞ্জক। দুই একটা হাঁড়ি—একটা ভাঙ্গা উনান—তিন চারিখান তৈজস গৃহালঙ্কার, দেয়ালে কালি, কোণে ঝুল, চারিদিকে আরসুলা, টীকটীকি, ইন্দুর বেড়াইতেছে, এক ছিন্ন শয্যায় একজন প্রাচীন শয়ন করিয়া আছেন, দেখিয়া বোধ হয়, তাঁহার অন্তিমকাল উপস্থিত। চক্ষু ম্লান, নিশ্বাস প্রখর, ওষ্ঠ বিকম্পিত। শয্যাপার্শ্বে গৃহচ্যুত ইষ্টকখণ্ডের উপর একটি মৃণ্ময় প্রদীপ, তাহাতে তৈলাভাব; শয্যোপরিস্থ জীবনপ্রদীপেও তাহাই। আর শয্যাপার্শ্বেও আর এক প্রদীপ ছিল—এক অনিন্দিত গৌরকান্তি স্নিগ্ধ জ্যোতির্ম্ময়রূপিণী।" (বিষবৃক্ষ)

"মহান্ধকারময়—পর্ব্বতগুহা—পৃষ্ঠচ্ছেদী শয্যায় শুইয়া শৈবলিনী। মহাকায় পুরুষ শৈবলিনীকে তথায় ফেলিয়া দিয়া গিয়াছেন। ঝড়বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে—কিন্তু গুহামধ্যে অন্ধকার—কেবল অন্ধকার—অন্ধকার ঘোরতর নিঃশব্দ। নয়ন মুদিলে অন্ধকার চক্ষু চাহিলে তেমনই অন্ধকার নিঃশব্দ—কেবল কোথাও পর্ব্বতস্থ রন্ধ্রপথে কিছু কিছু বারি গুহাতলস্থ শিলার উপরে পড়িয়া ক্ষণে ক্ষণে টিপ্ টিপ্ শব্দ করিতেছে। আর যেন কোন জীব, মনুষ্য কি পশু—কে জানে?—সেই গুহামধ্যে নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছে।" (চন্দ্রশেখর)

(২) অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাক্যের ব্যবহার ক'রে, যথা :—

"বর্ষাকাল। বড় দুর্দ্দিন। সমস্তদিন বৃষ্টি হইয়াছে। একবারও সূর্য্যোদয় হয় নাই। আকাশ মেঘে ঢাকা। কাশী যাইবার পাকা রাস্তার ঘুটিঙ্গের উপরে একটু একটু পিছল হইযাছে। পথে প্রায় লোক নাই—ভিজিয়া ভিজিয়া কে পথ চলে? একজন মাত্র পথিক যাইতেছিল। পথিকের ব্রহ্মচারীবেশ। গৈরিকবর্ণ বস্ত্র পরা। গলায় রুদ্রাক্ষ—কপালে চন্দনরেখা—জটার আড়ম্বর কিছু নাই, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কেশ কতক শ্বেতবর্ণ। একহাতে গোলপাতার ছাতা, অপরহাতে তৈজস; ব্রহ্মচারী ভিজিয়া ভিজিযা চলিয়াছেন। একে ত দিনেই অন্ধকার, তাহাতে আবার পথে রাত্রি হইল—অমনি পৃথিবী মসীময়ী হইল—পথিক কোথায় পথ, কোথায় অপথ কিছুই অনুভব করিতে পারিলেন না—তথাপি তিনি পথ অতিবাহিত করিয়া চলিলেন—কেন না তিনি সংসারত্যাগী, ব্রহ্মচারী। যে সংসারত্যাগী তাহার অন্ধকার আলো, সুপথ কুপথ সব সমান।" (বিষবৃক্ষ)

"হায় নূতন। তুমিই কি সুন্দর? না সেই পুরাতনই সুন্দর? তবে তুমি নূতন! তুমি অনন্তের অংশ। অনন্তের একটুখানি মাত্র আমরা জানি। সেই একটুখানি আমাদের কাছে পুরাতন; অনন্তের আর সব আমাদের কাছে নূতন। অনন্তের যাহা অজ্ঞাত তাহাও অনন্ত। নূতন! তুমি অনন্তেরই অংশ; তাই তুমি এত উন্মাদকর। আজ শ্রী সীতারামের কাছে—অনন্তের অংশ। (সীতারাম)

( ৩ ) প্রশ্নসূচক বাক্যের ব্যবহার ক'রে, যথা :—

"দুইজনে সাঁতারিয়া অনেক দূর গেল। কি মনোহর দৃশ্য! কি সুখের সাগরে সাঁতার। অনন্ত দেশব্যাপিনী, বিশালহৃদয়া ক্ষুদ্র-বীচি-মালিনী, নীলিমাময়ী তটিনীর বক্ষে চন্দ্রকরসাগরমধ্যে ভাসিতে ভাসিতে সেই ঊর্দ্ধস্থ অনন্ত নীলসাগরে দৃষ্টি পড়িল। তখন প্রতাপ মনে করিল, কেনই বা মনুষ্য-অদৃষ্টে ঐ সাঁতার নাই? কেনই বা মানুষে ঐ মেঘের তরঙ্গে তরঙ্গ ভাঙ্গিতে পারে না? কি পুণ্য করিলে ঐ সমুদ্রে সন্তরণকারী জীব হইতে পারি? সাঁতার? কি ছার ক্ষুদ্র পার্থিব নদীতে সাঁতার! জন্মিয়া অবধি এই দুরন্ত কালসমুদ্রে সাঁতার দিতেছি, তরঙ্গ ঠেলিয়া তরঙ্গের উপর ফেলিতেছি—তৃণবৎ তরঙ্গে তরঙ্গে বেড়াইতেছি—আবার সাঁতার কি? শৈবলিনী ভাবিল, এ জলের ত তল আছে, আমি যে অতলজলে ভাসিতেছি।"

( চন্দ্রশেখর )

"বহুমূর্ত্তিময়ী বসুন্ধরে! তুমি দেখিতে কেমন? তুমি যে অসংখ্য অচিন্তনীয় শক্তি ধর, অনন্ত বৈচিত্র্যবিশিষ্ট জড়পদার্থ সকল হৃদয়ে ধারণ কর, সে সব দেখিতে কেমন? যাকে যাকে লোকে সুন্দর বলে সে সব দেখিতে কেমন? তোমার হৃদয়ে যে অসংখ্য বহুপ্রকৃতিবিশিষ্ট জন্তুগণ বিচরণ করে, তারা সব দেখিতে কেমন? বল মা, তোমার হৃদয়ের সারভূত পুরুষজাতি দেখিতে কেমন? দেখাও মা, তাহার মধ্যে যাহার করস্পর্শে এত সুখ সে দেখিতে কেমন? দেখা মা দেখিতে কেমন দেখায়? দেখা কি? দেখা কেমন? দেখিলে কিরূপ সুখ হয়? এক মুহূর্ত্তের জন্য এই সুখময় স্পর্শ দেখিতে পাই না?" ( রজনী )

( ৪ ) আশ্চর্যসূচক বাক্যের প্রয়োগ ক'রে, যথা :—

"তা সেদিন গঙ্গারামের কোন কাজ করা হইল না। রমার মুখখানি বড় সুন্দর! কি সুন্দর আলোই তার উপর পড়িয়াছিল। সেই কথা ভাবিতেই গঙ্গারামের দিন গেল। বাতির আলো বলিয়াই কি অমন দেখাইল? তা হলে মানুষ রাত্রিদিন বাতির আলো

জ্বালিয়া বসিয়া থাকে না কেন? কি মিসমিসে কোঁকড়া চুলের গোছা! কি ফলান রঙ্গ! কি ভুরু! কি চোখ্! কি ঠোঁট!—যেমন রাঙ্গা তেমনই পাতলা! কি গড়ন! তা কোন্‌টাই বা গঙ্গারাম ভাবিবে? সবই যেন দেবীদুর্ল্লভ! গঙ্গারাম ভাবিল মানুষ যে এমন সুন্দর হয় তা জানতেম না! একবার যে দেখিলাম আমার জন্ম সার্থক হইল। আমি তাই ভাবিয়া যে কয় বৎসর বাঁচিব সুখে কাটাইতে পারিব।" (সীতারাম)

উপরে যে সকলের উল্লেখ করা হল তা ছাড়াও অন্যান্য উপায়ে বা একাধিক উপায়ের সাহায্যে বঙ্কিমচন্দ্র অনুচ্ছেদবন্ধের কৌশল দেখিয়েছেন। সে গুলির বিস্তারিত আলোচনা উপস্থিত ক্ষেত্রে নিষ্প্রয়োজন। কারণ বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলি থেকে তাঁর রচনারীতির যে কয়েকটি দৃষ্টান্ত উল্লিখিত হয়েছে, সে ক'টির প্রতি মনোযোগ দিলে বোঝা যাবে, বাংলা গদ্যে তিনি কী অভিনব শোভা ও প্রাণশক্তির সঞ্চার ক'রে গেছেন। বাংলার যথার্থ সাহিত্যিক গদ্যের, তথা গদ্য সাহিত্যের, স্রষ্টা যে বঙ্কিমচন্দ্র—সে দৃষ্টান্তগুলি থেকেই তা স্পষ্ট বোঝা যায়। তাঁর যুগের আর যে সকল লেখক গদ্য রচনায় অল্পবিস্তর কৃতকার্যতা লাভ করেছিলেন তাঁদের অধিকাংশই তাঁর প্রভাবে প্রভাবিত। যেমন, তাঁর সহযোগী **সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত**, স্বর্ণকুমারী দেবী, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, **যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ বসু, মীর মশারফ হোসেন** ইত্যাদির রচনায় এ প্রভাব সহজেই স্বীকার করতে হবে। বঙ্কিমচন্দ্রের এ প্রভাব তাঁর পরবর্তী (রবীন্দ্র) যুগেও বর্তমান ছিল। **হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়** ও **রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়** প্রভৃতির উপর বঙ্কিমচন্দ্রেব প্রভাব সুস্পষ্ট।

# বিংশ অধ্যায়

## (ক) কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-১৮৮৪)

বঙ্কিমচন্দ্রের স্বনামাঙ্কিত যুগে তাঁর রচনারীতির প্রতিষ্ঠা সর্বাধিক হলেও, অন্যান্য প্রভাব যে একেবারে নিষ্ক্রিয় ছিল তা মোটেই নয়। পূর্ববর্তী (তত্ত্ববোধিনী) যুগের লেখকদের (যথা দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার, বিদ্যাসাগর) প্রভাব তখনো লেখকসাধারণের উপর অল্পবিস্তর কাজ করছিল। তবে বাংলা সাহিত্যিক গদ্যের ক্রমবিকাশের ব্যাপারে এ প্রভাব তখন আর বিশেষ ফলপ্রসূ ছিল না ব'লে, এস্থানে সে সম্বন্ধে আলোচনা করা অনাবশ্যক মনে হয়। কিন্তু এ প্রসঙ্গে সুবিখ্যাত বাগ্মী ও ধর্মনেতা কেশবচন্দ্র এবং 'বা ন্ধ ব' সম্পাদক কালীপ্রসন্ন ঘোষের কৃতিত্বের কথা উল্লেখ না করা অনুচিত হবে। কেশবচন্দ্রের উপর তত্ত্ববোধিনীর, বিশেষ ক'রে দেবেন্দ্রনাথের রচনারীতির প্রভাব কিয়ৎ-পরিমাণে পড়েছিল। কিন্তু নিজ প্রতিভার ফলে এ প্রভাব এমন সহজভাবে তিনি আপন রচনার অঙ্গীভূত করেছিলেন যে, তাতে এক প্রশংসনীয় মৌলিকত্ব দেখা দিয়েছিল। এই মৌলিকত্বের জন্যে তিনি বাংলা গদ্যের উন্নতিবিধানে বঙ্কিমচন্দ্রের একজন শ্রেষ্ঠ সহযোগী হিসাবে গণ্য হওয়ার যোগ্য। কিন্তু কেশবচন্দ্রের গদ্য রচনা কেবল ধর্মবিষয়ক ব'লে তাঁর এ যোগ্যতার কথা প্রায়শ লোকের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে, এবং বালা গদ্যের উপকারক হিসাবে, যে প্রশংসা তাঁর প্রাপ্য তা থেকে তিনি অনেকাংশে বঞ্চিত হয়েছেন। এ সত্ত্বেও আধুনিক সাহিত্যিক গদ্যের প্রবর্তন ব্যাপারে কেশবচন্দ্রের দান নিতান্ত নগণ্য নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস যখন প্রকাশিত হয় নি, তখন থেকেই কেশবচন্দ্র বাংলা গদ্যের সেবা করছিলেন। ব্রহ্মবিদ্যালয়ে ও প্রকাশ্য সভায় তিনি যে সব বক্তৃতা

দিয়েছিলেন সে গুলিতেই তাঁর গদ্যের প্রাথমিক ব্যবহার। ১৮৬২ সালে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের আচার্যপদে বৃত হওয়ার পর থেকে তিনি সমাজে যে বক্তৃতা বা উপদেশাদি দিয়েছেন, সে সবের মধ্য দিয়ে তাঁর গদ্য প্রয়োগের ক্ষেত্র ক্রমশ বিস্তৃত হয়ে চলেছিল। এ বক্তৃতা ও উপদেশগুলির অধিকাংশই মুদ্রিত আকারে পাওয়া যায়, কিন্তু এ সকল দেখে বাংলা গদ্যের উপর কেশবচন্দ্রের প্রভাব উপলব্ধি করা খুব সুসাধ্য নয়।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার (১৮৬৬) পূর্ব পর্যন্ত কেশবচন্দ্রের ব্যক্তিত্ব বা বাগ্মিতা সাধারণ দেশবাসীর নিকট তেমন পরিচিত হয় নি। তাই গদ্যলেখক বা গদ্যপ্রচারক হিসাবে তাঁর যে প্রভাব, তা ১৮৬৬ সালের পর থেকেই আরম্ভ হয়েছিল বলা যেতে পারে। অর্থাৎ এদিক দিয়ে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের প্রায় সমসাময়িক। কিন্তু কেশবচন্দ্রের গদ্য, ধর্মালোচনা-মূলক ব'লে বাংলা গদ্যরীতির উপর তাঁর প্রভাব অনেকটা অপ্রত্যক্ষ। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর গদ্যে যে সাহিত্যিক সৌন্দর্য সঞ্চার করেছিলেন তা কেশবচন্দ্রের গদ্যে খুব সুলভ নয়; কিন্তু তা সত্ত্বেও ব্রহ্মানন্দের রচনায় কখনো কখনো রীতিপারিপাট্যের আভাস পাওয়া যায়। এসকল কথা যথাস্থানে আলোচিত হবে। কেশবচন্দ্রের গদ্যের প্রধান গুণ এই যে, এ নিতান্তই সাদাসিধে ধরণের। শ্রোতৃবর্গের হৃদয় আকর্ষণ করা সম্বন্ধে তাঁর যে অসামান্য ক্ষমতা ছিল তার মূলে ছিল এই সহজ সরল বাক্যভঙ্গী। কৃত্রিম বাক্যালঙ্কার প্রয়োগ দ্বারা লোককে চমৎকৃতই করা যায়, কিন্তু তাদের চিত্ত আকর্ষণ করতে হ'লে চাই, হৃদয়উৎস থেকে উৎসারিত আবেগময়ী সরলভাষা। কেশবচন্দ্রের ব্যবহৃত সরল ভাষা বাংলা সাহিত্যিক গদ্যের যে কী অশেষ উপকার সাধন করছে তা বর্তমানকালের সাধারণ লোকে তত সহজে বুঝতে পারবে না। তত্ত্ববোধিনীর পূর্বযুগ থেকে বাংলা গদ্যে সংস্কৃতের প্রভাব খুব গুরুতরভাবে চেপে ছিল। এ প্রভাবের একটি মূলগত লক্ষণ ছিল প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে, সমাসবদ্ধ পদের বা সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ। কিন্তু এ সমাসবদ্ধ পদাদি বাংলা গদ্যের পক্ষে অনেকাংশেই অস্বাভাবিক।

তাই সহজভাষাপ্রিয় কেশবচন্দ্রের প্রদত্ত বক্তৃতা ও উপদেশে, ও তৎ সম্পাদিত বা পরিচালিত 'ধ র্ম ত ত্ত্বে' ও 'সু ল ভ স মা চা রে', যে গদ্যের সন্ধান পাওয়া যায় তা নিতান্ত সমাসভারমুক্ত ও লঘুগতি। এই গদ্যের আদর্শ যে কিয়দংশেও বাংলা সাহিত্যিক গদ্যকে বর্তমান অবস্থায় আনতে সাহায্য করেছে তা অনুমান করা হয়ত অসঙ্গত হবে না। পূর্বেই বলা হয়েছে যে এক অসাধারণ সারল্য কেশবচন্দ্রের গদ্যরচনার এক বিশেষ লক্ষণ হলেও এতে স্থানে স্থানে রীতিপারিপাট্যের আভাস রয়েছে, কিন্তু এ পারিপাট্য চেষ্টাকৃত নয়, তাঁর প্রাণের সহজ আবেগ থেকে নিঃসৃত। এরূপ পারিপাট্য খুব অল্প স্থলে লক্ষিত হলেও কেশবচন্দ্রের বাংলা রচনারীতি বেশ সতেজ। তাঁর বক্তৃতা শুনে লোকে যে অসাধারণ উদ্দীপনা অনুভব ক'রত তাই এ কথার প্রমাণ। নিচে তাঁর গদ্যরচনার রীতিক্রম দৃষ্টান্তসহকারে সংক্ষেপে আলোচিত হবে।

১৭৮৩ শকের (১৮৬২ সালের) মাঘোৎসবে কেশবচন্দ্র যে উপদেশ দেন তাই তাঁর গোড়ার দিককার গদ্যরচনার উত্তম দৃষ্টান্ত। এ উপদেশে দেবেন্দ্রনাথের ভাষার প্রভাব সুস্পষ্ট হলেও কেশবচন্দ্রের নিজস্ব গদ্যরীতি নিতান্ত অলক্ষ্য নয়। নিচে এর কিয়দংশ উদ্ধৃত হ'ল :—

> "আমাদের কখন সুখ, কখন দুঃখ, কখন সম্পদ, কখন বিপদ হইয়াছে ; কখন বা বন্ধুবান্ধবাদি দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া সৌভাগ্য-সমীরণ সেবন করিয়াছি, কখন বা যন্ত্রণা ক্লেশে সংসারের কঠোরতার পরিচয় পাইয়া একাকী বিলাপ করিয়াছি। কতপ্রকার পরিবর্ত্তন হইয়াছে, কতপ্রকার ঘটনার মধ্য দিয়া জীবনের স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে, কিন্তু কি আশ্চর্য্য! সেই মঙ্গলস্বরূপের মঙ্গলদৃষ্টি, সকল সময়ে সকল অবস্থাতে, আমাদের উপর স্থির ছিল। তাঁহার প্রীতিক্রোধ হইতে আমরা কখন বিচ্ছিন্ন হই নাই। আশ্চর্য্য তাঁহার করুণা! যখনই শোকে কাতর হইয়া তাঁহার নিকট ক্রন্দন করিয়াছি, তিনি আমার অশ্রুজল মোচন করিয়া, সান্ত্বনাদ্বারা তাপিত হৃদয়কে শীতল করিয়াছেন। ঘোর নিশীথের সময় যখন নিদ্রায় অভিভূত হইয়া, একাকী সংসারারণ্যে আমি নিতান্ত অসহায় ছিলাম, তখন তিনি

আমার নিকট আসিয়া আমার দেহ মনকে রক্ষা করিয়াছেন ; যখন সুখের জন্য, ধর্ম্মের জন্য, তাঁহার চরণে কৃতজ্ঞতার উপহার অর্পণ করিয়াছি তাহা তিনি প্রসন্ন হইয়া গ্রহণ করিয়াছেন।"

১৭৮৭ শকের (১৮৬৬) মাঘোৎসবে কেশবচন্দ্র যে উপদেশ দিয়েছিলেন তাও তাঁর সরল গদ্যরীতিরই দৃষ্টান্ত। এবং কিয়দংশ নিচে তুলে দেওয়া হ'ল :—

"অতএব আইস, এই উৎসবক্ষেত্রের বাহ্যশোভার আবরণ ভেদ করত আমরা প্রকৃত ব্রহ্মোৎসবে প্রবেশ করি। বহির্জগতের সমুদয় পদার্থের নিকট বিদায় লই, সাংসারিক চিন্তা ও বিষয়কামনার নিকট বিদায় লই। সূর্য্যের আলোক নির্ব্বাণ হইল, জগৎ বিলুপ্ত হইল, সময় অন্তর্হিত হইল, যাহা কিছু ক্ষুদ্র, যাহা কিছু সংকীর্ণ, যাহা কিছু ক্ষণভঙ্গুর, সকলই অদৃশ্য হইল। আমরা অনন্তরাজ্যে উপস্থিত, কেবলই অনন্তের ব্যাপার লক্ষিত হইতেছে। দিবা নিশা, পক্ষ মাস, ঋতু বর্ষ একীভূত হইয়া অনন্তকালে বিলীন হইয়াছে। যেমন কালে কেবল অনন্ত, সেইরূপ ব্যাপ্তিতেও কেবল অনন্ত দেখা যাইতেছে। ঊর্দ্ধে, অধোতে, দক্ষিণে বামে, কিছুরই ব্যবধান নাই। চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ তারা, ভূলোক দ্যুলোক সকলই অনন্ত আকাশে লয় প্রাপ্ত হইয়াছে।"

ধর্ম্ম উপদেশ আদির কালে বিশুদ্ধ সাধুভাষা ব্যবহার করলেও কেশবচন্দ্র সর্বসাধারণের শিক্ষার জন্যে তাঁর সম্পাদিত দৈনিক 'সুলভ সমাচারে' যে ভাষা ব্যবহার করেছিলেন সেটি আরো সহজবোধ্য। অন্যান্য কারণের মধ্যে এই সহজবোধ্যতার জন্যে তাঁর 'সুলভ সমাচার' কাগজ-খানির সর্ব্বোচ্চ প্রচার দশ হাজার পর্য্যন্ত পৌছেছিল। ১৮৭০ সালের কাছাকাছি সময়ে এটি এক অত্যাশ্চর্য ঘটনা। নিচে উক্ত পত্রিকা থেকে একটি অংশ উদ্ধার করা গেল। এটিতে কেশবচন্দ্র আধুনিক ভারতীয় গণ-আন্দোলনের পূর্ব্বাভাষ করেছেন :—

দেশের বড়লোক কাহারা? যাহাদের টাকা আছে—অর্থাৎ যাহারা আগে মিস্ত্রীগিরি ধোপাগিরি কি খানসামাগিরি করিয়া দিন গুজরাণ চালাইতেন, কিন্তু এখন কোন মত প্রকারে টাকা উপার্জ্জন

[ করিয়া ] এদেশে বড় মানুষ বলিয়া সকলের কাছে পরিচিত হইয়াছেন। বলিতে গেলে বনেদি ঘর এদেশে অল্প। কিন্তু বাস্তবিক বড় মানুষ কাহারা? আমাদের দেশের; এদেশের ছোট লোকেরা। তাহারা না খাটিলে কার বা ভাত জুটিত, কে বা গাড়ী চড়িয়া ঘোড়দৌড় দেখিতে যাইত, আর কেই বা তাকিয়া ঠেসান দিয়া গুড়াগুড়ি টানিত। দেখ সামান্য লোকেরা আমাদের সর্ব্বস্ব দিতেছে। তাহাদের ধনে আমরা বড় মানুষী করিতেছি। কিন্তু কয় জন তাহাদিগের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব মনে করে। তাহারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া দিন রাত্রি কষ্ট করিয়া আমাদিগকে অন্ন দিতেছে, কিন্তু কয়জন তাহাদের অবস্থা একবার ও মনে করে।"

দৈনিক কাগজের রচনায় একটু—প্রাকৃত ঘেঁষা সাধুভাষা ব্যবহার করলেও ধর্ম্ম উপদেশের সময় কেশবচন্দ্র একটু গুরু গম্ভীর ভাষাই ব্যবহার করতেন। তবে তাঁর বক্তৃতার ভাষা মোটেই দুর্ব্বোধ্য ছিলেন না।

১৮৭৮ সালে কেশবচন্দ্র শারদীয় উৎসব উপলক্ষে যে উপদেশ দিয়েছিলেন তার ভাষা এর চেয়েও সরস। এর কিয়দংশ নিচে উদ্ধৃত হ'ল:—

"শরৎকালে পৃথিবী যে এমন আশ্চর্য্য শ্রী ধারণ করে, লক্ষ্মীর আবির্ভাবই তাহার কারণ। পৃথিবীর এই উৎপাদিকা শক্তি কোথা হইতে আসিল? এই যে সকল স্থান মরুভূমি হইয়াছিল, যেখানে বিষাদের হাহাকার শব্দ উঠিতেছিল, আজ সে সকল কিরূপে শস্যপূর্ণ সুশোভিত ক্ষেত্র হইল? যে মাঠ দেখিলে কিছুকাল পূর্ব্বে বিষাদ হইত আজ তাহা প্রচুর ধান্য প্রসব করিয়া আপনি হাসিতেছে গৃহস্থকে হাসাইতেছে এবং দর্শকের নয়নরঞ্জন করিতেছে। শরৎকালে দেখিতেছি প্রকৃতির মধ্যে লক্ষ্মীপূজার সমারোহ। এই ঋতুতে বিশেষরূপে পৃথিবীতে লক্ষ্মীশ্রী প্রকাশিত। মাঠে যেমন সম্পদ্ ঐশ্বর্য্যশ্রীতে পরিপূর্ণ হইয়া হাসিল, আমাদিগের প্রাণও তেমনি হাসিল। লক্ষ্মীর সমাগমে পৃথিবী হাসিল।"

কেশবচন্দ্রের এই সরল, প্রাঞ্জল ও ওজস্বিনী ভাষা তাঁর সহকর্ম্মী ও অনুরাগিবর্গের অনেকের রচনাপ্রণালীকে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করেছিল। এই প্রসঙ্গে **গৌরগোবিন্দ রায়** ( ১৮৪০-১৯১২ ), **ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল** ( ১৮৪০-১৯১৬ ), **প্রতাপচন্দ্র মজুমদার** ( ১৮৪০-১৯০৫ ), **অঘোরনাথ গুপ্ত** ( ১৮৪১-১৮৮১ ) ও **গিরিশচন্দ্র সেনের** ( ১৮৩৫-১৯১০ ) নাম উল্লেখযোগ্য। এঁরা ছাড়াও কেশবচন্দ্রের উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতার সহস্র সহস্র শ্রোতা এবং 'সুলভ সমাচারে'র অগণ্য পাঠক যে তাঁর গদ্যরীতির প্রভাব অল্পবিস্তর অনুভব করেছিলেন তা সহজেই অনুমান করা যায়।

## (খ) কালীপ্রসন্ন ঘোষ (১৮৪৩ –১৯১০)

তত্ত্ববোধিনী যুগের প্রভাব এক আশ্চর্য্যজনক ফল প্রসব করেছিল কালীপ্রসন্ন ঘোষের রচনায়। এ বিষয়ে অক্ষয়কুমার ও বিদ্যাসাগরের সংস্কৃতশব্দবহুল গদ্য তাঁর আদর্শস্থানীয় হলেও তিনি দুয়ের কারুরই প্রদর্শিত পথকে যথাযথভাবে অনুসরণ করে নি। কেশবচন্দ্র যেমন দেবেন্দ্রনাথের সরল রচনারীতিকে নিজের পদ্ধতিতে সরল করে নিলেন, কালীপ্রসন্নও তেমনি বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমারের গদ্যে নিজ রুচি অনুযায়ী অলঙ্কার ও রীতিপারিপাট্য সঞ্চার ক'রে তাকে অধিকতর গাম্ভীর্যদান করলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনারীতির আলোচনায় দেখা গিয়েছে যে, তিনি স্থানে স্থানে ভাষাকে কিরূপ গুরুগম্ভীর করে তুলতেন; কিন্তু সে সকল ঘটত বিশেষভাবে তাঁর উপন্যাসের বেলায় 'ক ম লা কা ন্ত' ও 'লো ক র হ স্য' বাদ দিলে তাঁর কোন প্রবন্ধজাতীয় রচনারই এরূপ ভাষাগত গাম্ভীর্যের সন্ধান মেলে না। বঙ্কিমের প্রবন্ধগুলিতে ( 'বি বি ধ-প্র ব ন্ধ' ও 'ধ র্ম ত ত্ত্বা'দি ) ব্যবহৃত গদ্যের মধ্যে রীতিপারিপাট্য খুব সুলভ নয়। কালীপ্রসন্ন ঘোষের প্রবন্ধাবলীর গদ্য এদিক দিয়ে সম্পূর্ণ অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তাঁর ভাবপ্রধান রচনাবলিতে বাংলা গদ্য লালিত্যমিশ্রিত

এক অদৃষ্টপূর্ব ওজস্বিতা লাভ করেছে। এর শব্দবিন্যাস, ছন্দোলীলা, অলঙ্কারপ্রয়োগ ও অর্থবৈচিত্র্য সবই উচ্চশ্রেণীর। নানা প্রকার দীর্ঘ বাক্যপরম্পরাকে ভাবের সূত্রে গেঁথে অনুচ্ছেদ রচনা করলেও তাঁর রচনা যে সৌন্দর্য ও প্রাঞ্জলতা হারায় নি এর একমাত্র কারণ পূর্বোক্ত গুণগুলি।

কালীপ্রসন্নের প্রথম পুস্তক 'নারীজাতিবিষয়ক প্রস্তাবে'র প্রকাশ কাল প্রায় ১৮৭০ সালের কাছাকাছি। সেকালের 'তত্ত্ববোধিনী' ও Hindu Patriot 'হিন্দু প্যাট্রিয়টে' এ পুস্তকের খুব অজস্র প্রশংসাবাদ হয়েছিল। 'প্যাট্রিয়টে'র সম্পাদক লিখেছিলেন যে, বাংলা পদ্যে মধুসূদনের দ্বারা যেরূপ সংস্কার সংঘটিত হয়েছে; "নারীজাতি বিষয়ক প্রস্তাব" এর রচয়িতার দ্বারা বাংলা গদ্যে সেরূপ পরিবর্তন ও সংস্কার সংসাধিত হবে। এ পুস্তক রচনার প্রায় চার বছর, এবং 'বঙ্গদর্শনে'র দু বছর পরে কালীপ্রসন্ন ঢাকা থেকে 'বান্ধব' নামক মাসিক পত্র প্রকাশ করতে আরম্ভ করেন (১৮৭৪)। এ পত্রিকায় কালীপ্রসন্নের গদ্যরীতির সর্বোত্তম স্ফূর্তি হয়েছিল। 'সাধারণী'তে অক্ষয়চন্দ্র অকুণ্ঠিতভাবে নব প্রকাশিত বান্ধবের প্রশংসাবাদ করলেন। বঙ্কিমচন্দ্রও 'বঙ্গদর্শনে' নূতন সহযোগীকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। তিনি সম্পাদক সম্বন্ধে লিখলেন যে 'ইঁহার ভাষা সুন্দর ও চিন্তাশক্তি অসামান্য'। 'সোমপ্রকাশের' দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ-এর চেয়েও উচ্ছ্বসিত ভাষায় কালীপ্রসন্নের 'বান্ধবে'র গুণগান করলেন। তিনি লিখলেন, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস যেমন হৃদয়হারিণী, কালীপ্রসন্নের প্রবন্ধমালাও তেমনি হৃদয়হারিণী। কোন একটি প্রবন্ধ পড়িতে আরম্ভ করিলে তাহা শেষ না করিয়া ত্যাগ করা যায় না।" এ ছাড়া সেকালের একাধিক খ্যাতনামা সাহিত্যিক, কালীপ্রসন্নের গদ্য সম্বন্ধে প্রশংসামুখর হয়েছিলেন। কিন্তু এত সমসাময়িক খ্যাতি সত্ত্বেও এ প্রতিভাশালী গদ্যলেখকের নাম বর্তমানে খুব কম বাঙালীরই পরিচিত। এর এক কারণ, কালীপ্রসন্নের রচনাবলি উপন্যাস নয়। প্রবন্ধ যতই সুলিখিত হোক তার পাঠক সংখ্যা খুবই কম। কিন্তু পাঠকসংখ্যা যতই স্বল্প হোক না কেন, বাংলা গদ্যরীতির ঐতিহাসিকগণ

প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে বঙ্কিমের এই শ্লাঘ্য সহযোগীর মৌলিকতার ও কৃতিত্বের সমাদর চিরকালই করতে বাধ্য হবেন। আর যাঁরা গদ্যরচনার কৌশল আয়ত্ত করতে চান, কালীপ্রসন্নের রচনাবলি পড়লে তাঁরাও যে উপকৃত হবেন একথা জোর করে বলতে পারা যায়। নিচে তাঁর রচনারীতির বিশেষত্ব দৃষ্টান্ত সহকারে আলোচিত হচ্ছে।

কালীপ্রসন্নের 'প্র ভা ত চি ন্তা' ১৮৭৭ সালে প্রথম ছাপা হয়েছিল। এ পুস্তক খানি 'বান্ধবে' প্রকাশিত কতিপয় প্রবন্ধের সমষ্টি। 'বান্ধবে'র ভাষা যে খুব সমসাময়িক প্রশংসা লাভ করেছিল তার অন্যতম কারণ কালীপ্রসন্নের নিজস্ব গদ্যরীতি। এর গদ্যে সরলতার সঙ্গে কী পরিমাণ গাম্ভীর্য দেখা যায়, তার দৃষ্টান্ত হিসাবে উক্ত গ্রন্থ থেকে কিয়দংশ নিচে দেওয়া হ'ল :—

"এ সংসারে সকলেই মহানুভব ব্যক্তিদিগের জীবনচরিত পাঠ করিবার জন্য কৌতূহল প্রকাশ করিয়া থাকে। যাঁহারা, পৃথিবীতে আসিয়া খাইয়া শুইযাই সময় কর্ত্তন করেন নাই, কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে জীবন যাপন করিয়াছেন—যাঁহারা তৃণের মত জোয়ার ভাটায় যাতায়াত না করিয়া এই অনন্ত কালসমুদ্রের সৈকত ভূমিতে আপনাদিগের পদচিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন, যাঁহাদিগের আবির্ভাবে ধরা টলমল করিয়াছে, চতুর্দ্দিকে হুলস্থুল পড়িয়াছে, মানবজাতি হয় হাসিয়াছে, না হয় কাঁদিয়াছে, তাদৃশ অনন্যসাধারণ ক্ষণজন্মা পুরুষদিগের ঘরের কথা জানিবার জন্য মনে স্বভাবতঃই এক বিষম আগ্রহ উপস্থিত হয়। তাঁহারা ছোটবেলায় কিরূপ খেলা করিয়া বেড়াইতেন, তাঁহারা পরিপক্ক প্রৌঢ়দশায় উপনীত হইয়া সমাজের অভিনয় ভূমিতে কিরূপে কার্য্য করিতেন, এবং যবনিকার অন্তরালেই বা কিরূপে উপস্থিত থাকিতেন, এই সমস্ত কথা বালকবৃদ্ধ, সকলেই বিশেষরূপে অবগত হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করে।"

উল্লিখিত রচনাংশে সমাসবদ্ধপদের বিরলতা ও যথাপ্রচুর খাঁটি বাংলা শব্দের প্রয়োগ লক্ষণীয়। এ সত্ত্বেও এর গদ্যে বেশ গাম্ভীর্য আছে।'

১৮৮৩ সালে প্রথম প্রকাশিত কালীপ্রসন্নের 'নি ভৃ ত চি ন্তা'ও

'বান্ধব' থেকে সংকলিত কতিপয় প্রবন্ধের সমষ্টি। এ পুস্তকের 'বিরাট্ পুরুষ' নামক প্রবন্ধের ভাষায় তিনি যে লালিত্য ও ওজস্বিতার সমন্বয় করেছেন তা খুবই বিস্ময়কর। এর আরম্ভাংশটি নিচে উদ্ধৃত হ'ল :—

"এই ভূতধাত্রী ধরিত্রী, এক সময়ে এক প্রকাণ্ড বাষ্পপিণ্ড অথবা পিণ্ডীভূত তরলবহ্নির ন্যায়, শূন্যবক্ষে ভ্রাম্যমাণা ছিল। তখন জলে স্থলে প্রভেদ ছিল না, সমস্তই একাকার। তখন হিমাদ্রি, কি বিন্ধ্যাচল, ভূমধ্য কি ভারত সমুদ্র, দৃশ্যগোলকে বিভিন্নতা জন্মাইত না, সমস্তই এক। তখন নদী ছিল না এবং নদীর বক্ষে লহরী খেলিত না; তরুলতার উৎপত্তি হয় নাই, সুতরাং তরুশাখায় বসিয়া বনের পাখী গান করিত না এবং কুসুমিত লতার সুকোমল অঙ্গ বায়ুভরে দুলিয়া দুলিয়া অলিগুঞ্জনে গুঞ্জিত হইত না। তখন আকাশে তারা ফুটিত,—আকাশের অনন্ত নক্ষত্রমালা, সায়ন্তন পুষ্পমালার ন্যায় প্রস্ফুটিত হইত, কিন্তু পৃথিবী হইতে একটি চক্ষুও একবার তাহা চাহিয়া দেখিত না। তখনও সূর্য্যের উদয় হইত, সূর্য্য অস্ত যাইত, সূর্য্য মণ্ডলের প্রদীপ্ত রশ্মি জগতে ছড়াইয়া পড়িত; কিন্তু পৃথিবীর একটি চক্ষুও তাহা দেখিবার জন্য উন্মীলিত হইত না। তখন গ্রাম নাই, নগর নাই, জীবজন্তুর সঞ্চার নাই। ভোক্তা নাই, ভোজ্য নাই, দ্রষ্টা নাই, দৃশ্য নাই, সুখদুঃখের অনুভূতি কিংবা হর্ষবিষাদের ক্রীড়া নাই; পৃথিবী শূন্যময়।

সেই শূন্যহৃদয়া পৃথিবী, শতসহস্র যুগ হইতে শত সহস্র যুগ পর্য্যন্ত এইরূপে বিবর্ত্তিত হইয়া, আজি স্বভাব ও শিল্পজাত বৈভবের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণে কবি-কল্পিত অমরাবতীকেও অধঃকৃত করিয়াছে, এবং স্বপ্নও কোন দিন যে সম্পদের ছায়া দেখিতে পায় নাই, আজি পৃথিবী সেই সম্পদে শোভান্বিত হইয়া জগতে বিরাজ করিতেছে। * * * * *"

১৮৯৬ সালে প্রথম প্রকাশিত 'নিশীথচিন্তা' নামক পুস্তকও পূর্ব্বোল্লিখিত দুখানি পুস্তকের মত 'বান্ধব' থেকে সংকলিত প্রবন্ধরাজী মাত্র। এর 'রাত্রিকাল' নামক প্রবন্ধের কিয়দংশ উদ্ধার করেই কালীপ্রসন্নের রচনা-রীতি সম্পর্কে আলোচনা সমাপ্ত হবে। এ প্রবন্ধেরও

ভাষা পূর্বোক্ত প্রবন্ধগুলির মত উপাদেয়। রাত্রিকালে সমস্ত জগতের মধ্যে যে এক বিশ্রামলাভ-কাতর নিস্তব্ধতা বিরাজ করে তার বর্ণন করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন :—

"* * * পার্থিব ক্রিয়াকর্ম্মের প্রবল প্রবাহ নিস্তব্ধ হইয়া আসে; দেখিতে দেখিতেই সকল একাকার হইয়া যায়, এবং যেখানে যে আছে সকলেই সেই এক শয্যায় শয়ন করিয়া কৃতার্থতা লাভ করে। ইহা মাতৃস্নেহের উপর মুগ্ধ নির্ভর ভিন্ন আর কি হইতে পারে? রাজা প্রজা, দাতা গ্রহীতা, অপকারী অপকৃত, নিন্দুক নিন্দিত, পূজ্য, পূজক, ভক্ষ্য ভক্ষক কেহই সেই অতুল স্নেহের সুখশয্যায় বঞ্চিত নহে। তাপহারিণী, দুঃখবারিণী, করুণাময়ী জননী, সকলকেই সমান আদরে বুকে লইয়া, সকলের দুঃখতাপ বিদূরিত করেন। যে দিনান্তে মুষ্টিভিক্ষাও আহরণ করিতে পারে নাই, তাহাকেও ক্রোড়ে লন, এবং যে অসীম ঐশ্বর্য্যের অধিস্বামী হইয়াও সমস্ত দিবসে একমুষ্টি তণ্ডুল তুলিয়া ভিখারীকে দিতে সমর্থ হয় নাই তাহাকেও আশ্রয়দান করেন। যে ব্যক্তি আপনটি বই জগতে আর কাহাকেও আপনার বলিয়া মনে করে না, কাহারও সুখ-দুঃখের সংবাদ লয় না, শত রক্ষকে পরিবেষ্টিত রহিয়াও চিত্তে আশ্বাস পায় না এবং আপনার প্রাণসঙ্গিনী প্রিয়তমাকেও সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিতে চাহে না, সেও মা নক্ষত্রকুন্তলার পদপ্রান্তে আপনার দেহপ্রাণ সমর্পণ করিয়া ক্ষণকাল নয়ন মুদিয়া নিশ্চিন্ত থাকে। * * * * যাহার ভালবাসা আষাঢ়ের অজস্র ধারায় বৃষ্ট হইয়াও নিঃশেষ হয় না সেও নৈশ শান্তির আনন্দময় আবেশে, তাহার হৃদয়ের প্রস্রবণ রুদ্ধ করিয়া সকলকেই কিছু সময়ের জন্য একেবারে পাসরিয়া নহে। রাত্রি জীবের মাতৃস্থানীয়া নয় ত কি? মাতার ক্রোড়-দেশ বিনা এমন শীতল এমন কোমল শান্তির স্থান ত্রিভুবনে আর কোথায় সম্ভবে?"

কালীপ্রসন্নের গদ্য এরূপ শক্তিসম্পন্ন এবং সুললিত ছিল। কিন্তু বিস্তর সমসাময়িক প্রশংসা পেলেও তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রভাব কারো উপর পড়েছিল কি না জানা যায় না।

## ( গ ) রমেশচন্দ্র দত্ত ( ১৮৪৮-১৯০৯ )

বঙ্কিমযুগের অন্য গদ্যলেখকদের মধ্যে রমেশচন্দ্র দত্তের নাম বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। ইংরেজী রচনার সিদ্ধহস্ত হয়েও তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের অনুরোধে বাংলা গদ্যরচনায় হাত দিয়েছিলেন, এবং এ কাজে তাঁর কৃতকার্যতা লাভ ঘটেছিল যথেষ্ট। চারখানি ঐতিহাসিক ও দুখানি সামাজিক উপন্যাস লিখে তিনি বাংলা গদ্যকে যথার্থভাবে সম্পৎশালী করে গেছেন। তাঁর রচনারীতি খানিকটা বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার অনুগামী হলেও এতে বিশেষত্ব আছে। বঙ্কিমচন্দ্র শেষ পর্যন্ত দীর্ঘ সমাসের প্রয়োগ একেবারে ছাড়তে পারেন নি। কিন্তু রমেশচন্দ্রের রচনায় ওরূপ সমাস একান্ত বিরল। আর তাঁর রচনায় অলঙ্কারবাহুল্যেও অনুপস্থিত। নিচে এ রচনার দুটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাচ্ছে :—

"চন্দ্রোদয় হইয়াছে, সম্মুখে উচ্চ মহেশ্বর মন্দির চন্দ্রালোকে অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া গভীর নীল আকাশপটে চিত্রের ন্যায় ন্যস্ত রহিয়াছে। চারিদিকে উজ্জ্বল শ্বেত সৌধমালা চন্দ্রকিরণে রৌপ্যমণ্ডিতের ন্যায় শোভা পাইতেছে, সেই সৌধমালা হইতে অসংখ্য প্রদীপালোক বহির্গত হইয়া নয়নপথে পতিত হইতেছে। মধ্যস্থ ভূমিখণ্ড প্রায় জনশূন্য হইয়াছে, যে স্থানে সমস্ত দিন কলরব হইতেছিল সে স্থান প্রায় নিস্তব্ধ হইয়াছে। স্থানে স্থানে বৃক্ষপত্রের মধ্যে পুঞ্জ পুঞ্জ খদ্যোতমালা নয়ন রঞ্জন করিতেছে। শীতল সুগন্ধ সমীরণ রহিয়া রহিয়া বহিতেছে ও নিকটস্থ উচ্চ বৃক্ষ হইতে সুমধুর গম্ভীর রব বাহির করিতেছে।" (বঙ্গবিজেতা)

"রাত্রি প্রভাত হইয়াছে উষা তরুণী গৃহিণীর ন্যায় সংসার কার্য্যের জন্য জগতে সকলকে উঠাইলেন, সকলকে নিজ কার্য্যে প্রেরণ করিলেন। মাতা যেরূপ কন্যাকে সুন্দররূপে সাজাইয়া দেন, সেইরূপ

সুন্দর সাজ পরিধান করিয়া উষা আকাশে দর্শন দিলেন। হাস্তমুখী তরুণীর প্রণয়াভিলাষে প্রণয়ী সূর্য্য অচিরেই উদিত হইলেন, উষার পশ্চাতে ধাবমান হইলেন। তাঁহার উজ্জ্বল কিরণরূপ সপ্ত অশ্ব রথে সংযোজিত করিয়া সেই জ্বলন্তবেশী সবিতা আকাশমার্গে ধাবমান হইলেন, আকাশ আলোকে পূর্ণ করিলেন, জগতে সংজ্ঞাশূন্যকে সংজ্ঞা দান করিলেন, রূপশূন্যকে রূপদান করিলেন। উষার সূর্য্যোদয়ের শোভায় বিস্মিত হইয়া চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আমাদিগের প্রাচীন ঋগ্বেদের ঋষিগণ এইরূপ সুন্দর কল্পনাদ্বারা যে শোভাটি বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন সেরূপ সরলতা এবং প্রকৃতির আলোকে আলোকপূর্ণ কবিতা তাহার পর আর রচিত হয় নাই।”

উল্লিখিত রকমের সাধুভাষা ছাড়া রমেশচন্দ্র ‘সং সা র’ ও ‘স মা জে’ মেয়েদের ( এবং স্থানে স্থানে পুরুষদের ) উক্তিতে প্রচুর কথ্যভাষা ব্যবহার করেছেন। উপন্যাসের পাত্র পাত্রীর মুখে কথ্যভাষার ব্যবহার বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রই রমেশচন্দ্রের পথপ্রদর্শক। গোড়ার দিকের উপন্যাসগুলিতে বঙ্কিম প্যারীচাঁদ মিত্রের আদর্শ গ্রহণ করেন নি। ১৮৭৪ সালে প্রকাশিত ‘চন্দ্রশেখরে’ই বোধ হয় সর্বপ্রথমে তিনি দুএকটুকু কথ্যভাষা ব্যবহার করেন। সে যাই হোক কথ্যভাষা ব্যবহারের ফলে রমেশচন্দ্রের রচনা খুব হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল ; কিন্তু তা সত্ত্বেও এ কথ্যভাষায় কোন উচ্চাঙ্গের ভাব তেমন প্রকাশ হয় নি। এ ভাষার সমাদরের সংকীর্ণতা ও সীমাবদ্ধতা দূর হতে আরো পঁচিশ বছরের উপর লেগেছিল। এ কথ্যভাষার ব্যবহার এবং সাধুভাষার গদ্যের সরলতার কথা বিবেচনা করলে রমেশচন্দ্রকে বঙ্কিমযুগের গদ্যলেখক হিসাবে খুব উচ্চস্থান দিতে হয়। তাঁর রচনায় খুব সামান্য ইংরেজীর গন্ধ এবং ব্যাকরণের ভুল মাঝে মাঝে থাকলেও বাংলা গদ্যের সেবক হিসাবে বোধ হয় বঙ্কিমচন্দ্রের পরেই তাঁর স্থান।

## (ঘ) শিবনাথ শাস্ত্রী

শিবনাথ শাস্ত্রী সংস্কৃত কলেজে দীর্ঘকাল শিক্ষালাভ করলেও তাঁর ব্যবহৃত গদ্যে পণ্ডিতী গন্ধ নেই। এর কারণ তাঁর উপর পড়েছিল একদিকে তত্ত্ববোধিনীর, অপর দিকে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের প্রভাব। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আচার্যরূপে শিবনাথ যে চমৎকার উপদেশমালা বিবৃত করেছিলেন এবং তাঁর যে চারখানি উপন্যাস ও দুখানি প্রবন্ধ-গ্রন্থ দ্বারা বঙ্গসাহিত্য সমৃদ্ধ হয়েছিল, সেগুলি থেকে জানতে পারা যায় যে তাঁর গদ্য এক সহজ সরল ভঙ্গীতে রচিত এবং এর মধ্যে কোনো অলঙ্করণের কোনো প্রয়াস নেই। যেমন বক্তব্য বিষয়ের চিত্তাকর্ষকতা তেমনি প্রসাদ গুণের জন্যে শিবনাথের রচনা পাঠকগণের নিকট বিশেষ সমাদর লাভ করেছিল। নিচে ১৮৭৯ সালে প্রদত্ত তাঁর একটি উপদেশ থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করা যাচ্ছে। মানবকুলের বর্ত্তমান ত্রুটি দুর্ব্বলতার জন্যে সাধুগণ গভীর বেদনা অনুভবের সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্যে যে প্রবল আশা ও তজ্জনিত আনন্দ অনুভব করেন তা বোঝাতে গিয়ে তিনি বলেছেন :—

"একজন দরিদ্র কৃষকের বিষয় স্মরণ কর। সে ব্যক্তি যেখানে নিজ পর্ণকুটীরে বাস করিতেছে, চল সেই স্থানে যাই। এই ভারতের কৃষকের ন্যায় দরিদ্র কে আছে? তাহার গৃহে গিয়া কি দেখিবে? সেখানে দরিদ্রতার ভীষণ মূর্ত্তি, উদরে অন্ন নাই, স্ত্রীপুত্রের গাত্রাবরণ নাই, গৃহে আচ্ছাদন নাই। ইহার উপর ধনীর দৌরাত্ম্য। তাহার পরিশ্রমের অন্ন সুখে উদরস্থ হয় না। প্রহারে, অত্যাচারে, উপদ্রবে তাহার চিন্তাকুল প্রাণ জর্জ্জরিত হইয়া রহিয়াছে। বল দেখি, এ দৃশ্যের মধ্যে কি দেখিতেছ? সেখানে কি হাস্যের ছবি দেখিতেছ, না ক্রন্দনের ছবি দেখিতেছ? সকলেই বলিবে সেখানে অশ্রুপাত ও হাহাকার। কিন্তু প্রাতে সেই কৃষক যখন স্বীয়

ক্ষেত্রাভিমুখে গমন করিতেছে, তখন সেখানে গিয়া আর এক ছবি দর্শন কর। সে যখন আপনার ক্ষেতের পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল এবং মৃদু সমীরণে ঈষদান্দোলিত শস্যের অঙ্কুরগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল, তখন কোথা হইতে তাহার সেই চিরমলিন ঘন-বিষাদপূর্ণ মুখেও প্রসন্নতার উদয় হইল। সে চিত্রপুত্তলির ন্যায় হৃদয়ের প্রিয় শস্যক্ষেত্রের দিকে চাহিয়া নিজের অজ্ঞাতসারে হাস্য করিতে লাগিল। এই আর এক ছবি দর্শন কর। এখানে তাহার হর্ষে বিষাদে মিলিল কি না দেখ।

কেবল ধর্ম্ম উপদেশের ভাষায় নয় তাঁর উপন্যাস গুলির ভাষাও ছিল এই ধরণেরই সহজবোধ্য। তার উপর গ্রন্থকারের আন্তরিক সহানুভূতির গুণে সে সকল সহজেই পাঠকের হৃদয় আকর্ষণ করবার মতো। নিচে যুগান্তর ( ১৮৯৫ ) থেকে কিছু অংশ তুলে দেওযা যাচ্ছে।

"আরতির সময় তাঁহার সেই পবিত্র মুখশ্রী ভক্তিতে বিকসিত হইয়া কি ভাব ধারণ করিত, তাহার বর্ণনা হয় না। ধূপ ধূনার গন্ধে দিক আমোদিত হইয়া যাইতেছে, চণ্ডীমণ্ডপখানি আলোক-মণ্ডিত হইয়া অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে, প্রতিমার উভয় পার্শ্বে দুইজন ছাত্র ভক্তি সহকারে চামর ঢুলাইতেছে ; আরতির পঞ্চ-প্রদীপের আলোকমালা দেবীর নবরাগরঞ্জিত, উজ্জ্বল চিত্রিত মুখের উপর পড়িয়া অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিতেছে ; যেন জগদম্বা ভক্তগণের ভক্তি দেখিয়া ভাবে গদগদ হইতেছেন। ঢাক ঢোল, কাড়া, কাঁসর, ঘণ্টা ও শঙ্খের ধ্বনিতে পাড়া কাঁপিযা যাইতেছে। সেই ভক্তদলের মধ্যে তর্কভূষণ মহাশয় গলে নামাবলী দিয়া গলবস্ত্রে ও করজোড়ে দণ্ডায়মান ; মুখে শব্দ নাই, নেত্রদ্বয় নিমীলিত ; তৎপ্রান্ত দিয়া ভক্তি অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতেছে। অনেক লোক সন্ধ্যাকালে আরতি দেখা যত না হউক, তাঁহার সেই প্রেমোজ্জ্বল মুখ দেখিবার জন্য আসিত।

## (ঙ) মীর মশারফ হোসেন

বঙ্কিমযুগের অন্যান্য লেখকের মতো খ্যাতিলাভ না করলেও মীর মশারফ হোসেনের নাম বাংলা গদ্যের ইতিহাসে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা পদ্ধতির অনুসরণে, যে রীতিতে তিনি 'বি ষা দ সি ন্ধু' নামক ঐতিহাসিক গদ্যকাব্য রচনা করে গেছেন তা উপাদেয়। বাংলা সাহিত্যের আদিযুগ থেকে বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে যাঁরা সাহিত্য সাধনায় ব্রতী হয়েছেন তাঁদের মধ্যে মীর সাহেব সর্বাপেক্ষা কৃতী। তাঁর লেখার গুণে সুদূর আরব ভূমির একটী সুপ্রাচীন কাহিনী হিন্দুমুসলমান নির্বিশেষে বাঙালী পাঠকের নিকট একান্ত হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠেছে। 'বিষাদসিন্ধু'র সাহিত্যিক গুণাগুণ বিবেচনা করার স্থান এ নয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও এর গদ্যের উৎকর্ষ বিচারের জন্য একথা জানা দরকার যে, এ পুস্তকের রচনায় উচ্চাঙ্গের শিল্পকৌশল বর্তমান। গদ্যরচনার নৈপুণ্যের জন্যেই যে, তাঁর শিল্পকৌশল দেখানো সহজ হয়েছিল এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। নিচে 'বিষাদসিন্ধু'র গদ্যের কিছু নমুনা উদ্ধৃত হ'ল :—

"ঈশ্বরের মহিমার অন্ত নাই। একটী সামান্য বৃক্ষপরি তাঁহার শত সহস্র মহিমা প্রকাশ পাইতেছে। একটি পতঙ্গের ক্ষুদ্র পালকে তাঁহার অনন্ত শিল্পকার্য্য বিভাসিত হইতেছে। অনন্ত বালুকারাশির একটী ক্ষুদ্র বালুকাকণাতে তাঁহার অনন্ত করুণা আঁকা রহিয়াছে। তুমি আমি সে করুণা হয়ত জানিতে পারিতেছি না, কিন্তু তাঁহার লীলাখেলার মাধুর্য্য, কীর্ত্তিকলাপের বৈচিত্র্য, বিশ্বরঙ্গভূমির বিশ্বক্রীড়া একবার পর্য্যালোচনা করিলে ক্ষুদ্র মানববুদ্ধি বিচেতন হয়। তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া অণুমাত্রও বুঝিবার ক্ষমতা মানবী বুদ্ধিতে সুদুর্লভ! সেই অব্যর্থ কৌশলীর কৌশলচক্র ভেদ করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করে কাহার সাধ্য? ভবিষ্যদ্‌গর্ভে কি নিহিত আছে কে বলিতে পারে?

কোন্ বুদ্ধিমান বলিতে পারেন যে মুহূর্ত্ত অন্তে তিনি কি ঘটাইবেন ? কোন মহাজ্ঞানী পণ্ডিত তাঁহার কৌশলের কণামাত্র বুঝিয়া তদ্বিপরীত কার্য্যে সক্ষম হইতে পারেন ? জগতে সকলেই বুদ্ধির অধীন, কিন্তু ঈশ্বরের নিয়োজিত কার্য্যে বুদ্ধি অচল, অক্ষম, অস্ফুট এবং অতি তুচ্ছ। ষষ্টি সহস্র লোক হোসেনের সঙ্গে কুফায় যাইতেছে, সূর্য্যদেব পথ দেখাইতেছেন, তরু পর্ব্বত নির্ঝরিণী পথের চিহ্ন দেখাইয়া লইয়া যাইতেছে, কুফার পথ পরিচিত, কতলোক তন্মধ্যে রহিয়াছে, কত লোক সেই পথে যাইতেছে, চক্ষু বন্ধ করিযাও তাহারা কুফা যাইতে অসমর্থ নহে। সর্ব্বশক্তিমান্ পূর্ণ কৌশলীর কৌশলে আজ সকলেই অন্ধ—চক্ষু থাকিতেও অন্ধ। * * * * * * হোসেন মহানন্দে কুফায় যাইতেছেন—ভাবিতেছেন কুফায যাইতেছি, কিন্তু কিন্তু ঈশ্বর তাঁহাকে পথ ভুলাইয়া বিজন বন কারবালায় লইয়া যাইতেছেন। তাহা তিনি কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছেন না।”

উদ্ধৃতাংশের গদ্যের মধ্যে বেশ একটি সহজ গতি ও ওজস্বিতা বিদ্যমান। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের রীতির অনুসরণ করলেও এ গ্রন্থকারের রচনায় কখনো দীর্ঘ সমাসবদ্ধ পদের প্রাচুর্য দেখা যায় না। তার ফলেও রচনা সরল হয়েছে। নিচে তাঁর বই-এর আর একটি অংশ উদ্ধৃত করা গেল। এটি দেখলে বোঝা যাবে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব মশারফ হোসেনের উপর কত বেশি।

“আবার একি দেখিতেছি। এখনই দেখিলাম, আবার এখনই বা কি দেখিতেছি। এই কি সেই বন্দীগৃহ। যে বন্দীগৃহের কথা মনে পড়িলে অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠে, হৃদয়ের শোণিতাংশ জলে পরিণত হয়, এই কি সেই বন্দীগৃহ, যে সূর্য্যাধিকারে একবার দেখিয়াছি, এখনও সে অধিকার বিলুপ্ত হয় নাই, এখনও সে লোহিত সাজে সাজিয়া পররাজ্যে দেখা দিতে জগৎচক্রে চক্ষুর অন্তরাল হয় নাই, ইহার মধ্যে এই দশা। এত পরিবর্ত্তন। কৈ সে যমদূত প্রহরী কৈ? সে নির্দ্দয় নিষ্ঠুরেরাই বা কোথায় ? শাস্তির উপকরণ, লৌহশলাকা, জিঞ্জির, কটাহ, মুষল, সকলই পড়িয়া আছে। জীবন্ত

জীব কোথায় ? কৈ কাহাকেও ত দেখিতেছি না ? কেবল দেখিতেছি জীবনশূন্য দেহ আর কর্ম্মশূন্য মানব শরীর।

কেন নাই ? এদিকে একটী প্রাণীও নাই। যেদিকে থাকিবার সে দিকে আছে। প্রভু হোসেন পরিবার যে দিকে বন্দী, সে দিকের কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। সেই কণ্ঠনিনাদ, সেই স্ত্রীকণ্ঠে আর্ত্তবিলাপ, সেই মর্ম্মান্তিক বেদনাযুক্ত গত কথা, কিন্তু ভাব ভিন্ন, অর্থ ভিন্ন, কণ্ঠ ভিন্ন।"

উল্লিখিত অংশে যে একটী নাটকীয় ভঙ্গী ও চমৎকারিতা দেখা যায় তা 'বিষাদ সিন্ধুর' রচনায় পুনঃপুন চোখে পড়ে। তারি ফলে গ্রন্থকার বিশেষভাবে কৃতকার্যতা লাভ করেছেন। তাঁর এ গ্রন্থ যে বহুকাল যাবৎ বাঙালী পাঠকদের প্রিয় হয়ে থাকবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

# একবিংশ অধ্যায়

## রবীন্দ্রযুগ ( ১৮৯২—১৯৪১ )

### সাধনা বঙ্গদর্শন-পর্ব ( ১৮৯২—১৯১১ )

রবীন্দ্রনাথের হাতেই ঘটেছে বাংলা গদ্যের সর্বোত্তম বিকাশ। বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্য যে তাঁর কালের লোকদের মনে এক বিস্ময়মিশ্রিত সমুচ্চ প্রশংসার উদ্রেক করেছিল, এর সবখানিই তাঁর গদ্যরচনা-প্রতিভার ফল নয়। তাঁর নবসৃষ্ট মনোরম উপন্যাসাবলি পাঠকসাধারণের স্বাভাবিক গল্পপ্রিয়তা চরিতার্থ ক'রেই লেখকের সাহিত্যিক যশকে কিয়ৎপরিমাণে বিপুলতা দান করেছিল। এ সত্ত্বেও বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্য যে অনেক দিক দিয়ে প্রশংসনীয় সে সম্বন্ধে মতভেদ নেই, এবং সে প্রশংসার কয়েকটী কারণ ইতিপূর্বে দেখান হয়েছে। তবু বঙ্কিমচন্দ্র যে, বাংলা গদ্যের সহজ রূপটি বা তার অন্তর্নিহিত শক্তি, ষোলআনা রকমে ধরতে পেরেছিলেন তা মনে হয় না। তাঁর 'বিষবৃক্ষ'াদি উপন্যাসাবলিতে সংস্কৃতশব্দ বা সমাসবদ্ধ পদের বাহুল্য অনেক পরিমাণে ক'মে গেলেও, পাঠকবর্গের চমৎকৃতি উৎপাদনের জন্যে তিনি প্রায়শ সংস্কৃতশব্দময় বা দীর্ঘসমাসযুক্ত ভাষা ব্যবহার করেছেন। এ ব্যাপার থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, খাটি বাংলা ধরণের বাক্যের চেয়ে কিয়দংশে সংস্কৃতানুকারী বাক্যের শক্তির উপরেই বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রদ্ধা ছিল অপেক্ষাকৃত বেশি। কিন্তু এ পক্ষপাতের জন্যে তাঁকে খুব বেশি দায়ী করা সঙ্গত হবে না; কারণ যে সাহিত্যিক আবহাওয়ার মধ্যে তিনি পরিবর্ধিত, তাতে সংস্কৃতবিলাসী পণ্ডিতী গদ্যের ছিল প্রচণ্ড প্রতাপ। আর যে স্কট্ ( Sir Walter Scott.) হয়ত তাঁর উপন্যাস রচনার আদর্শ, তাঁর লেখার প্রচুর ল্যাটিন শব্দমিশ্রিত গুরুগম্ভীর ইংরেজীও, হয়ত এই সংস্কৃতগন্ধী পণ্ডিতী গদ্যের প্রভাবকে দৃঢ়তর করবার সাহায্য ক'রে থাকবে। সে যাই হোক, বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যিক প্রতিভার মহাত্ম্য এজন্যে কমে যায় না, কারণ বাংলা গদ্যের যে পরিমাণ

শক্তি সাহিত্যের কাজে লাগিয়ে তিনি দেশবাসীকে চমৎকৃত করেছিলেন, তা তাঁর আগে প্রায় সকলেরি কাছে অনাবিষ্কৃত ছিল, এবং যে রবীন্দ্রনাথের হাতে বাংলা গদ্যের অন্তর্নিহিত শক্তি নানা বিচিত্ররূপে আত্মপ্রকাশ করেছে তিনিও বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যভূমিতে প্রথম পদচারণা শিক্ষা করেন।

যদিও 'হিতবাদী' এবং 'সাধনা' প্রকাশের বছর ( বাং ১২৯৮ ) থেকেই রবীন্দ্রনাথের গদ্যে এক অভিনব সৌন্দর্যের লক্ষণ অজস্রভাবে দেখা দিয়েছিল, তাঁর নিজস্ব গদ্যরীতিটি পরিস্ফুট হয়েছিল আরো কয়েক বছর আগে। ১৮৭৯–৮০ সালের (বাং ১২৮৬) 'ভারতী'তে তিনি 'য়ু রো প-প্র বা সী র পত্র' নামে যে পত্রাকার প্রবন্ধনিচয় প্রকাশ করেছিলেন, তাতেই সর্বপ্রথমে দেখা গেল, সম্পূর্ণরূপে বঙ্কিমচন্দ্রের পথে না চ'লেও ভালো বাংলা গদ্য লেখা যায়। কিন্তু এ প্রবাসযাপনের কাহিনী চল্‌তি ভাষায় রচিত। এ ঘটনার প্রায় বারো বছর পরে ( ১৮৯১—৯২ ) তিনি 'য়ু রো প যা ত্রী র ডা য়া রী' নামে যে ভ্রমণকাহিনী 'সাধনা'য় প্রকাশ করেন তাতেও এ চল্‌তি ভাষা ব্যবহৃত হয়েছিল। কিন্তু তখনকার দিনে ছিল তথাকথিত সাধুভাষার প্রবল প্রতাপ। তাই 'সবুজপত্র' যুগ শুরু হওয়ার আগে পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের আর কোনও মুখ্য গদ্য রচনায় ( চিঠিপত্রাদি ছাড়া ) চল্‌তি ভাষা চলে নি। এমনকি 'বৌ ঠা কু রা ণী র হা ট' (১৮৮১—৮২ ) নামক উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ পাত্রপাত্রীদের মুখের কথায়ও দিয়েছেন সাধুভাষা, আর 'চো খে র বা লি' তে (১৯০১—১৯০২) এবং 'নৌ কা ডু বি তে'ও তিনি একাজ করেছেন। এ কারণে রবীন্দ্রযুগের ( প্রায় সাধুভাষাময় ) আদ্য পর্বের সম্পর্কে 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্রে'র আলোচনা কিয়ৎপরিমাণে অপ্রাসঙ্গিক মনে হ'তে পারে, কিন্তু সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখলে তা হওয়া উচিত নয়। সাহিত্যের যে চল্‌তি ভাষা, তা সর্বত্র বা সর্বাংশে ঠিক মুখের কথার অনুরূপ নয়। মাঝে মাঝে একটু সামান্য ( যেমন ক্রিয়া সর্বনামাদি ) রদবদল করলেই চল্‌তি ভাষার এ নমুনাকে সাধু ভাষায় রূপ দেওয়া চলে। তাই 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র' থেকে নিচে যে অংশটি উদ্ধার করা হল, তার থেকে রবীন্দ্রনাথের গদ্য-রীতির প্রথম বিকাশটি বেশ সুস্পষ্ট বোধগম্য হবে।

"দেখো, সমুদ্রের উপর আমার কতকটা অশ্রদ্ধা হয়েছে। কল্পনায় সমুদ্রকে যা মনে করতেম, সমুদ্রে এসে দেখি তার সঙ্গে অনেক বিষয় মেলে না। তীর থেকে সমুদ্রকে খুব মহান্ বলে মনে হয়, কিন্তু সমুদ্রের মধ্যে এলে আর ততটা মনে হয় না। তার কারণ আছে আমি যখন বম্বের উপকূলে দাঁড়িয়ে সমুদ্র দেখতেম, তখন দেখতেম দূরদিগন্তে গিয়ে নীল জল নীল আকাশে মিশিয়ে গিয়েছে, কল্পনায় মনে করতেম যে, একবার যদি ঐ দিগন্তের আবরণ ভেদ করতে পারি, ঐ দিগন্তের যবনিকা ওঠাতে পারি অমনি আমার সম্মুখে এক অকূল অনন্ত সমূদ্র একেবারে উথলে উঠবে। ঐ দিগন্তের পর যে কি আছে তা আমার কল্পনাতেই থাকত ; তখন মনে হত না যে, ঐ দিগন্তের পরে আর এক দিগন্ত আসবে। কিন্তু যখন সমুদ্রের মধ্যে এসে পড়ি তখন মনে হয় যে, জাহাজ যেন চলছে না, কেবল একটি দিগন্তের গণ্ডীর মধ্যে বাঁধা আছে। আমাদের কল্পনার পক্ষে সে দিগন্তের সীমা এত সংকীর্ণ যে কখন তৃপ্তি হয় না।"

উল্লিখিত স্থলটির রচনারীতি সর্বাঙ্গসুন্দর না হলেও, এতে রবীন্দ্রনাথের গদ্যের মূলগত লক্ষণ বেশ সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

অতিদীর্ঘ সমাসের বর্জন, শব্দপ্রয়োগের লালিত্য এবং অনুচ্ছেদের অন্তর্গত বাক্য প্রবাহের স্বাভাবিক গতি ও শ্রুতিমাধুর্য (ছন্দমূলক), এ সকলই হ'ল রবীন্দ্রনাথের গদ্যের সাধারণ মূলগত লক্ষণ। 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্রে'র পর তিনি সাধুভাষায় বা চলতি ভাষার যে সকল গদ্য-রচনা প্রকাশ করেছিলেন, তার মধ্যে এই লক্ষণ ক্রমশ সুস্পষ্টতর হয়ে চলেছে। তাঁর গদ্যরীতির বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করতে হলে এই লক্ষণ সম্বন্ধে বেশ পরিষ্কার জ্ঞান থাকা আবশ্যক। তাই বিষয়টিকে নিচে দৃষ্টান্ত সহকারে বিশদভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা যাচ্ছে।

রবীন্দ্রনাথের সমগ্র গদ্যরচনায় পণ্ডিতী ধরণের দীর্ঘ সমাস বিরল। চার বা ততোধিক পদের সমাস এতে একান্তই দুর্লভ। তিন পদের সমাস খুব সুলভ নয়। তবে স্থলবিশেষে দুই একটি অনুচ্ছেদে রবীন্দ্রনাথ চার পদের বা তিন পদের সমাস ব্যবহার করেছেন, কিন্তু শব্দচয়নকৌশলে ও

ছন্দঅনুভূতির ফলে তাঁর সে সমাস, গদ্যকে আড়ষ্টগতি বা শ্রুতিকটু ক'রে তোলে নি, বরং তাতে বৈচিত্র্যসঞ্চার ক'রে সমগ্র প্রবন্ধের শোভা বৃদ্ধি করেছে। নিচে এর একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি :—

"লাবণ্যলেখা পশ্চিম প্রদেশের নবশীতাগমসম্ভূত স্বাস্থ্য এবং সৌন্দর্য্যের অরুণে পাণ্ডুবে পূর্ণ পরিস্ফুট হইয়া নির্ম্মল শরৎকালের নির্জ্জন নদীকূললালিতা অম্লানপ্রফুল্লা কাশবনশ্রীর মত হাস্যে ও হিল্লোলে ঝলমল করিতেছিল।" (গল্পগুচ্ছ)

"অকালবসন্তে রক্তবর্ণ অশোককুঞ্জে মদনদাহনের দীপ্ত দেবরোষাগ্নিচ্ছটায় নতমুখী লজ্জারুণা গিরিরাজকন্যা তাঁহার সমস্ত ব্যর্থ পুষ্পাভরণ বহিয়া পাঠকের ব্যথিত হৃদয়ের করুণ রক্তপদ্মের উপর আসিয়া দাঁড়াইতেন,—অকৃতার্থ প্রেমের বেদনা তাঁহাকে চিরকালের জন্য ঘেরিয়া থাকিত। এখনকার সমালোচকের মতে এইখানেই কাব্যের উজ্জ্বলতম সূর্য্যাস্ত, তাহার পর বিবাহের রাত্রি নিতান্ত বর্ণচ্ছটাহীন।" (প্রাচীন সাহিত্য)

উল্লিখিত স্থলদুটিতে তিন বা চার পদের সমাস দুএকটি থাকলেও দুই পদের সমাস তার চেয়ে একটু বেশি। কিন্তু এই দুটি পদের সমাসও রবীন্দ্রনাথ খুব অজস্রভাবে ব্যবহার করেন নি; বিষয়ের খাতিরেই ক্বচিৎ তা নিতান্ত স্বল্পপরিমাণে তাঁর গদ্যে প্রযুক্ত হয়েছে। নিচের দৃষ্টান্তটি থেকে একথা বোঝা যাবে :—

"জয়সিংহের সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হইল না। * * * জয়সিংহের মনে অনিবার্য্যবেগে এমন সকল কথা উঠিতে লাগিল যাহা তাঁহার আশৈশব বিশ্বাসের মূলে অবিশ্রাম আঘাত করিতে লাগিল। জয়সিংহ পীড়িত ক্লিষ্ট হইতে লাগিলেন।

* * * * *

তাহার পরদিন যে প্রভাত হইল তাহা অতি মনোহর প্রভাত। বৃষ্টির শেষ হইয়াছে। পূর্ব্বদিকে মেঘ নাই। সূর্য্যকিরণ যেন বর্ষার জলে ধৌত ও স্নিগ্ধ। বৃষ্টিবিন্দু ও সূর্য্যকিরণে দশদিক্ ঝলমল করিতেছে। শুভ্র আনন্দপ্রভা আকাশে প্রান্তরে অরণ্যে নদীস্রোতে

বিকশিত শ্বেত শতদলের ন্যায় পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। নীল আকাশ চোল ভাসিয়া যাইতেছে। ইন্দ্রধনুর তোরণের নীচে দিয়া বকের শ্রেণী উড়িয়া চলিয়াছে। * * * * * গোরুগুলি আজ মনের আনন্দে মাঠময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। রাখাল গান ধরিয়াছে। কলসকক্ষ মায়ের আঁচল ধরিয়া আজ ছেলেমেয়েরা বাহির হইয়াছে। বৃদ্ধ পূজার জন্য ফুল তুলিতেছে। স্নানের জন্য নদীতে আজ অনেক লোক সমবেত হইয়াছে। কলকলস্বরে তাহারা গল্প করিতেছে, নদীর কলধ্বনিরও বিরাম নাই। আষাঢ়ের প্রভাতে এই জীবময়ী আনন্দময়ী ধরণীর দিকে চাহিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া জয়সিংহ মন্দিরে প্রবেশ করিলেন।" (রাজর্ষি)

এর চেয়ে বেশি দ্বিপদী সমাসযুক্ত অনুচ্ছেদ রবীন্দ্রনাথের গদ্যে কখনো কখনো পাওয়া যায়, কিন্তু সেগুলির সংখ্যা খুব বেশি নয়। নিচে তাদের একটি দৃষ্টান্তরূপে উদ্ধৃত হ'ল :—

"সেই ভাবগম্ভীর মুখ, সেই নির্ম্মল ললাটের উপর জলভারনম্র নবনীরদের মত স্তম্ভিত কেশরাশি, সেই সুকুমার গ্রীবা, সেই তরুণ তনুদেহে কোমল শাড়িটীর তরঙ্গিত অঞ্চলরেখা, সেই স্নিগ্ধ বিশ্বস্ত দৃষ্টির নিবিড় একাগ্রতা আজ সায়াহ্নের ম্লানিমা হইয়া, সন্ধ্যাতারার সুদূরতা হইয়া, তরুপ্রচ্ছন্ন গ্রামের নিভৃত নিস্তব্ধ বিশ্রাম হইয়া, জনশূন্য বালু-তটের দিগন্তবিস্তৃত পাণ্ডুরতা হইয়া বিশাল প্রকৃতির মূকবৎ অব্যক্ত ভাষায় জলে স্থলে, আকাশে—চন্দ্রের অস্ফুট আলোকে ও বনের প্রচ্ছন্নচ্ছায়ায়—নদীর স্তিমিত গোপন গতিতে ও তটভূমির তিমিরাচ্ছন্ন গম্ভীর নিশ্চলতায় অপরূপভাবে ভাষান্তরিত হইতে লাগিল।"

(নৌকাডুবি)

সমাসাড়ম্বর বাক্যের স্বাভাবিক ছন্দস্রোত বা প্রাঞ্জলতার ব্যাঘাত জন্মালেও এক জায়গায় এর যথেষ্ট উপযোগিতা আছে। অল্প কথায় অনেক বেশি ভাব বা বৃহৎ চিত্র প্রকাশ করতে হ'লে দীর্ঘ সমাস ব্যবহার করা সুবিধাজনক। এরূপ সমাসাড়ম্বর না ক'রেও রবীন্দ্রনাথ এক চমৎকার উপায়ে দীর্ঘ সমাস ব্যবহারের সুবিধাটুকু গ্রহণ করেছেন। যেখানে

প্রয়োজন মনে করেছেন, সেখানেই তাঁর গদ্যে দেখা দিয়েছে পর পর দুই ( বা কদাচিৎ ) তিনপদের একাধিক সমাস। তার ফলে রচনা দৈর্ঘ্যে স্ফীত বা আড়ষ্ট হয় নি অথচ অর্থপ্রাচুর্য ঘটেছে। নিচে এর কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হ'ল :—

"কিন্তু আমার সেই নির্লজ্জ নিরাবরণ নিরাভরণ চিরবৃদ্ধ কঙ্কাল তোমার কাছে আমার নামে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছে।" ( গল্পগুচ্ছ )

"তাহার হৃৎপিণ্ডের মধ্যে যে এক মৃদু কম্পন উপস্থিত হইয়াছিল সেই কম্পনাবেগে এই আলোকময়, লোকময়, বাদ্যসঙ্গীতমুখরিত, দৃশ্যপটশোভিত, রঙ্গভূমি তাহার চক্ষে দ্বিগুণ অপরূপতা ধারণ করিল। তাহার সেই প্রাচীরবেষ্টিত নির্জ্জন নিরানন্দ অন্তঃপুর হইতে এ কোন এক সুসজ্জিত সুন্দর উৎসবলোকের প্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইল!" ( গল্পগুচ্ছ )

সুদীর্ঘ সমাস পরিহার করার ফলে রবীন্দ্রনাথের গদ্যে অনুচ্ছেদমধ্যবর্তী বাক্যসমূহের স্বাভাবিক গতি ও ছন্দ বাধা পায় নি, এবং এ দিকে তার কবিসুলভ দৃষ্টিও গতিমাধুর্য সঞ্চার করেছে। গদ্যে পদলালিত্য সঞ্চারও তাঁর ঐ কবিজনোচিত রুচিরই ফল। উপরের যে কয়টি দৃষ্টান্ত তাঁর গদ্য থেকে উদ্ধৃত হয়েছে, সে সকলের মধ্য থেকেই অনায়াসে এ কথার প্রমাণ মিলবে। কিন্তু এই যে, লক্ষণের কথা বলা হ'ল এতেই রবীন্দ্র নাথের গদ্যরীতির সর্বোত্তম বিকাশ পর্যবসিত হয় নি। এ হ'ল তাঁর গদ্যের কাঠামোটির মূলগত লক্ষণমাত্র। এই কাঠামোটির উপর শব্দসমাবেশের বৈচিত্র্যে ও নানা অলঙ্কারাদির যোগে, রবীন্দ্রনাথের গদ্য তাঁর নানা-বিষয়িণী রচনায় বহুবিচিত্র ভঙ্গীতে রূপ ও রসের সৃষ্টি করেছে। সে সকলের নিরবশেষ বিশ্লেষণ ও আলোচনা বর্তমান প্রবন্ধে করা সম্ভবপর নয়। কারণ সেরূপ চেষ্টা করতে গেলে আলোচ্য বিষয় থেকে বহুদূরে চ'লে যাওয়ার সম্ভাবনা, এবং এরূপ চেষ্টা যথার্থভাবে রবীন্দ্ররচনার শিল্পকৌশল সম্বন্ধীয় আলোচনারই অঙ্গীভূত হতে পারে। রবীন্দ্রনাথ গদ্যের ভিতর কী কী বিশেষত্ব কেমন ক'রে আনলেন, সে সম্বন্ধে মোটামুটি আলোচনাই উপস্থিত ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত হবে। সাধারণ গদ্যের প্রকৃতি এই

যে, এতে লোকের হৃদয়াবেগ সাড়া দেয় না; গদ্যের অর্থগ্রহণ করা বুদ্ধিরই কাজ। সেজন্য কাব্যানুভবহীন বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে বর্ণনা করবার বেলায় অনেক সময় বলা হয়ে থাকে যে, এ ব্যক্তি নিতান্ত 'গদ্যময়'। কিন্তু যথার্থ সাহিত্য কেবল বুদ্ধিবৃত্তির ভরসা ক'রে বাঁচতে পারে না, অথবা নিছক বুদ্ধিবৃত্তির তাড়ায় তার জন্ম নয়, এবং তার জীবনপ্রবাহের অবিচ্ছিন্নতা রক্ষা ব্যাপারেও বুদ্ধিবৃত্তি ষোল আনা সাহায্য করতে পারে না। সেই জন্যে, যে গদ্য, সাহিত্যে ব্যবহৃত হবে, প্রয়োজনমত কল্পনা জাগাবার বা হৃদয়াবেগ সৃষ্টি করবার ক্ষমতা তার থাকা চাই। বাংলার কোনো সাহিত্যিকই এই তত্ত্বটি রবীন্দ্রনাথের মতো তেমন ভালো ক'রে বোঝেন নি। তারি ফলে বাংলা গদ্য তাঁর হাতে লাভ করেছে এক অতি অভাবনীয় সমৃদ্ধি। কী কী কৌশলে তিনি বাংলা গদ্যকে অনুপম সৌন্দর্য দান ক'রে সর্বত্র অভিনন্দনের যোগ্য করেছেন তা মোটামুটিভাবে এখানে আলোচিত হবে।

রবীন্দ্রনাথের গদ্যের সামান্য লক্ষণটির সঙ্গে সঙ্গেই চোখে পড়ে তাঁর বিশেষণ প্রয়োগের কৌশল। যথাস্থানে যথোচিত ভাবে বিশেষণ প্রয়োগের কাজে তাঁর নৈপুণ্যের অবধি নেই। প্রায়শ সংযোজকবিহীন একাধিক বিশেষণ —কি পূর্ববর্তী ( attributive ) কি পরবর্তী ( predicative )— বসিয়ে তিনি বিশেষ্যে চমৎকার অর্থগত দীপ্তি দান করেছেন। যেমন, পূর্ববর্তী বিশেষণের দৃষ্টান্ত :—

> "গৌরতনু সৌম্যোজ্জ্বল মুখচ্ছবি, দীর্ঘকায় এক নবীন সন্ন্যাসী, দীর্ঘ শুভ্র পুণ্যতনু, ঈষৎতপ্ত সুকোমল বাতাস, জনহীন তরুচ্ছায়ায় নিমগ্ন মধ্যাহ্ন, বৃষ্টিধৌত মসৃণ চিক্কণ তরুপল্লব, রৌদ্রশুভ্র স্তূপাকার মেঘস্তর, নির্ব্বোধ সর্ব্বকর্ম্মপণ্ডকারী নবদ্বীপের অনাবশ্যক বাপ, নিদ্রাহীন অশ্রান্ত পাপিয়া, চন্দ্রালোকপ্লাবিত অসীম শূন্য, সূর্য্যচন্দ্রালোকিত লোকপরিপূর্ণ পৃথিবী, সহস্র ফেনশুভ্র কোমল করতল, ইষ্টকজর্জ্জর অপরিচ্ছন্ন ঘেঁষাঘেঁষি বাড়িগুলি, নিদ্রাহীন নির্নিমেষ নতনেত্র, উচ্ছ্বসিত উচ্চ মধুর কণ্ঠ, রৌদ্রোজ্জ্বল নির্ম্মল চঞ্চল নির্ঝরিণী, সজল শ্যাম নবমেঘ।

পরবর্তী বিশেষণের দৃষ্টান্ত :—

"* * তাহারাই পুরাতন কালকে স্নেহপাশে বাঁধিয়া চিরদিন নূতন করিয়া রাখিয়াছে।" ( গল্পগুচ্ছ )

"শরীর দীর্ঘ পরিস্ফুট সুস্থ সবল।" ( গল্পগুচ্ছ )

"যাত্রার আরম্ভকালে সুচিক্কণ বনশ্রী রৌদ্রে উজ্জ্বল হাস্যময় ছিল। ( গল্পগুচ্ছ )

"ঐ যে সমস্ত সংসার হইতে স্বতন্ত্র সুদৃশ্য সমুচ্চ সুন্দর বেদিকা, স্বর্ণলেখায় অঙ্কিত, অসংখ্য মুগ্ধদৃষ্টি দ্বারা আক্রান্ত, 'নেপথ্যভূমির গোপনতার দ্বারা অপূর্ব্ব রহস্যপ্রাপ্ত, উজ্জ্বল আলোকমালায় সর্ব্বসমক্ষে সুপ্রকাশিত,—বিশ্ববিজয়িনী সৌন্দর্য্যরাজ্ঞীর পক্ষে এমন মায়াসিংহাসন আর কোথায় আছে ?" ( গল্পগুচ্ছ )

"* * * সমস্তই যেন সজীব, স্পন্দিত, প্রগল্‌ভ, আলোক-উদ্ভাসিত নবীনতার সুচিক্কণ, প্রাচুর্য্যে পরিপূর্ণ।" (গল্পগুচ্ছ )

"সে পথ নবাবী পথ নহে, কিন্তু পথ—সে পথে মানুষ চিরকাল চলিয়া আসিতেছে—তাহা বন্ধুর বিচিত্র সীমাহীন, তাহা শাখাপ্রশাখা-বিভক্ত, তাহা সুখে দুঃখে বাধাবিঘ্নে জটিল।" ( গল্পগুচ্ছ )

রবীন্দ্রনাথের গদ্যের বিশেষণ প্রয়োগের নৈপুণ্যের পরেই লক্ষ্যগোচর হয় তাঁর অ ল ঙ্কা র প্র য়ো গে র কৌ শ ল। শব্দালঙ্কারই এ প্রসঙ্গে সর্বাগ্রে বিবেচ্য। রবীন্দ্রনাথের গদ্যে শব্দালঙ্কার খুবই অনায়াসপ্রাপ্য নয়, অর্থাৎ তিনি চেষ্টাচরিত্র ক'রে এ জাতীয় কোন অলঙ্কার তাঁর গদ্যে আমদানি করেন নি। শব্দালঙ্কারের বাড়াবাড়ি যে, অতি অশোভন, ও রচনার সৌন্দর্যের হানিকারক, তা তিনি খুব অল্প বয়সেই বুঝেছিলেন। কিন্তু এ সত্ত্বেও স্থানে স্থানে শব্দালঙ্কার ( বিশেষ ক'রে অনুপ্রাস ) তাঁর গদ্যে অযাচিতভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। তার ফলে ঘটেছে রচনার রসোদ্রেকক্ষমতার বিশেষ প্রসার। নিচে এর কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হচ্ছে :

"পাখীরা নীড়ে ফিরিয়া আসিয়া যখন কলরব বন্ধ করিয়া সচ্ছন্দে সন্ধ্যার শান্তির মধ্যে আত্মসমর্পণ করিল, তখন বেশ বুঝিতে পারিলাম

পাখীদের মধ্যে রসিক লেখকদের দল নাই এবং সুরুচি লইয়া তর্ক হয় না।" (গল্পগুচ্ছ)

"অপমানে এবং অবসাদে অবনত হইয়া বিন্ধ্য শ্বশুরবাড়ীতে ফিরিয়া আসিল।" (গল্পগুচ্ছ)

"উভয়ে পরস্পর নিকটবর্ত্তী হইয়া নীরব শোকের ছায়াতলে সুগভীর সহিষ্ণুতার সহিত সংসারের সমস্ত তুচ্ছতম কার্য্যগুলি পর্য্যন্ত স্বহস্তে সম্পন্ন করিয়া যাইতে লাগিল।" (গল্পগুচ্ছ)

"সেদিন শরতের শিশির এবং প্রভাতের রৌদ্রে নদীতীরে বিকশিত কাশবনটি ঝলমল করিতেছিল। তাহার মধ্যে সেই সরল নবীন মুখখানি কান্তিচন্দ্রের মুগ্ধ চক্ষে আশ্বিনের আসন্ন আগমনীর একটি আনন্দচ্ছবি আঁকিয়া দিল।" (গল্পগুচ্ছ)

উল্লিখিত স্থলগুলিতে অনুপ্রাসের কিঞ্চিৎ প্রাচুর্য দেখা গেলেও, এ অনুপ্রাস এত কৃত্রিমতার চিহ্নহীন যে, তাতে রচনার সৌন্দর্য ক্ষুণ্ন না হয়ে বৃদ্ধিই পেয়েছে। কিন্তু সাধারণত রবীন্দ্রনাথের গদ্যে যে অনুপ্রাস পাওয়া যায়, তাতে প্রায়ই কোন একটি অক্ষরের দুই তিন বারের বেশি অনুবৃত্তি থাকে না, এজন্যে উহা চোখেই পড়ে না, অথচ তার দ্বারা রচনার সুশ্রব্যতা বৃদ্ধি পায়।

অনুপ্রাস যদি প্রযত্নকৃত হয় তবে তাতে আর শ্রুতিসুখকরত্ব থাকে না। পণ্ডিতী রীতির লেখকদের এ বিষয়ে বোধ ছিল নিতান্তই অল্প। রবীন্দ্রনাথের সময়ে এ শ্রেণীর গদ্য লেখকদের সংখ্যা খুব ক'মে গেলেও অনুপ্রাসকণ্টকিত ভাষার রুচি তখনো একেবারে দূর হয় নি। তাই তিনি এ অনুপ্রাসবাহুল্য নিয়ে এক জায়গায় একটু হাস্যরস সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন। নিচে এ রচনার কিয়দংশ উদ্ধৃত হ'ল :—

"আমাদের * * * বঙ্গসাহিত্যকুঞ্জের গুঞ্জোন্মত্ত কুঞ্জবিহারীবাবু কলম ধরিয়াছেন ; অতএব প্রাচীনভারত সাবধান ! কোথায় খোঁচা লাগে কি জানি ! অপোগণ্ডের যদি কাণ্ডজ্ঞান থাকিবে তবে নিজের সুধাভাণ্ডে দণ্ডপ্রহার করিতে প্রবৃত্তি হইবে কেন ?" (সাহিত্য, ২য় বর্ষ)

অনুপ্রাস ছাড়াও যমকশ্লেষাদি শব্দালঙ্কার রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার

করেছেন, কিন্তু সে গুলি তাঁর রচনায় এত ক্বচিৎ দৃষ্টিগোচর হয় যে, সে সম্বন্ধে আলোচনা প্রায় নিষ্প্রয়োজন।

শব্দালঙ্কারের পরেই বিবেচ্য অর্থালঙ্কার। এই অর্থালঙ্কারের ব্যবহারে রবীন্দ্রনাথ অসাধারণ নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। অর্থালঙ্কারগুলির মধ্যে সর্বাগ্রে চোখে পড়ে হৃদযাবেগ বা অনুভূতি জনিত অলঙ্কার সমূহের ( figures based Emotion and Sympathy ) ব্যবহারে নৈপুণ্য।

সাধারণ, পরিচিত এবং অভ্যস্ত যে বস্তু, তাহা কল্পনাশক্তি বা হৃদয়-বৃত্তিকে প্রায়শই উদ্বোধিত করে না। গদ্যরচনা কেন, যে কোনও রচনার পক্ষে এ কথাটি বিশেষভাবে স্মরণীয়। কিন্তু পদ্যে একথা তেমন ক'রে মনে না রাখলেও ক্ষতি নেই। মনোজ্ঞ ছন্দের গ্রন্থনে, চিরপরিচিত শব্দাবলিও হৃদয়কে খানিকটা নাড়া দিতে পারে। কিন্তু গদ্যকে শক্তিমান করতে হ'লে এতে শব্দপ্রয়োগের বৈশিষ্ট্য নিতান্ত দরকার। রবীন্দ্রনাথ শব্দব্যবহারে কী কী কৌশল অবলম্বন করেছেন, সংক্ষেপে সে সকল বোঝবার চেষ্টা করা যাচ্ছে :—

ভাববোধক বা গুণবোধক শব্দকে যদি বস্তুবোধক শব্দের মতো ক'রে নেওয়া যায়, তবে সেটার অর্থ পাঠকের বা শ্রোতার চিত্তে সহজেই মূর্তি পরিগ্রহ করে। এরূপ ভাবে গদ্যের মধ্যে যে একটা নূতন শক্তি সঞ্চার করা যায়, তা বোধ হয় রবীন্দ্রনাথের আগে কেউ তেমন ক'রে ভাবে নি। গুটিকতক দৃষ্টান্ত দ্বারা কথাটিকে পরিস্ফুট করা যাচ্ছে :—

> "প্রকৃতির এই বিবিধ শব্দ এবং বিচিত্র গতি, ইহাও বোবার ভাষা—বড়ো বড়ো চক্ষুপল্লববিশিষ্ট সুভারই একটি বিশ্বব্যাপী বিস্তার ;" ( গল্পগুচ্ছ )
>
> "* * * কান্তি দেখিলেন, একটি স্নিগ্ধ শ্রী একটি শান্ত লাবণ্যে মুখখানি মণ্ডিত।" ( গল্পগুচ্ছ )
>
> "এই প্রকারের একটা সম্ভাবনা আকাশে ভাসিতেছিল।" ( গোরা )
>
> "জলে স্থলে আকাশে একটি বৃহৎ বেদনা বাজিয়া উঠে। ( গ্রাম্য সাহিত্য )।

উল্লিখিত দৃষ্টান্তগুলিতে 'বিস্তার', 'করুণা', 'শ্রী', 'লাবণ্য', 'সম্ভাবনা', 'বেদনা' প্রভৃতি ভাববোধক শব্দগুলির আগে 'একটা' বা 'একটি' এই বিশেষণ ব্যাবহার ক'রে এগুলিকে ইন্দ্রিয়গম্য স্থূল পদার্থের আকার দান করা হয়েছে। অপ্রাণিবাচক শব্দগুলিকে যদি প্রাণিবাচকের মতো ক'রে তোলা যায়, তাতেও অর্থের বৈচিত্র্য ঘটে।

"শরতের উৎসবহাস্যরঞ্জিত রৌদ্র সকৌতুকে শয়নগৃহের মধ্যে প্রবেশ করিল।" (গল্পগুচ্ছ)

"গঙ্গার এপার ওপারে বিদ্রোহী ঢেউগুলো কলশব্দে নৃত্য জুড়িয়া দিল এবং বাগানের বড় বড় গাছগুলা শাখা ঝট পট করিয়া হা হুতাশ করিয়া দক্ষিণে বামে লুটোপুটি করিতে লাগিল।" (গল্পগুচ্ছ)

"তাহারাও জানে না যে তাহাদের মাদকতায় তপ্তযৌবন নববসন্ত দিগ্বিদিকে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে।" (গল্পগুচ্ছ)

"* * * সেই জ্যোতি আমার উদ্বেল হৃদয়সমুদ্রের প্রত্যেক তরঙ্গের উপর কিরণের মধুর নামের একটি করিয়া জ্যোতির্ম্ময় স্বাক্ষর মুদ্রিত করিয়া দিল। (গল্পগুচ্ছ)

উল্লিখিত দৃষ্টান্তগুলির, বস্তু বা ভাববোধক শব্দনিচয়ে চেতন পদার্থের ধর্ম বেশ স্পষ্টভাবে আরোপিত হয়েছে। কিন্তু অনেক সময় তত স্পষ্ট না ক'রেও রবীন্দ্রনাথ বস্তু বা ভাবাদি বোধক শব্দের উপর চৈতন্যবত্তার আরোপ করেছেন। এই আরোপের ফলে কখনো কখনো পাশ্চাত্য অলঙ্কার-শাস্ত্রোক্ত বিশেষণবিপর্যাস ঘটেছে। নিচে রবীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত কতিপয় বিপর্যস্ত বিশেষণের ( transferred epithet ) দৃষ্টান্ত উল্লিখিত হ'ল :—

নিদ্রাহীন শয়নগৃহ, নির্ব্বাক্ বিস্ময়রাশি, উন্মত্ত সন্দেহ, স্নেহশূন্য বিরাগ, বিশ্রামনিরতা গ্রামশ্রী, নির্ল্লজ্জ আয়োজন, নির্ব্বাক নিরীহতা, অশ্রুজলপ্লাবিত মৌন, অশ্রুহীন কাতরতা, উদ্ধত অবিনয়, বিরাট বিরহী বক্ষ, উন্মত্ত মৃত্যুস্রোত, কর্ম্মহীন শরৎমধ্যাহ্ন, নির্ভীক কৌতূহল।

হৃদয়াবেগজনিত অলঙ্কারের পরেই মনে করতে হয় সাদৃশ্যবোধজনিত অলঙ্কারকে (figures based on Similarity)। এ জাতীয় অলঙ্কারের মধ্যে উপমা রূপক উৎপ্রেক্ষা আদিই হ'ল রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সব চেয়ে

বেশি ব্যবহৃত। যে সকল বস্তুর সাদৃশ্য কল্পনা ক'রে তিনি বর্ণিত বিষয়-গুলিকে স্ফুটতর করবার চেষ্টা করেছেন, তারা প্রায়ই ইতিপূর্বে অন্য লেখকের দ্বারা তেমন ভাবে ব্যবহৃত হয় নি। এ জন্যে তাঁর উপমাদির প্রয়োগ প্রায়শ সম্পূর্ণভাবে নূতন। কেবল এই নতুনত্বের জন্যে নয় সুপ্রযুক্ত হওয়ার জন্যেও রবীন্দ্রনাথের উপমাগুলি তাঁর গদ্যের বিশেষ শোভা সম্পাদন করেছে। নিচে তার কয়েকটী দৃষ্টান্ত দেওয়া যাচ্ছে :—

"ঐ দেখো একটি দীর্ঘনিশ্বাস পূজার সুগন্ধি ধূপধূমের ন্যায় সন্ধ্যার বাতাসে মিশাইরা গেল এবং দুই ফোটা অশ্রুজল দুইটি সুকোমল কুসুমকোরকের মতো অজ্ঞাত দেবতার চরণের উদ্দেশে খসিয়া পড়িল।" (গল্পগুচ্ছ)

"তখন জানিতাম না কিন্তু এখন সন্দেহমাত্র নাই যে, তিনি আমাকে যুক্তাক্ষরহীন প্রথমভাগ শিশুশিক্ষার মতো অতি সহজে বুঝিতেন।" (গল্পগুচ্ছ)

"তাহার সুললিত বাহুর ভঙ্গীটি পিঞ্জরমুক্ত অদৃশ্য পাখীর মতো অনন্ত আকাশের মেঘরাজ্যের অভিমুখে উড়িয়া চলিয়া যায়।" (গল্পগুচ্ছ)

"বহুদূরব্যাপী মরুময় বালুভূমিকে নির্ম্মল জ্যোৎস্না বিধবার শুভ্রবসনের মতো আচ্ছন্ন করিয়া আছে। * * * রোগযন্ত্রণার পরে মৃত্যু যেরূপ নির্ব্বিকার শান্তি বিকীর্ণ করিয়া দেয় সেইরূপ শান্তি, জলে স্থলে বিরাজ করিতেছে।" (নৌকাডুবি)

বিনয়ের জীবনে স্ত্রীমাধুর্য্যের নির্মল দীপ্তি লইয়া সুচরিতাই প্রথম সন্ধ্যাতারাটির মতো উদিত হইয়া ছিল। (গোরা)

রবীন্দ্রনাথের গদ্য থেকে উৎপ্রেক্ষা অতিশয়োক্তি প্রভৃতিরও এরূপ দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে, তবে বাহুল্যভয়ে সে সব দেওয়া হ'ল না :—

সাদৃশ্যবোধ জানিত অলঙ্কার ছাড়া রবীন্দ্রনাথ সংশ্রবমূলক অলঙ্কার (figures based on Association) এবং বিরোধমূলক অলঙ্কার

( figures based on Difference ) মাঝে মাঝে ব্যবহার করেছেন। নিচে তাদের কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হ'ল :—

সংশ্রবমূলক অলঙ্কারের দৃষ্টান্ত ( বিশেষণ বিপর্যাস এ জাতীয় অলঙ্কারের এক মুখ্য বিভাগ। বিপর্যস্ত বিশেষণের দৃষ্টান্ত ইতিপূর্বে কিছু কিছু দেওয়া গিয়েছে। এখানে আরো কয়েকটি দেওয়া গেল ) :—

শঙ্কিত কৌতূহল, নিভৃত প্রদোষান্ধকার, তারা-খচিত অন্ধকার, উপেক্ষিত দেব মহিমা, শব্দহীন সমারোহ, ক্ষমাহীন ক্ষুদ্রতা, সাড়ম্বর কৃত্রিমতা, দরিদ্র আয়োজন, চণ্ডীমণ্ডপগত আলস্য, পরিপুষ্ট পরিসমাপ্তি ।

বিরোধমূলক অলঙ্কারের দৃষ্টান্ত :—

"* * * যে লক্ষ্মী এই লক্ষ্মীছাড়াকে আশ্রয় দিয়াছেন" (গল্পগুচ্ছ) দ্রুতপদে শব্দহীন উচ্চ কলহাস্যে ছুটিয়া গুস্তার জলের উপর গিয়া ঝাঁপ দিয়া পড়িয়াছিল * * *" ( গল্পগুচ্ছ )

রবীন্দ্রনাথের অলঙ্কার প্রয়োগের বৈচিত্র্য ও নৈপুণ্যের পরে আলোচ্য তাঁর হা স্য র স সৃ ষ্টি র কৌ শ ল। গদ্যে যে সূক্ষ্ম ও সুমার্জিত হাস্যরসের সৃষ্টি করা যায়, একথা বোধ হয় তিনিই সকলের চেয়ে ভালোভাবে দেখিয়েছেন। 'হা স্য কৌ তু ক' 'ব্য ঙ্গ কৌ তু ক' আদি গ্রন্থগুলি তাঁর হাস্যরস সৃষ্টিকৌশলের বিশেষ নিদর্শন। কিন্তু এ সকল ছাড়াও তাঁর গদ্য রচনায় তিনি প্রয়োজন মতো স্থানে স্থানে হাস্যরসের প্রক্ষেপ দিয়ে তাকে মনোজ্ঞ ও লঘুগতি করে তুলেছেন। নিচে তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হ'ল :—

"হনুবংশীয়েরা মনুবংশীয়দের যেমন সহজে বিদ্রূপ করিতে পারে, মনুবংশীয়েরা হনুবংশীয়দিগকে তদ্রূপ করিয়া কখনো তেমন কৃতকার্য্য হইতে পারে না। সুতরাং সুরুচিকে তাহারা দন্তোন্মীলন করিয়া দেশছাড়া করিল।" ( গল্পগুচ্ছ )

"গ্রামের বিদেশী জমিদারের নৌকা কালক্রমে যে দিন ঘাটে আসিয়া লাগে সেদিন গ্রামের লোকেরা সম্ভ্রমে শশব্যস্ত হইয়া উঠে,

ঘাটের মেয়েদের মুখরঙ্গভূমিতে অকস্মাৎ নাসাগ্রভাগ পর্য্যন্ত যবনিকা পতন হয়…” ( গল্পগুচ্ছ )

“ঠিক এই সময়ে শৃগালগুলো নিকটবর্ত্তী ঝোপের মধ্য হইতে অত্যন্ত উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল * * * ঠিক মনে হইল সেই অন্ধকার সভাভূমিতে কৌতুকপ্রিয় শৃগালসম্প্রদায় ইস্কুল মাষ্টারের ব্যাখ্যাত দাম্পত্যনীতি শুনিয়াই হোক বা নব সভ্যতাদুর্ব্বল ফণিভূষণের আচরণেই হোক, রহিয়া রহিয়া অট্টহাস্য করিয়া উঠিতে লাগিল।” ( গল্পগুচ্ছ )

স্বনামাঙ্কিত যুগের আদিপর্বে রবীন্দ্রনাথের গদ্যে, যে যে সাধারণ লক্ষণ দেখা গিয়েছে সে সকল মোটামুটি ভাবে উপরে আলোচিত হ'ল। কিন্তু এ সামান্য আলোচনার পরে দাবী করা কঠিন যে, এই উল্লিখিত প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সময়কার গদ্যের বিচিত্র সৌন্দর্য ও গুণাবলীর কোন উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য বাদ পড়ে নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও উপরে যা যা বলা হয়েছে সেগুলি থেকেই সহজে বোঝা যাবে যে, বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশে রবীন্দ্রনাথের দানের গুরুত্ব কত বেশি। তিনি কাব্য রচনার দ্বারা বাংলা সাহিত্যে যে নবযুগ সৃষ্টি করেছেন বাংলা গদ্যে তাঁর প্রবর্তিত যুগের গুরুত্ব তার চেয়ে খুব কম নয়। পদ্য রচনায় মাইকেলের আদর্শ বর্তমান দিনে যেমন অচল, বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্যরচনার ভঙ্গী ততটা অপ্রচলিত না হলেও, রবীন্দ্রনাথের আদর্শ, তাঁর স্বনামাঙ্কিত যুগের আদি পর্বের শেষের দিক থেকে আজ পর্যন্ত, যে বহু লেখক লেখিকার গদ্যের উপর সুস্পষ্ট ছাপ দিয়ে চলেছে, তাদের সংখ্যা ও গুণগৌরব বঙ্কিমচন্দ্রের পদাঙ্কানুসারী লেখকবর্গের চেয়ে ঢের বেশি। এঁদের মধ্যে স্বনামখ্যাত কথাশিল্পী **শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের** নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। যে লিপিনৈপুণ্যে তিনি বাংলার লোকসাধারণের প্রশংসা ও প্রীতি আকর্ষণ করতে পেরেছিলেন তার উপর রবীন্দ্রযুগের আদ্য পর্বের গদ্যভঙ্গীর প্রভাব বেশ সুস্পষ্ট। এই বিশেষ কৃতিত্বসম্পন্ন ঔপন্যাসিক ছাড়াও বহু লেখক স্বীয় গদ্যরীতির জন্য রবীন্দ্রনাথের ( উল্লিখিত সময়ের ) গদ্যভঙ্গীর নিকট নানা প্রকারে ঋণী। এঁদের মধ্যে **বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর,**

স্বামী বিবেকানন্দ, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি পরলোকগত গদ্যলেখকগণ বিশেষভাবে স্মরণীয়। জীবিত লেখক লেখিকাগণের মধ্যে যাঁরা রবীন্দ্র যুগের আদিপর্বীয় গদ্য ভঙ্গীর প্রভাবকে স্বীয় রচনাপদ্ধতির অঙ্গীভূত করেছেন তাঁদের সকলের নাম করা বাহুল্য হবে। বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশের ঐতিহাসিক বিবৃতি প্রসঙ্গে এই বিষয়ের অনুসন্ধান তত অপরিহার্য নয়। কারণ, প্রত্যেক কৌতূহলী পাঠকই একটু শ্রম স্বীকার করলে এরূপ লেখক লেখিকাদের মোটামুটি নির্ভুল তালিকা তৈরী করতে পারবেন। আর সেরূপ তালিকা প্রস্তুত করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা দেখবেন আধুনিক গদ্য সাহিত্যের উপর রবীন্দ্রযুগের আদ্যপর্বের প্রভাব কত ব্যাপক ও গভীর।

# দ্বাবিংশ অধ্যায়

## সবুজপত্র পর্ব ( ১৯১৪—১৯৪১ )

আলোচনার সুবিধার জন্যে বাংলা গদ্যের রবীন্দ্রযুগকে দু পর্বে ভাগ করা হলেও একথা মনে রাখতে হবে যে, রবীন্দ্রনাথের গদ্য দুয়ের চেয়ে ঢের বেশি বার তার ভঙ্গী অল্পবিস্তর বদল করেছে, এবং এই নব নব রচনা ভঙ্গীর বিস্তৃত আলোচনায় বিশেষ লাভ আছে। কিন্তু বাংলা সাহিত্যিক গদ্যের ক্রমবিকাশের মোটামুটি বিবৃতি প্রসঙ্গে সে সকলের পুঙ্খানুপুঙ্খ খোঁজ নেওয়া তত প্রয়োজনীয় নয়। রবীন্দ্রনাথের গদ্যরীতির ক্রমবিকাশের খুঁটিনাটি ইতিহাস হচ্ছে বিশেষভাবে রবীন্দ্রসাহিত্য আলোচনারই অঙ্গীভূত। উপস্থিত ক্ষেত্রে এটুকু জানলেই চলতে পারে যে, বাংলা গদ্যে রবীন্দ্রনাথের মোটামুটি দান কতখানি এবং তার স্বরূপ কী। এ দানের কিছু কিছু পরিমাপ পূর্ব অধ্যায়ে রবীন্দ্রযুগের আদিপর্বের আলোচনা প্রসঙ্গে করা গিয়েছে। ঐযুগের পরবর্তী ( সবুজপত্র ) পর্বের রীতি বিচার করলেই রবীন্দ্রনাথের গদ্যের গুরুত্ব নিরূপণ মোটামুটি ভাবে সম্পূর্ণ হবে।

১৯১৪ সালে অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের 'নোবেল পুরস্কার' প্রাপ্তির পর বছর স্বনামখ্যাত **প্রমথ চৌধুরী** মহাশয়ের সম্পাদনায় 'সবুজপত্র' নামে মাসিক কাগজ প্রকাশিত হয়। এ পত্রিকা থেকেই সর্বপ্রথমে শুরু হয়েছিল চলতি ভাষা'র ভিত্তিতে সাহিত্য রচনার ব্যাপক চেষ্টা। এ বিষয়ে চৌধুরী মহাশয়ের আন্তরিক আগ্রহ ও মহামূল্য দানের জন্য বাংলা গদ্য তাঁর নিকট চিরঋণী হলেও, একথা সহজেই স্বীকার্য যে, ১৯১৪ সালের পর থেকে রবীন্দ্রনাথ চলতি ভাষাকে সাহিত্যিক রূপসৃষ্টির অন্তরতর সাধন, ও চিন্তাযুক্তি প্রকাশের বাহন না করলে, গদ্যের ক্ষেত্রে চলতি ভাষার দাবী অত শীঘ্র স্বীকৃত হ'ত কিনা সন্দেহ। কারণ, এর আগেও কখনো কখনো চলতি ভাষায় সাহিত্য রচনার চেষ্টা হয়েছিল। প্যারীচাঁদ

মিত্র ও তাঁর বন্ধুতে মিলে যে মাসিকপত্রিকা' বার করেছিলেন, তাও ছিল চলতি ভাষাকে সাহিত্যের ক্ষেত্রে চালাবার প্রচেষ্টার অঙ্গীভূত। কিন্তু এ চেষ্টার ফলে 'আলালের ঘরের দুলাল' বা 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'র ন্যায় দু একখানি পুস্তক রচিত হলেও, সেকালকার অন্য কোন লেখক চলতি ভাষাকে সাধুভাষার সঙ্গে সমান আসন দিতে রাজি হন নি। তাই 'আলালে'র পরে লিখিত প্যারীচাঁদের পুস্তকগুলিতে সাধুভাষাই বেশির ভাগে ব্যবহৃত হয়েছে। আর 'সবুজপত্রে'র প্রকাশের পূর্বপর্যন্ত নাটকে ছাড়া, চলতি ভাষাকে সাহিত্যের প্রায় কোন সৃষ্টি কার্যেই লাগানো হয় নি। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও যে তাঁর গোড়ার দিকের তিনখানি উপন্যাসে এবং কতিপয় গল্পে পাত্রপাত্রীদের মুখে সাধু ভাষাই দিয়েছিলেন তার পশ্চাতে ছিল এই ঐতিহাসিক কারণেরই প্রভাব। সে যাই হোক্ নিজ সাহিত্যিক জীবনের গোড়া থেকেই রবীন্দ্রনাথ যে চলতি ভাষার উপযোগিতা উপলব্ধি করেছিলেন, তার প্রথম পরিচয় পাওয়া গেছে 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্রে'। 'ছিন্নপত্রে' সংগৃহীত ( ১৮৮৫ থেকে ১৮৯৫ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে লেখা ) কয়েকখানি পত্রে এবং 'য়ুরোপ যাত্রীর ডায়েরী' ( ১৮৯১-১৮৯২ ) নামক রচনাতেও তিনি চলতি ভাষার ব্যবহার করেছেন। কিন্তু এসকল লেখা আপামর সাধারণের জন্যে নয়; 'সবুজপত্র' প্রকাশের আগে পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ, সর্ব্বসাধারণের পাঠ্য গল্পউপন্যাসে চলতি ভাষাকে স্থান দেওয়ার কথা ভাবেন নি। এই নূতন কাগজ বার হওয়ার কিছু পর থেকে তিনি কথাসাহিত্যে শুধু চলতি ভাষাই ব্যবহার করে এসেছেন। কেবল 'চতুরঙ্গ' আদি কয়েকটি লেখায় ঘটেছে এ নিয়মের ব্যতিক্রম। কিন্তু সে যাই হোক্, রবীন্দ্রনাথ তাঁর যুগের দ্বিতীয় পর্বে, যে নূতন গদ্যরীতি প্রবর্তন করলেন চলতি ভাষা ব্যবহারেই শুধু তার বিশেষত্ব নয়। 'সাধনা', 'ভারতী', 'বঙ্গদর্শন' আদিতে তিনি যে বিচিত্র গদ্যরীতির বিকাশ সাধন করেছিলেন, তারই মাঝে চলতি ভাষার সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের প্রক্ষেপ করেই যে তাঁর নূতন রীতির উন্মেষ হ'ল তা নয়। সেরূপ ঘটলে 'সবুজপত্র পর্ব' বলে আলাদা পর্ব বিভাগের কোন দরকারই হ'ত না। 'সবুজ পত্র' প্রকাশের কিছু পর থেকে

রবীন্দ্রনাথের গদ্যে এক বিস্ময়কর নতুন রীতির আবির্ভাব দেখা গেল। এ রীতিতে অলঙ্কার প্রয়োগের বাহুল্য কোথাও নেই। যথাসম্ভব সাদাসিধে কথার সঙ্গে এতে মানানসই সাদাসিধে উপমারূপকই ব্যবহৃত হয়েছে; এবং সমাসবদ্ধ পদেরও প্রয়োগ এতে একান্ত কম। আর বৈচিত্র্যের জন্যে এতে মাঝে মাঝে কর্তৃপদ ও কর্মপদাদির অবস্থান বিপর্যস্ত করা হয়েছে।

এ রকম আড়ম্বরহীনতার সঙ্গে চলতি ভাষার যোগ হওয়াতে রবীন্দ্রনাথের নব প্রবর্তিত রীতি বাংলা গদ্যের শক্তিতে নূতন বেগ সঞ্চার করল। সাধুভাষার অন্য যতই গুণ থাক না কেন, চলতি ভাষার চেয়ে এ ভাষা এক দিক দিয়ে একটু দুর্বল। মুখের কথার মধ্যে মানুষের প্রাণের যে একটা সচ্ছন্দ ও অকৃত্রিম লীলা প্রকাশ পায়, সাধু ভাষার তা একান্ত দুর্লভ। এ ভাষা 'কানের ভিতর দিয়া মরমে পশে' না, প্রাণ আকুল যদি বা কখনো কখনো ক'রে থাকে। এ ভাষার পাঠক বা শ্রোতা বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হ'তে পারেন, কিন্তু তা শোনামাত্র প্রাণ মন গলে যাওয়ার সম্ভাবনা খুব কম। কিন্তু চলতি ভাষার রয়েছে এক স্বভাবসিদ্ধ প্রসাদগুণ, এবং চলতি ভাষার ভিত্তিতে রচিত গদ্যেও এ গুণ কিয়ৎপরিমাণে বর্তায়।

এখন জিজ্ঞাস্য চলতি ভাষার লক্ষণ কি? কেবল কথ্য ভাষার সর্বনাম ও ক্রিয়াপদাদি চলতি ভাষার চিহ্ন নয়। চলতি ভাষার বাক্যে ব্যবহৃত শব্দসঞ্চয়েও একটু বিশেষত্ব এই আছে যে, বিশেষ প্রয়োজন না হলে এতে খাঁটি সংস্কৃত শব্দ উপস্থিত হয় না, আর খাঁটি বাংলা (প্রাকৃত বা তদ্ভব, দেশী ও বিদেশাগত) শব্দেরই থাকে একান্ত প্রাদুর্ভাব। এ ভাষাকে সাহিত্যের (বিশেষ উচ্চশ্রেণীর সাহিত্যের) বাহন করা বেশ কষ্টসাধ্য। চল্‌তি ভাষাকে আজও যে, লেখকসাধারণ একমাত্র লেখার ভাষা হিসাবে গ্রহণ করেন নি, এই বোধ হয় তার অন্যতম কারণ। সে যাই হোক, রবীন্দ্রনাথ চলতি ভাষার দাবী সম্বন্ধে দীর্ঘকাল যাবৎ উদাসীন থাকতে পারেন নি। বাংলা সাধুভাষার গদ্য তাঁর হাতে অনুপম শ্রী লাভ করবার পরেই তিনি আবার চলতি ভাষার

দিকে মনোযোগ দিলেন। বাংলা সাধুভাষার গদ্য তাঁর হাতে যখন চরমোৎকর্ষ লাভ করল, তাঁর অনবদ্য রচনারীতির সক্ষম ও অক্ষম অনুকরণে বাংলা গদ্য যখন ভরপুর, সে সময় ধীরে ধীরে তিনি শিল্পীসুলভ বৈচিত্র্যের ও অভিনবত্বের কথা ভাবতে বাধ্য হলেন; তাঁর অপূর্ব গদ্য পাছে এক ঘেয়ে হয়ে ওঠে, এ ভয়ে তিনি নূতন রীতির রাস্তা খুঁজলেন। ১৯০৮ সালের শেষের দিকে থেকে শান্তিনিকেতনের উপাসনা মন্দিরে রবীন্দ্রনাথ যে সব উপদেশ দিয়েছেন, সেইগুলিতে প্রকৃত প্রস্তাবে এ রাস্তার সন্ধান তিনি নূতন ক'রে পেলেন, এবং সাহিত্য ক্ষেত্রে চলতি ভাষার দাবী সর্বপ্রথমে এ রচনাগুলিতেই মেনে নেওয়া হ'ল। এই উপদেশ গুলি ধর্মোপদেশ পর্যায়ের বক্তৃতা হ'লেও এদের সাহিত্যিক সৌন্দর্য ও রসকে নিতান্ত নগণ্য বলা চলে না। নিচে এই উপদেশমালার থেকে একটির কিয়দংশ উদ্ধৃত হ'ল :—

"উৎসব তো আমরা রচনা করিতে পারিনে যদি সুযোগ হয় তবে উৎসব আমরা আবিষ্কার করতে পারি।

সত্য যেখানেই সুন্দর হয়ে প্রকাশ পায় সেইখানেই উৎসব। সে সে প্রকাশ কবেই বন্ধ আছে। পাখী তো রোজই ভোর রাত্রি থেকেই ব্যস্ত হয়ে ওঠে তার সকাল বেলাকার গীতোৎসবের নিমন্ত্রণ রক্ষা করবার জন্যে। আর প্রভাতের আনন্দসভাটিকে সাজিয়ে তোলবার জন্য একটী অন্ধকার পুরুষ সমস্ত রাত্রি কত যে গোপনে আয়োজন করে তার কি সীমা আছে? শুতে যাবার আগে একবার যদি কেবল তাকিয়ে দেখি তবে দেখতে পাইনে কি জগতের নিত্য উৎসবের মহাবিজ্ঞাপন সমস্ত আকাশ জুড়ে কে টাঙিয়ে রেখেছে?

এর মধ্যে উৎসবটা কবে? যে দিন আমরা সময় করতে পারি সেই দিন। যে দিন হঠাৎ হুঁস হয় যে আমাদের নিমন্ত্রণ আছে এবং সে নিমন্ত্রণ প্রতিদিন মারা যাচ্ছে। যে দিন স্নান করে সাজ করে ঘর ছেড়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ি।

. সেই দিন উৎসবের সকালে আকাশের দিকে তাকিয়ে বলি— বাঃ আজ আলোটি কী মধুর কী পবিত্র! আরে মূঢ়, এ আলো কবে

পবিত্র ছিল না! তুমি একটা বিশেষ দিনে গায়ে একটা বিশেষ চিহ্ন কেটে দিয়েছ বলেই কি আকাশের আলো উজ্জ্বল হয়ে জ্বলেছে!"

—শান্তিনিকেতন ( নূতন সংস্করণ ) ১ম খণ্ড।

উল্লিখিত স্থলটিতে উৎসবের অন্তর্নিহিত তত্ত্বকে রবীন্দ্রনাথ নিতান্ত সহজ সরল ভাষায় প্রকাশ করলেও, ব্যাখ্যানটির পেছনে তাঁর কবিজনোচিত দৃষ্টি থাকার ফলে, এর গদ্যে এক অপরূপ ভঙ্গী বিকশিত হয়েছে। কিন্তু এতে অলঙ্কার বাহুল্য বা সাহিত্যিক চমৎকৃতি উৎপাদনের সজ্ঞান চেষ্টা যেন মোটেই নেই। এখানেই প্রকৃতপ্রস্তাবে সবুজপত্র পর্বের প্রথম অঙ্কুর-বিকাশ। 'শান্তিনিকেতন' নামক ব্যাখ্যানমালা প্রকাশের পর তিনি সাধুভাষার যে সকল গল্পউপন্যাসাদি রচনা করেছেন, তার প্রত্যেকটিতেই এই অনাড়ম্বর সৌন্দর্য বিদ্যমান। গদ্য রচনার বাহ্যরূপকে অতিশয়িত না ক'রেও যে তাতে রসপ্রকর্ষ ঘটানো যায়, রবীন্দ্রনাথের উল্লিখিত রচনাগুলি তার প্রমাণ। এ শ্রেণীর সাধুভাষাকে বলা যেতে পারে তাঁর সবুজপত্র পর্বের গদ্যের যথার্থ আদিরূপ। সাধুভাষার সংস্কৃতপ্রচুর ভারিক্কি ভাবের লেশমাত্র এতে নেই। কেবল ক্রিয়াপদ ও সর্বনামাদিতেই এর সাধুত্ব পর্য্যবসিত, এবং এতে অলঙ্কারের বাহুল্য একদম নেই। এ শ্রেণীর ভাষা যে কত জোরালো হতে পারে 'চতুরঙ্গ' নামক গল্পের ভাষা তার প্রমাণ। নিচে এর একটু নমুনা দেওয়া যাচ্ছে :—

"বসিয়া বসিয়া ভাবি, এই নীলকুঠি, যেটা আজ গোভাগাড়ে গোরুর হাড় ক'খানার মত পড়িয়া আছে সে যে একদিন সজীব ছিল। সে আপনার চারিদিকে সুখদুঃখের যে ঢেউ তুলিয়াছিল, মনে হইয়াছিল সে তুফান কোনো কালে শান্ত হইবে না। যে প্রচণ্ড সাহেবটা এইখানে বসিয়া হাজার হাজার গরীব চাষার রক্তকে নীল করিয়া তুলিয়াছিল, তার কাছে আমি সামান্য বাঙালীর ছেলে কে-ই বা। কিন্তু পৃথিবী কোমরে আপন সবুজ আঁচল খানি আঁটিয়া বাঁধিয়া অনায়াসে তাকে শুদ্ধ তার নীলকুঠি সুদ্ধ সমস্ত বেশ করিয়া মাটি দিয়া নিছিয়া পুঁছিয়া নিকাইয়া দিয়াছে – যা একটু আধটু সাবেক দাগ দেখা যায় আরো এক পোঁচ লেপ পড়িলেই একেবারে সাফ হইয়া যায়।

কথাটা পুরানো, আমি তা'র পুনরুক্তি করিতে বসি নাই। আমার মন বলিতেছে, না গো প্রভাতের পর প্রভাতে এ কেবলমাত্র কালের উঠান নিকানো নয়। সেই নীলকুঠির সাহেবটা আর তার নীলকুঠির বিভীষিকা একটুখানি ধুলার চিহ্নের মতো মুছিয়া গেছে বটে—কিন্তু আমার দামিনী!"

'চতুরঙ্গ' সবুজপত্রেই প্রথম বেরিয়েছিল। তবু এর ভাষা এবং রীতি পুরোদস্তুর চলতিভাষামূলক নয়। এই রকম ভাষাতে চলতি ভাষার ক্রিয়া পদাদি সমাবেশ ক'রে রবীন্দ্রনাথ তাঁর দ্বিতীয় যুগপর্বের অনুসৃত রীতি-প্রবর্তন করেন।

'ঘ রে বা ই রে' রচনায় রবীন্দ্রনাথ যে গদ্যরীতি ব্যবহার করেছেন তাতে 'চতুরঙ্গ' ও তার অব্যবহিত আগেকার কয়েকখানি বইএর অনাড়ম্বর সৌন্দর্য তো আছেই, অধিকন্তু মুখের কথার সঙ্গে এ গদ্যের অতিমাত্র সান্নিধ্য বা সাদৃশ্য থাকার ফলে এ বই যেন আরো সহজে হৃদয়কে স্পর্শ করে। এ স্পর্শ কেবল উপাখ্যান বর্ণিত পাত্র পাত্রীর সুখ দুঃখ বা মনস্তত্ত্বের স্পর্শ নয়; যে অনুপম ভাষার ভিতর দিয়ে কল্পিত নরনারীর সুখসাধ হিল্লোলিত হয়েছে বা দুঃখনৈরাশ্য তরঙ্গিত হয়েছে সে ভাষাও হৃদয়কে অনির্বচনীয় অনুভূতি দিয়ে থাকে। নিচে 'ঘরে বাইরে' থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত হ'ল :—

"ভাদ্রের বন্যায় চারিদিক টলমল করচে—কচি ধানের আভা যেন কচি ছেলের কাঁচা দেহের লাবণ্য। আমাদের বাড়ীর বাগানের নীচে পর্য্যন্ত জল এসেচে। সকালের রৌদ্রটি এই পৃথিবীর উপরে একেবারে অপর্য্যাপ্ত হয়ে পড়েছে, নীল আকাশের ভালোবাসার মতো।

আমি কেন গান গাইতে পারিনে? খালের জল ঝিলমিল ক'রচে, গাছের পাতা ঝিক্‌মিক্ ক'রচে, ধানের ক্ষেত ক্ষণে ক্ষণে শিউরে চিকচিকিয়ে উঠচে-এই শরতের প্রভাতসঙ্গীতে আমিই কেবল. বোবা, আমার মধ্যে সুর অবরুদ্ধ, আমার মধ্যে বিশ্বের সমস্ত উজ্জ্বলতা আটকা পড়ে যায়, ফিরে যেতে পায় না। আমার এই

প্রকাশহীন দীপ্তিহীন আপনাকে যখন দেখতে পাই তখন বুঝতে পারি পৃথিবীতে কেন আমি বঞ্চিত। আমার সঙ্গ দিনরাত্রি কেউ সইতে পার্ব্বে কেন ?

বিমল যে প্রাণের বেগে একেবারে ভরা। সেই জন্যে এই ন-বছরের মধ্যে এক মুহূর্ত্তের জন্যে সে আমার কাছে পুরোনো হয় নি। কিন্তু আমার মধ্যে যদি কিছু থাকে সে কেবল বোবা গভীরতা, সে তো কলধ্বনিত বেগ নহে। আমি কেবল গ্রহণ ক'রতেই পারি কিন্তু নাড়া দিতে পারি নে। আমার সঙ্গ মানুষের পক্ষে উপবাসের মতো—বিমল এতদিন যে কি দুর্ভিক্ষের মধ্যেই ছিলো তা আজকের ওকে দেখে বুঝতে পারচি। দোষ দেবো কাকে ?

উল্লিখিত অংশে কথ্যভাষার অবাধ গতি এবং স্বাভাবিকতা থাক্‌লেও ভাবগাম্ভীর্যের কিছুমাত্র ন্যূনতা ঘটে নি, যদিও চল্‌তিভাষার বিরুদ্ধবাদীরা এ সম্বন্ধে আশঙ্কায় অনবরত আকুল। 'ঘরে বাইরে'তে অনুসৃত গদ্যরীতি 'যো গা যো গ' রচনায় আরো মধুর এবং হৃদয়গ্রাহী হয়েছে। এ বই থেকে কিছুটা অংশ নিচে তুলে দেওয়া হ'ল :—

"এরই মধ্যে কুমুদিনী এলো ক'লকাতায়। এ যেন মস্ত একটা সমুদ্র, কিন্তু কোথায় এক ফোঁটা পিপাসার জল ? দেশে আকাশের বাতাসেও একটা চেনা চেহারা ছিলো। গ্রামের দিগন্তে কোথাও বা ঘন বন, কোথাও বা বালির চর, নদীর জলরেখা, মন্দিরের চূড়ো, শূন্য বিস্তৃত মাঠ, বুনো ছাউএর ঝোপ, গুণটানা পথ,—এরা নানা রেখায় নানা রঙে বিচিত্র ঘের দিয়ে আকাশকে একটি বিশেষ আকাশ ক'রে তুলেছিলো, কুমুদিনীর বিশেষ আকাশ। সূর্য্যের আলোও তেমনি বিশেষ আলো। দীঘিতে, শস্যক্ষেতে, বেতের ঝাড়ে, জেলে নৌকার খয়েরি রঙের পালে, বাঁশ ঝাড়ের কচি ডালের চিকণ পাতায়, কাঠালগাছের ঘন মসৃণ সবুজে, ওপারের বালুতটের ফ্যাকাশে হলদেয়, —সমস্তর সঙ্গে নানাভাবে মিশিয়ে সেই আলো একটি চিরপরিচিত রূপ পেয়েছিলে। কলকাতার এই সব অপরিচিত বাড়ির ছাদে দেয়ালে কঠিন অনম্র রেখার আঘাতে নানা খানা হ'য়ে সেই চিরদিনের

আকাশ আলো তাকে কোনো লোকের মতো কড় চোখে দেখে এখানকার দেবতাও তাকে এক ঘরে করেচে।"

'শেষের কবিতা'য়ও রবীন্দ্রনাথের চলতি ভাষার গদ্য এমনি অনাড়ম্বর সৌন্দর্যে মণ্ডিত হয়ে দেখা দিয়েছে। কিন্তু এই অনাড়ম্বর ভাব সবচেয়ে অনায়াসভাবে ফুটেছে তাঁর 'ছেলেবেলা' (১৯৪১) নামক বাল্যস্মৃতির কাহিনীতে। নিচে এ পুস্তক থেকে দুটি অংশ তুলে দেওয়া যাচ্ছে :—

"তখন বঙ্গদর্শনের ধুম লেগেছে, সূর্যমুখী আর কুন্দনন্দিনী আপন লোকের মতো আনাগোনা করছে ঘরে ঘরে। কী হলো কী হবে দেশসুদ্ধ সবার এই ভাবনা।

বঙ্গদর্শন এলে পাড়ায় দুপুর বেলা কারো ঘুম থাকত না। আমার সুবিধে ছিল কাড়াকাড়ি করবার দরকার হোত না, কেননা আমার একটা গুণ ছিল আমি ভালো পড়ে শোনাতে পারতুম। আপন মনে পড়ার চেয়ে আমার পড়া শুনতে বৌঠাকরুণ ভালো বাসতেন। তখন বিজ্‌লি পাখা ছিল না, পড়তে পড়তে বৌঠাকরুণের হাত-পাখার হাওয়ার একটা ভাগ আমি আদায় করে নিতুম।"

"গঙ্গার ধারে প্রথম যে বাসা আমার মনে পড়ে ছোটো সে দোতলা বাড়ি। নতুন বর্ষা নেমেছে। মেঘের ছায়া ভেসে চলেছে স্রোতের উপর ঢেউ খেলিয়ে, মেঘের ছায়া কালো হয়ে ঘনিয়ে রয়েছে ওপারের বনের মাথায় অনেকবার এই রকম দিনে নিজে গান তৈরী করেছি সেদিন তা হোলো না। বিদ্যাপতির পদটি জেগে উঠল আমার মনে—"এ ভরা বাদর মাহ ভাদর শূন্য মন্দির মোর।" নিজের সুর দিয়ে ঢালাই করে রাগিণীর ছাপ মেরে তাকে নিজের করে নিলুম। গঙ্গার ধারে সেই সুর দিয়ে মিনে করা বাদল দিন আজো রয়ে গেছে আমার বর্ষা গানের সিন্ধুকটাতে।"

# ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

## রবীন্দ্রযুগের মুখ্য গদ্যলেখকগণ

### (ক) স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬২-১৯০৩)

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর অগণিত দেশবাসীর নিকট কেবল একজন অসাধারণ বাগ্মী, স্বদেশপ্রেমিক কর্মী ও ধর্মনেতা বলেই পরিচিত। কিন্তু বাংলা গদ্য রচনার ক্ষেত্রেও যে তিনি এক বিশেষ ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছিলেন তা খুব অল্প লোকেই জানে। গদ্য রচনায় কৃতিত্বের জন্য স্বামীজী যে যথোপযুক্ত খ্যাতি লাভ করেন নি, তার প্রধান কারণ তাঁর মৌলিক রচনার একান্ত স্বল্পতা। তাঁর নামে প্রচারিত মূল্যবান গ্রন্থাবলির অধিকাংশই তাঁর লেখা ইংরেজী থেকে অন্যকৃত অনুবাদ। কেবল 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য', 'পরিব্রাজক', 'ভাববার কথা', 'বর্ত্তমান ভারত', প্রভৃতি কয়েকখানি বই তিনি বাংলায় লিখেছেন। কিন্তু তাঁর মৌলিক বাংলা রচনার পরিমাণ কম হ'লেও বাংলা গদ্যের চক্ষুষ্মান্ ঐতিহাসিককে তাঁর দানের যথোপযুক্ত মূল্য উপলব্ধি করতেই হবে। কারণ তাঁর গদ্যে এক বিশেষ শক্তি ও সৌন্দর্য বর্তমান। কিন্তু এ রচনার উৎকর্ষ বিচার করবার আগে একথা মনে রাখতে হবে যে, স্বামী বিবেকানন্দ সাহিত্যসৃষ্টির জন্য কোন সজ্ঞান প্রয়াস করেন নি। তীব্র স্বদেশ প্রেম ও গভীর মনস্বিতার তাগিদে তিনি মাঝে মাঝে দেশবাসীকে উদ্দেশ ক'রে যা কিছু লিখেছেন তাই হল তাঁর রচনা। কিন্তু পেছনে সাহিত্য সৃষ্টির কোন সজ্ঞান ইচ্ছা না থাকলেও তাঁর রচনার মাঝে যথার্থ সাহিত্যিক সৌন্দর্যের আবির্ভাব ঘটেছে। এ বিষয়ের দৃষ্টান্ত স্বরূপে 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' থেকে কিছুটা নিচে উদ্ধার করা যাচ্ছে :—

"এ ইয়োরোপ বুঝতে গেলে, পাশ্চাত্য ধর্ম্মের আকর ফ্রান্স থেকে বুঝতে হবে। পৃথিবীর আধিপত্য ইয়োরোপে, ইয়োরোপের

মহাকেন্দ্র পারি। পাশ্চাত্য সভ্যতা, রীতিনীতি, আলোক আঁধার, ভাল মন্দ, সকলের শেষ পরিপুষ্ট ভাব এইখানে, এই পারি নগরীতে।

এ পারি এক মহাসমুদ্র—মণি, মুক্তা, প্রবাল যথেষ্ট, আবার মকর কুম্ভীরও অনেক। এই ফ্রান্‌স ইয়োরোপের কর্ম্মক্ষেত্র। সুন্দর দেশ—চীনের কতক অংশ ছাড়া, এমন দেশ আর কোথাও নাই। নাতিশীতোষ্ণ, অতি উর্ব্বরা, অতিবৃষ্টি নাই, অনাবৃষ্টিও নাই, সে নির্ম্মল আকাশ, মিঠে রৌদ্র, ঘাসের শোভা, ছোট ছোট পাহাড় চিনার বাঁশ প্রভৃতি গাছ, ছোট ছোট নদী, ছোট ছোট প্রস্রবণ। সে জলে রূপ, স্থলে মোহ, বায়ুতে উন্মত্ততা, আকাশে আনন্দ। প্রকৃতি সুন্দর, মানুষও সৌন্দর্য্যপ্রিয়। আবালবৃদ্ধবনিতা, ধনী দরিদ্র, তাদের ঘরদোর, ক্ষেত ময়দান, ঘ'সে মেজে' সাজিয়ে গুছিয়ে ছবিখানি ক'রে রেখেছে। এক জাপান ছাড়া এ ভাব আর কোথাও নাই। সে ইন্দ্রভুবন, অট্টালিকাপুঞ্জ নন্দনকানন, উদ্যান উপবন, মায় চাষার ক্ষেত, সকলের মধ্যে একটু রূপ, একটু সুচ্ছবি দেখবার চেষ্টা, এবং সফলও হয়েছে।"

উদ্ধৃতাংশের রচনায় চল্‌তি ভাষার ব্যবহার বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার যোগ্য। খুব সম্ভব এদিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথের রচিত 'সাধনা' প্রকাশিত 'য়ুরোপ যাত্রীর ডায়ারীর' ( ১৮৯১-৯২ ) মতো বই ছিল তাঁর আদর্শ। তাঁর পরবর্তী গ্রন্থ 'পরিব্রাজক'ও এই চলতি ভাষাতেই রচিত। এ বইএর গদ্য আরও হৃদয়গ্রাহী এবং ওজস্বিতাসম্পন্ন। নিচে এ পুস্তক থেকে দুটি অংশ উদ্ধৃত করা যাচ্ছে :—

* * * * * বাঙ্গলা দেশের একটী রূপ আছে। সে রূপ—কিছু আছে মলায়ালমে ( মালাবার ) আর কিছু কাশ্মীরে। জলে কি আর রূপ নাই? জলে জলময়, মুষলধারে বৃষ্টি কচুর পাতার উপর দিয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে, রাশি রাশি তাল নারিকেল খেজুরের মাথা একটু অবনত হয়ে সে ধারাসম্পাত হইছে, চারিদিকে ভেকের ঘর্ঘর আওয়াজ,—এতে কি রূপ নাই? আর আমাদের গঙ্গার কিনারা, বিদেশ থেকে না এলে, ডায়মণ্ড হারবারের মুখ দিয়ে না গঙ্গায় প্রবেশ

করলে সে বোঝা যায় না। সে নীল আকাশ, তার কোলে কোলে মেঘ, তার কোলে সাদাটে মেঘ, সোনালি কিনারাদার, তার নীচে ঝোপ ঝোপ তাল নারিকেল খেজুরের মাথা বাতাসে যেন লক্ষ লক্ষ চামরের মত হেলচে, তার নীচে ফিকে ঘন ঈষৎ পীতাভ একটু কাল মেশান ইত্যাদি হরেক রকমের সবুজের কাঁড়ি ঢালা আম নীচু জাম কাঁটাল—পাতাই পাতা—গাছ ডাল পালা আর দেখা যাচ্চে না, আশে পাশে ঝাড় ঝাড় বাঁশ হেলছে দুলচে, আর সকলের নীচে—যার কাছে ইয়ারকান্দী ইরানী তুর্কিস্থানি গালচে দুলচে কোথায় হার মেনে যায় সেই ঘাস, যতদূর চাও সেই শ্যাম ঘাস, কে যেন ছেঁটে ছুঁটে ঠিক কোরে রেখেছে, জলের কিনারা পর্যন্ত সেই ঘাস ; গঙ্গার মৃদুমন্দ হিল্লোল যে অবধি জমিকে ঢেকেছে, যে অবধি অল্প লীলাময় ধাক্কা দিচ্চে, সে অবধি ঘাসে আঁটা আবার তার নীচে গঙ্গাজল। * * * এইবেলা গঙ্গা মার শোভা যা দেখবার দেখে নাও, বড় একটা কিছু থাকচে না। দৈত্য দানবের হাতে পড়ে এ সব যাবে।"

উল্লিখিত স্থলটিতে চলতি ভাষার ভিতর দিয়ে সরলতা ও সৌন্দর্যের সুন্দর সমাবেশ হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ নিজে যখন সাধুভাষায় গল্প উপন্যাস প্রবন্ধাদি রচনায় নিরত, তখনই স্বামীজী চলতি ভাষাকে চালাবার জন্যে নিজ সহকর্মীদের উপদেশ দিচ্ছিলেন, এবং রবীন্দ্রনাথেরই পূর্বপ্রদর্শিত পথে চলতি ভাষায় চমৎকার গদ্যও লিখেছেন। এসকল ঘটনায় তাঁর স্বভাবসিদ্ধ স্বাধীন চিন্তার ও সবল রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে, স্বামীজী এরূপ সুন্দর রচনা আর বেশি রেখে যেতে পারেন নি। সমসাময়িক সাধুভাষার দুষ্পরিহার্য প্রভাব শেষ পর্যন্ত তাঁকেও গ্রহণ করতে হয়েছিল। তাঁর 'বর্ত্তমান ভারত', এবং 'ভাববার কথা'র অধিকাংশ প্রবন্ধ সাধুভাষায়ই রচিত। এরই দুখানির ভাষাও খুব প্রাঞ্জল অথচ জোরালো। এদের রচনার দৃষ্টান্ত স্বরূপ 'বর্ত্তমান ভারতে'র উপসংহারটি নিচে উদ্ধৃত হ'ল :—

"হে ভারত! ভুলিও না—তোমার নারীজাতির আদর্শ সতী, সাবিত্রী, দময়ন্তী, ভুলিও না—তোমার উপাস্য উমানাথ সর্ব্বত্যাগী

ভুলিও না—তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন, ইন্দ্রিয়-সুখের—ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে ; ভুলিও না - তুমি জন্ম হইতেই "মায়ের" জন্য বলি প্রদত্ত ; ভুলিও না - তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ার ছায়া মাত্র ; ভুলিও না—নীচ জাতি, মূর্খ দরিদ্র অজ্ঞ মুচি মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই।

হে বীর! সাহস অবলম্বন কর। সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই ; বল—মূর্খ ভারতবাসী দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই ; তুমিও কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্দ্ধক্যের বারাণসী, বল ভাই—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ ; আর বল দিনরাত, "হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও ; মা আমার দুর্ব্বলতা কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।"

স্বামীজীর রচিত ইংরাজী গ্রন্থাবলীর বাংলা অনুবাদের এরূপ সুন্দর সতেজ ও প্রাঞ্জল সাধুভাষার গদ্য ব্যবহৃত হয়েছে। আধুনিক বাংলা গদ্যের উপর এ সকল গ্রন্থের প্রভাবও একান্ত নগণ্য নয়। বাংলা গদ্যের উপর স্বামীজীর প্রভাব বিবেচনা ক'রতে হলে এসব বইকে উপেক্ষা করা চলবে না।

## (খ) প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৮)

সাহিত্যে চলতিভাষা প্রচলনের কাজে প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের নাম 'সবুজ-পত্র' প্রচারের পর থেকে বিশেষ খ্যাত হ'লেও তিনি নিজে চল্‌তি ভাষার লিখতে শুরু করেছিলেন খুব সম্ভব ১৯০২ সাল থেকে। 'ভারতী' পত্রিকার বাং ১৩০৯ সালের বৈশাখে তিনি 'হালখাতা' নাম দিয়ে যে সরস প্রবন্ধ

লিখেছিলেন সেটি তাঁর খুব গোড়ার দিককার চলতি ভাষার রচনাগুলির মধ্যে একটি। এর পর প্রায় চৌদ্দ বছর ধ'রে তিনি তাঁর নিজস্ব সরস ভঙ্গীতে চলতি ভাষার গদ্যে নানা প্রবন্ধাদি রচনা ক'রে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। এতে কারো কোন প্রতিবাদের কারণ ঘটে নি। কিন্তু যেই তিনি 'সবুজপত্র' নামে মাসিক কাগজ বার ক'রে, চলতি ভাষার দাবীকে সোজাসুজি বাংলার লেখক ও পাঠক সাধারণের নিকট পেশ করলেন, তখনই এক আশ্চর্য প্রতিক্রিয়া দেখা গেল। সাধুভাষার গদ্যের গোঁড়া প্রেমিকেরা তখন চলতি ভাষার ব্যাপক প্রচলনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানালেন। এ প্রতিবাদে দেশের ছোট বড় মাঝারি অনেক সাহিত্যিক ও অসাহিত্যিকের কণ্ঠ শোনা গিয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও চলতি ভাষার দাবী অগ্রাহ্য হ'ল না; কারণ রবীন্দ্রনাথ নিজে তাঁর গদ্যরীতিকে চলতি ভাষার উপর স্থাপন করলেন। চৌধুরী মহাশয়ের চেষ্টা জযযুক্ত হ'ল। প্রায় চৌদ্দ বছর ধরে তিনি যে চলতি ভাষাকে সাহিত্যের ক্ষেত্রে সম্মানের আসন দিয়ে আসছিলেন, তার সে আসনের যোগ্যতা দেশের প্রগতিশীল লেখক ও পাঠকগণ স্বীকার ক'রে নিলেন। কিন্তু চলতি ভাষার দাবীকে প্রতিষ্ঠিত করবার সাহায্য করলেও চৌধুরী মহাশয়ের বাংলা গদ্যসম্পর্কিত এই একমাত্র কাজ নয়। বাংলা গদ্যে তিনি যে নূতন ভঙ্গী প্রবর্তন করেছেন এরি জন্যে তাঁর নাম এক্ষেত্রে চিরস্মরণীয় হবে। সাধারণ কথাবার্তার ঢঙে রচিত চৌধুরী মহাশয়ের প্রবন্ধগুলি বেশ সরস। ইংরেজী সমালোচকেরা যাকে বলেন wit, সে জিনিসটি তাঁর প্রবন্ধে যে পরিমাণে সুলভ, রবীন্দ্রনাথ ছাড়া বাংলার কোনো লেখকের রচনায়ই না নয়। এই wit কথাটির কোন বাংলা প্রতিশব্দ নেই। দুটি পদার্থের অপ্রত্যাশিত সাদৃশ্য বা বিরুদ্ধতা, বা দ্ব্যর্থক শব্দের প্রয়োগ আদি থেকে পাঠকের চমৎকৃতি উৎপাদনই হ'ল witএর কাজ। নিচে চৌধুরী মহাশয়ের রচনা থেকে এর কতকগুলি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাচ্ছে :—

"আমি বাংলা ভালবাসি, সংস্কৃতকে শ্রদ্ধা করি। কিন্তু এ শাস্ত্র মানি নে যে, যাকে শ্রদ্ধা করি তারই শ্রাদ্ধ করতে হবে।"

"ভাষা মানুষের মুখ হতে কলমের মুখে আসে। কলমের মুখ হতে মানুষের মুখে নয়। উল্টোটা চেষ্টা করতে গেলে মুখে শুধু কালি পড়ে।"

"সমুদ্র পার থেকে যে-সকল বিদ্যার আমদানি করেছি, সামুদ্রিক বিদ্যা তার ভিতর পড়ে না।"

"রাজাজ্ঞা সর্ব্বথা শিরোধার্য্য হলেও সর্ব্বদা পালন করা সম্ভব নয়। রাজার আদেশে মুখ বন্ধ করা সহজ, খোলা কঠিন। পৃথিবীতে সাহিত্য কেন, সকল ক্ষেত্রেই নিষেধ মান্য করা বিবিধ অনুসরণ করার চাইতে অনেক সহজসাধ্য। "এর হাতে জল খেয়োনা" এই নিষেধ পালন করেই ব্রাহ্মণ জাতি আজও টিঁকে আছেন,—বেদ অধ্যয়নের বিধি পালন করতে বাধ্য হলে কবে মারা যেতেন।"

"ভগবান, আমার বিশ্বাস, মানুষকে চোখ দিয়েছেন চেয়ে দেখবার জন্য,—তাতে ঠুলি পরবার জন্য নয়। সে ঠুলির নাম দর্শন দিলেও তা অগ্রাহ্য। শুনতে পাই চোখে ঠুলি না দিলে গরুতে ঘানি ঘোরায় না। একথা যদি সত্য হয় তা হলে যারা সংসারের ঘানি ঘোরাবার জন্যে ব্যস্ত, লেখকেরা তাদের জন্য সাহিত্যের ঠুলি প্রস্তুত করতে পারেন, কিন্তু আমি তা পারব না। কেন না আমি ও-ঘানিতে নিজেকেও জুতে' দিতে চাইনে,—অপর কাউকেও নয়। আমি চাই অপরের চোখের সে ঠুলি খুলে দিতে; শুধু শিং বাকানোর ভয়ে নিরস্ত হই। ফলে দাঁড়ালো এই যে রসিকতা করা নিরাপদ নয়, আর সত্য কথা বলাতে বিপদ আছে।"

"কিন্তু সমালোচকেরা চক্ষের জলে বক্ষ ভাসিয়ে দিলেও, বঙ্গ-সরস্বতী আর গোবিন্দ অধিকারীর অধিকারভুক্ত হবে না, এবং দাশরথীকেও সারথী করবেন না।"

"উকিল ও কোকিল হচ্চে বিভিন্ন শ্রেণীর জীব—যদিচ উভয়েই বাচাল। এর এককে দিয়ে অপরের কাজ করানো যায় না। তবে কথা হচ্ছে এই যে, যে লঙ্কায় যায় সেই যেমন রাক্ষস হয়ে ওঠে, তেমনি যে আদালতে যায় সেই রাসবিহারী হয়, তা নয়।"

কিন্তু wit এর অস্তিত্ব ছাড়াও চৌধুরী মহাশয়ের প্রবন্ধগুলিতে অন্যজাতীয় উৎকর্ষ বিরল নয়। নিচে তার দৃষ্টান্ত দেওয়া যাচ্ছে :—

"আমাদের দেশে কিছুরই হঠাৎ বদল হয় না, ঋতুরও নয়। বর্ষা কেবল কখন কখন বিনা নোটিশে একেবারে হুড়্দুম্ করে এসে গ্রীষ্মের রাজ্য জবর দখল করে নেয়। ও ঋতুর চরিত্র কিন্তু আমাদের দেশের ধাতের সঙ্গে মেলে না। প্রাচীন কবিরা বলে গেছেন, বর্ষা আসে দিগ্বিজয়ী যোদ্ধার মত—* * * এক বর্ষাকে যাদ দিলে বাকী পাঁচটা ঋতু যে ঠিক কবে আসে আর কবে যায়, তা এক জ্যোতিষী ছাড়া আর কেউ বলতে পারে না। * * * *

ইউরোপ কিন্তু ক্রমবিকাশের জগৎ নয়। * * * বিলেতী ঋতুর চেহারা শুধু আলাদা নয়, তাদের আসা যাওয়ার ভঙ্গীও বিভিন্ন।

সে দেশে বসন্ত, শীতের শবশীতল কোল থেকে রাতারাতি গা ঝাড়া দিয়ে ওঠে, মহাদেবের যোগভঙ্গ করবার জন্য মদনসখা যসন্ত যেভাবে একদিন অকস্মাৎ হিমাচলে আবির্ভূত হয়েছিলেন। কোন এক সুপ্রভাতে, ঘুম ভেঙ্গে চোখ মেলে হঠাৎ দেখা যায় যে, রাজ্যির গাছ মাথায় এক রাশ ফুল পরে দাঁড়িয়ে হাসচে—অথচ তাদের পরণে একটিও পাতা নেই। সে রাজ্যে বসন্তরাজ তাঁর আগমনবার্ত্তা আকাশের নীল পত্রে সাতরঙা ফুলের হরফে এমন স্পষ্ট এমন উজ্জ্বল করে ছাপিয়ে দেন যে, সে বিজ্ঞাপন—মানুষের কথা ছেড়ে দিন—পশুপক্ষীরও চোখ এড়িয়ে যেতে পারে না।

ইউরোপের প্রকৃতির যেমন ক্রমবিকাশ নেই, তেমনি ক্রমবিলয়ও নেই; শরৎও সে দেশে কালক্রমে জরাজীর্ণ হয়ে অলক্ষিতে শিশিরের কোলে দেহত্যাগ করে না। সে দেশে শরৎ তার শেষ উইল, পাণ্ডু-লিপিতে নয়—রক্তাক্ষরে লিখে রেখে যায়, কেন না মৃত্যুর স্পর্শে তার পিত্ত নয়—রক্ত প্রকুপিত হয়ে ওঠে। প্রদীপ যেমন নেভ্বার আগে জ্বলে ওঠে শরতের তাম্রপত্রও তেমনি পড়বার আগে অগ্নিবর্ণ হয়ে ওঠে। তখন দেখলে মনে হয় অস্পৃশ্য শত্রুর নির্ম্মম আলিঙ্গন হতে

আত্মরক্ষা করবার জন্য প্রকৃতিসুন্দরী যেন রাজপুত রমণীর মতো স্বহস্তে চিতা তৈরী করে সোল্লাসে অগ্নিপ্রবেশ করছেন।"

চৌধুরী মহাশয়ের প্রবন্ধগুলিতেই তাঁর গদ্যরীতির উত্তম নিদর্শন বেশি মেলে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর গল্পগুলির রচনা উচ্চশ্রেণীর। এ সকলের শিল্পপদ্ধতি তাঁর নেহাৎ নিজস্ব। এ গল্পগুলিতে মাঝে মাঝে যে একটা স্নিগ্ধ বাস্তবতার আভাস মেলে, সেটি কিয়দংশে ঘটেছে তাঁর অনাড়ম্বর চলতি ভাষার গুণে এবং স্থানে স্থানে wit এর প্রক্ষেপ থাকার ফলে।

আধুনিক বাংলা গদ্যের রীতিবৈচিত্র্য যাঁরা ভালো ক'রে বুঝতে চান চৌধুরী মহাশয়ের রচনা তাঁদের অবশ্যপাঠ্য।

## (গ) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮)

সবুজপত্র পর্বের পূর্ববর্তী রবীন্দ্রগদ্যের প্রভাবে যাঁদের গদ্যরীতি বিকশিত হয়েছে তাঁদের মধ্যে শরৎচন্দ্রের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথের প্রভাবকে স্বীকার ক'রে নিলেও তাঁর রচনারীতির বৈশিষ্ট্য-বর্জিত নয় এবং সে বৈশিষ্ট্যের জন্যেই তাঁর লেখা বাংলার পাঠকসাধারণের এত প্রিয় হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের গদ্য, রূপে ও রসে পরম সমৃদ্ধ হ'লেও এর মধ্যে, স্থানে স্থানে এমন একটু জটিলতা আছে যে, অভিজ্ঞ পাঠক ছাড়া কেউ তার রহস্যভেদ সহজে করতে পারেন না। কিন্তু শরৎচন্দ্রের গদ্য এ দিক দিয়ে প্রায় তুলনাহীন। তিনি যা কিছু লিখেছেন তা প্রায় জলের মতো কঠিনতাবর্জিত; অল্পশিক্ষিত লোকেও তা প'ড়ে সহজে বুঝতে পারে। রচনায় তিনি যে এরূপ প্রাঞ্জলতা সঞ্চার করতে পেরেছেন তার প্রধান কারণ তাঁর ব্যবহৃত শব্দসঞ্চয়ের সুখবোধ্যতা। তিনি কখনো এমন শব্দ ব্যবহার করেন নি যার অর্থের জন্য অভিধান খুঁজতে হয়। তাঁর ব্যবহৃত সংস্কৃত শব্দগুলিও আমাদের হাজার বার শোনা, এবং সাধারণ কথাবার্তায় ও দৈনিক কাগজের পৃষ্ঠায় সুপরিচিত। এ প্রাঞ্জলতার অন্য কারণ, সরলতার প্রতি শরৎচন্দ্রের স্বভাবসিদ্ধ

অনুরাগ। কথাকে অলঙ্কৃত করবার প্রয়াস তাঁর একেবারেই নেই। যদি বা কখনো কোন বাক্যে অলঙ্কার দেখা দিয়েছে সে অলঙ্কার সাদাসিধে উপমারূপকাদির উপরে যায় নি। এ সকলের ফলে শরৎচন্দ্রের রচনা অসামান্য প্রসাদগুণ লাভ করেছে। কানে যাওয়া মাত্রেই তার অর্থ এবং রস শ্রোতার চিত্তে পরিব্যাপ্ত হয়। কিন্তু শরৎচন্দ্রের গদ্য স্বভাবত সহজ সরল হলেও তিনি যে সুগম্ভীর এবং ওজস্বিনী রচনায় অক্ষম ছিলেন তা নয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিচে দুটি স্থান উদ্ধৃত করা যাচ্ছে :—

"কয়েক মুহূর্ত্তেই ঘনান্ধকারে সম্মুখ এবং পশ্চাৎ লেপিয়া একাকার হইয়া গেল। রহিল শুধু দক্ষিণ ও বামে সীমান্তরাল প্রসারিত বিপুল উদ্দাম জলস্রোত এবং তাহারই উপরে তীব্র গতিশীলা এই ক্ষুদ্র তরণীটি এবং কিশোর বয়স্ক দুটি বালক। প্রকৃতি দেবীর সেই অপরিমেয় গম্ভীর রূপ উপলব্ধি করিবার বয়স তাহাদের নহে; কিন্তু সে কথা আমি আজিও ভুলিতে পারি নাই। বায়ুলেশহীন, নিষ্কম্প, নিস্তব্ধ নিঃসঙ্গ নিশীথিনীর সে যেন এক বিরাট্ কালীমূর্ত্তি। নিবিড় কালো চুলে দ্যুলোক ও ভূলোক আচ্ছন্ন হইয়া গেছে; এবং সেই সূচীভেদ্য অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া করাল দংষ্ট্রারেখার ন্যায় দিগন্তবিস্তৃত এই তীব্র জলধারা হইতে কি এক প্রকারের অপরূপ স্তিমিত দ্যুতি নিষ্ঠুর চাপা হাসির মত বিচ্ছুরিত হইতেছে।" (শ্রীকান্ত)

* * * * মুখ তুলিয়া চাহিলাম। সমস্ত বাড়িটা গভীর সুষুপ্তিতে আচ্ছন্ন—কোথাও কেহ জাগিয়া নাই। একবার শুধু মনে হইল, জানালার বাইরে অন্ধকার রাত্রি তাহার কত উৎসবের প্রিয় সহচরী পিয়ারী বাইজীর বুকফাটা অভিনয় আজ যেন নিঃশব্দে চোখ মেলিয়া অত্যন্ত পরিতৃপ্তির সহিত দেখিতেছে।" (শ্রীকান্ত)

শরৎচন্দ্রের গদ্যে প্রসাদগুণের পরেই চোখে পড়ে তার বিশেষণ প্রয়োগের বৈশিষ্ট্য। তাঁর বিশেষণ ব্যবহারের সংযম লক্ষ্য করবার মতো। উল্লিখিত অন্ধকারের বর্ণনাটিতে—'ঘনান্ধকার সম্মুখ পশ্চাৎ লেপিয়া একাকার হইয়া গেল'। সাধারণ লেখক হ'লে এস্থানে 'নিবিড় কৃষ্ণ' বা 'মসীকৃষ্ণ ঘোর অন্ধকার' লিখবার লোভ সামলাতে পারতেন না।

কিন্তু শরৎচন্দ্র এ রকমের বাহুল্য বর্জন কচ্ছেন। তবে বিশেষণ প্রয়োগের খুব মিতব্যয়িতা সত্ত্বেও তিনি প্রয়োজনবোধে এ বিষয়ে বেশ মুক্ত হস্তও হতে পারতেন, যেমন—সেই বর্ণনাটিতেই আছে—'বায়ুলেশহীন, নিষ্কম্প, নিস্তব্ধ, নিঃসঙ্গ নিশীথিনীর এক বিরাট কালীমূর্ত্তি।' একথা বলাই বাহুল্য যে এখানে বিশেষণের বৈচিত্র্যে ও বাহুল্যে তমিস্রা নিশার ঘোররূপ যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে। এতে যে সুন্দর অনুপ্রাস আছে তাতেও বর্ণনার রূপাতিশয় ঘটিয়েছে। পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে, শরৎচন্দ্রের গদ্যের আর এক লক্ষণ এর অলঙ্কৃতির পরিহার। খুব কম স্থানেই তিনি উপমা ও রূপকাদি ব্যবহার করেছেন। এর ফলে তাঁর গদ্য খুব প্রাঞ্জল ও গতিমান্ হয়ে উঠেছে। তবু বৈচিত্র্যের জন্যে তিনি স্থানে স্থানে চমৎকার অলঙ্কারসন্নিবেশ করেছেন। যেমন 'শ্রীকান্তে' আছে :—

"তাহার পরিণত যৌবনের সুগভীর তলদেশ হইতে যে মাতৃত্ব সহসা জাগিয়া উঠিয়াছে, সদ্যনিদ্রোত্থিত কুম্ভকর্ণের মত তাহার বিরাট ক্ষুধার আহার মিলিবে কোথায় ?"

শরৎচন্দ্রের অনুপ্রাসের দৃষ্টান্ত আগে দেখা গিয়েছে। সরল শব্দসঞ্চয়, বিশেষণ ও অলঙ্কার ব্যবহারের স্বল্পতা এবং সুবিবেচনা এই তিনটি জিনিষ শরৎচন্দ্রের গদ্যকে প্রাঞ্জল করবার যে যথেষ্ট সাহায্য করেছে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু রচনা কেবল নিরন্তর সোজা ভাবে চল্‌লে তা পাঠকের নিকট নিতান্ত এক ঘেয়ে মনে হতে পারে। শরৎচন্দ্রের প্রতিভা এই বিপদকে কাটিয়ে উঠেছে কাহিনীনির্মাণের সুকৌশলের দ্বারা এবং প্রবল রসোদ্রেক-ক্ষমতার সাহায্যে। এই রসোদ্রেক ক্ষমতার জন্যেই তাঁর প্রাঞ্জল গদ্য দীর্ঘকাল বাঙালী পাঠকপাঠিকাকে প্রচুর আনন্দ দান করবে।

## (ঘ) শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (জন্ম ১৮৭১)

**শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর** তাঁর দেশবাসীর কাছে আধুনিক ভারতীয় শিল্পকলার প্রবর্তক ও আচার্য হিসাবেই সুপরিচিত, কিন্তু খুব অল্প লোকেই জানে যে, বাংলা গদ্য রচনায় তিনি কী অসামান্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। স্বল্পকাল পূর্বে 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত তাঁর আত্মকাহিনী থেকে জানা যায় যে রবীন্দ্রনাথের তাগিদেই তিনি কলম ধরেছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাছে তাঁর যে শিষ্যত্ব এর মধ্যে শিক্ষানবীশী ছিল না। চিত্রের রেখাবিন্যাসে সিদ্ধহস্ত অবনীন্দ্রনাথ সাহিত্যের লেখাবিন্যাসেও গোড়া থেকে সিদ্ধ হস্তের পরিচয় দিলেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের অনুবর্তী হলেও তাঁর গদ্য রীতিতে কিছু স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় পাওয়া গেল। অবনীন্দ্রনাথের কলম ধরা তুলি ধরার মতোই সার্থক হ'ল। চলতি ভাষায় (এবং ক্বচিৎ সাধু ভাষায়) যে স্বল্প পরিমাণ রচনা তাঁর আছে তা দীর্ঘকাল যাবৎ বাংলা গদ্যের এক শ্রেষ্ঠ সম্পৎ ব'লে বিবেচিত হবে। রবীন্দ্রনাথের গদ্য পড়তে গেলে যেমন পদে পদে মনে হয় একজন কবির লেখা পড়ছি, তেমনি অবনীন্দ্রনাথের অধিকাংশ রচনা পড়লেই মনে হয় রচনাকারী একজন শিল্পী রূপস্রষ্টা। তিনি যে সকল গল্প প্রবন্ধ বা শিশুপাঠ্য কাহিনী লিখেছেন তার সব গুলিতেই তাঁর এই রীতিবৈশিষ্ট্য সমানভাবে ফুটেছে। আগে ছোট ছেলেমেয়েদের জন্যে লেখা বইগুলি নিয়েই আলোচনা করা যাক্। তাঁর 'রা জ কা হি নী', 'শ কু ন্ত লা', 'ক্ষী রে র পু তু ল', 'না ল ক' এগুলি যেন এক একটি জীবন্ত চিত্রশালা। তাঁর বর্ণনা ভঙ্গীতে পাত্র-পাত্রীদের নিয়ে সমস্ত আখ্যানটি সজীব ছবির মতো হয়ে ওঠে। নিচে 'রাজকাহিনী' থেকে খানিকটা তুলে দেওয়া গেল :—

"কিন্তু যখন বালিয় আর দেব ভীলনী দিদির সঙ্গে-সঙ্গে হাসতে হাসতে চলে গেল, যখন সকালের রোদ মেঘের আড়ালে ঢেকে গেল, বাপ্পার একটি মাত্র গাই চরতে-চরতে যখন মাঠের পর মাঠ পার হয়ে বনের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল, যখন বনে আর সাড়া শব্দ নেই, কেবল

মাঝে মাঝে ঝিঝির ঝিনি ঝিনি, পাতার ঝুরু ঝুরু, সেই সময় বাপ্পার বড়ই একা একা ঠেকতে লাগল। তিনি উদাস প্রাণে ভীলনী দিদির মুখেশোনা ভীল রাজত্বের একটি পাহাড়ী গান ছোট একটি বাঁশের বাঁশীতে বাজাতে লাগলেন। সে গানের কথা বোঝা গেল না, কেবল ঘুমপাড়ানি গানের মতো তার বুনো সুরটা মেঘলা দিনের বাদলা হাওয়ায় মিশে স্বপ্নের মতো বাপ্পার চারিদিকে ভেসে বেড়াতে লাগল। যেন আজ তার মনে পড়তে লাগল—ঐ পশ্চিমদিকে, যেখানে মেঘের কালো সূর্য্যের আলো ঝিকি মিকি জ্বলছে, যেখানে কালো কালো মেঘ পাথরের মতো জমাট বেঁধে রয়েছে, সেইখানে, সেই অন্ধকার আকাশের নীচে, তাঁদের যেন বাড়ি ছিল; সেই বাড়ির ছাদে চাঁদের আলোয় তিনি মায়ের হাত ধরে বেড়িয়ে বেড়াতেন; সে বাড়ি কি সুন্দর! সে চাঁদের কি চমৎকার আলো! মায়ের কেমন হাসি মুখ। সেখানে সবুজ ঘাসে হরিণ ছানা চরে বেড়াতেন; গাছের উপর টিয়ে পাখী উড়ে বসত; পাহাড়ের গায়ে ফুলের গোছা ফুটে থাকত;—তাদের কি সুন্দর রং, কি সুন্দর খেলা! বাপ্পা সজলনয়নে মেঘের দিকে চেয়ে চেয়ে বাঁশের বাঁশীতে ভীলের গান বাজাতে লাগলেন;—বাঁশীর করুণ সুর কেঁদে কেঁদে কেঁপে কেঁপে বন থেকে বনে ঘুরে বেড়াতে লাগল।"

উল্লিখিত অংশটিতে অবনীন্দ্রনাথ রূপকথার ভাষার উপরে এমন সুন্দর কৌশলে সাহিত্যের পালিশ দিয়েছেন যাতে আখ্যানটি মুখের কথার সরলতা ও সহজ গতি হারায় নি অথচ রূপকথার মতোই মিষ্টি লাগে। কিন্তু কেবল রূপকথার মতো আখ্যান রচনায়ই নয়, তার চেয়েও গুরুগম্ভীর রচনায় অবনীন্দ্রনাথ নিজের গদ্য রচনার অতুলনীয় ভঙ্গী সার্থকভাবে প্রয়োগ করেছেন। তাঁর 'প থে বি প থে' নামক গ্রন্থ এ শ্রেণীর কয়েকটি রচনার সমষ্টি। এ বই থেকে খানিকটে তুলে দেওয়া গেল:—

"* * * * বাইরের এই শোভার মধ্যে আপনাকে হারিয়ে, আপনাকে সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়ে আছি, এমন সময় একটা প্রাণখোলা

পরিষ্কার বাতাস নদীর এক আঁজলা ঠাণ্ডা জলের ঝাপটায় আমার পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত ভিজিয়ে সমস্ত ডেকটা একবার জলের ঝড়া দিয়ে ধুয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে একটা গোলাপ ফুলের খোস্‌বো চারিদিকে ছড়িয়ে সেই হাঙ্গরমুখো ষ্টিমারের লোকটি বাসন্তী রঙের একখানা রুমালে মুখ মুছতে মুছতে দেখা দিলেন। লোকটির চেহারা এত সুন্দর ইতিপূর্ব্বে তা আমার চোখেই পড়েনি। আজ গোলাপী সাটিনের সদরী, বাসন্তী রঙের ফিন ফিনে ঢাকাই মসলিনের বুটিদার চাপকান, তার উপর চিকনের কাজ করা হাল্কা টুপিটি পোঁরে মূর্ত্তি-মান বসন্তের মতো তাকে দেখতে হয়েছে। সিংহের মতো সরু কোমর, দরাজ বুক নিয়ে লোকটি আমার পাশেই এসে বসলেন। আমি তাঁকে সেলাম না দিয়ে থাকতে পাল্লেম না। তিনি একটুখানি হেসে আমার দিকে একবার ঘাড় নীচু করে চাইলেন। সেই সময় তার চোখ দুটো দেখলেম যেন একটা স্বপ্নের জাল দিয়ে ঢাকা! এমন চোখ আমি কারু দেখিনি,—এ যেন আমার দিকে চেয়ে দেখছে বটে, দেখছে নাও বটে। তখন সেই আচ্ছন্ন চোখের দৃষ্টি সেই বাসন্তী কাপড়ের আভা আর সেই রুমালে ঢাকা গোলাপফুলের রং আমাকে এমন বিহ্বল করেছে যে আমার মনে পড়ে না তাঁকে আমি কোনো প্রশ্ন করেছিলেম কিনা। তিনি যেন আমারই প্রশ্নের জবাবে বল্লেন তবে শুনুন—"

শুধু গল্প বলাতে নয়, ভ্রমণকাহিনী জাতীয় প্রবন্ধেও অবনীন্দ্রনাথের অনবদ্য গদ্যভঙ্গীটি বেশ ফুটে উঠেছে। নিচে তার একটু নিদর্শন দেওয়া গেল :—

"গাড়ির দুইসারি জান্‌লার ভিতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে কেবল মাত্র দুই ফালি আস্‌মানি পর্দ্দা, তার মাঝে মাঝে ঝকঝকে এক একটি তারা।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা নীলের এই দুই যবনিকার ভিতর চলেছি। দক্ষিণে বামে কিছুই দেখছি না; কেবল সম্মুখ থেকে একটার পর একটা ঝনঝার ধাক্কা আসছে আর মাঝে মাঝে হঠাৎ এক একটা

গাছের ঝাপসা মূর্ত্তি চোখের উপর এসে আঘাত কোরেই সরে যাচ্চে—

বিরাট রাত্রির বৈচিত্র্যহীনতার ভিতর দিয়ে উড়ে চলেছি বল্লে ভুল হয়। নিশাচর পাখীরা নীরব নীলের মধ্যে আপনাদের নিশ্চল পাখা মেলিয়ে নিঃশব্দে যেমন ভেসে যায়, এ তেমন করে যাওয়া নয়, এ যেন একটা উন্মত্ত দৈত্য ঢাকা দেওয়া লোহার খাঁচায় আমাকে বন্ধ কোরে পৃথিবীর উপর দিয়ে দৌড়ে চলেছে; তার চলার প্রচণ্ড-বেগে লোহার খাঁচাটা পৃথিবীর বুক আঁচড়ে চারিদিকে অগ্নিকণা ছুটিয়ে অন্ধকুহরের ভিতরে ক্রমান্বয়ে এগিয়ে চলেছে।"

উল্লিখিত স্থলটিতে অবনীন্দ্রনাথ লোহপথে নৈশ ভ্রমণের এক বেশ সরস চিত্র এঁকেছেন। উপরে তাঁর রচনার যে সকল নমুনা দেওয়া হ'ল তার সবগুলিই চলতি ভাষায়। তাঁর অধিকাংশ রচনারই এরূপ। কেবল দুয়েক জায়গায় তিনি সাধুভাষার গদ্য ব্যবহার করেছেন; তাতেও তাঁর নিজস্ব রচনারীতি বেশ সতেজভাবে ফুটেছে। নিচে এরূপ একটি রচনার কিয়দংশ উদ্ধৃত হ'ল :—

কোনার্কের বিরাট আকর্ষণে বাধা দেয় ঐ বনস্পতির শ্যাম যবনিকা। সেটি সরাইয়া মৈত্রবনের ছায়ানিবিড় আশ্রমটি পার হইয়া যে মুহূর্ত্তে কোনার্কের অন্তঃপুরপ্রাঙ্গণে পা রাখিয়াছি অমনি দৃষ্টিমন সকলই, অগ্নিশিখার চারিদিকে পতঙ্গের মতো আপনাকে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া শ্রান্ত করিয়া ফিরিতেছে—কিছুতে আর তৃপ্তি মানিতেছে না।

চিরযৌবনের হাট বসিয়াছে। চির পুরাতন অথচ চিরনূতন কেলিকদম্বতলে নিখিলের রাসলীলা চলিয়াছে—কিবা রাত্রি, কিবা দিন, বিচিত্র বর্ণের প্রদীপ জ্বালাইয়া মূর্ত্তিহীন অনঙ্গ দেবতার রত্ন বেদিটী ঘিরিয়া।

এখানে কিছুই নীরব নাই, নিশ্চল নাই, অনুর্ব্বর নাই। পাথর বাজিতেছে মৃদঙ্গের মন্দ্রধ্বনে, পাথর চলিয়াছে তেজীয়ান অশ্বের মতো বেগে রথ টানিয়া, উর্ব্বর পাথর ফুটিয়াছে নিরন্তর পুষ্পের কুঞ্জলতায়

মত্তো—শ্যামসুন্দর আলিঙ্গনের সহস্রবন্ধে চারিদিক বেড়িয়া! ইহারই শিখরে—এই শব্দায়মান, চলায়মান উর্ব্বরতার চিত্র বিচিত্র শৃঙ্গার-বেশের চূড়ায়—শোভা পাইতেছে কোনার্কের দ্বাদশ নবশিল্পীর মানস শতদল—সকল গোপনতার সীমা হইতে বিচ্ছিন্ন, নির্ভীক, সতেজ আলোকের দিকে উন্মুখ।”

উল্লিখিত স্থলটিতে অবনীন্দ্রনাথের শিল্পীসুলভ সুন্দর হৃদয়াবেগ যেমন অনবদ্য ভাষায় ফুটে উঠেছে, সাধারণ লেখকের কলমে কদাচিৎ তেমনটি ঘটে। এরূপ স্বভাবসিদ্ধ রীতিকৌশলের জন্যে তাঁর গদ্য যথার্থ সাহিত্যরসিকদের কাছে দীর্ঘ-কাল সমাদৃত হবে।

উল্লিখিত চারজন ছাড়াও রবীযুগে বহু লেখক লেখিকা তাঁদের গদ্য রচনাদ্বারা বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন।

# চতুর্বিংশ অধ্যায়

## উপসংহার

প্রায় দেড়শ বছর ধ'রে বাংলা সাহিত্যিক গদ্য নানা লেখকের হাতে বর্তমান অবস্থায় পৌঁছেচে। এই সুদীর্ঘ সময় ধরে গদ্যের যে ক্রমবিকাশ ঘটেছে তার একটা ইতিবৃত্ত পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে দেওয়া হ'ল। বইএর উপসংহারে তার একটা সংক্ষিপ্তসার দেওয়া দরকার, যাতে পাঠকদের মনে এ ইতিহাস সম্বন্ধে আরো স্পষ্টতর ধারণা জন্মে। ষোড়শ শতাব্দীর আগের কোন গদ্য আমাদের হাতে না এলেও, গদ্যের ব্যবহার যে তার অনেক আগে থেকে শুরু হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই; কিন্তু সাহিত্যে গদ্যের ব্যবহার আরম্ভ হয় এদেশে ইংরেজ শাসনের সূত্রপাত হওয়ার পর থেকে। তার আগে গদ্যের ব্যবহার হত শুধু চিঠিপত্র ও দলিল দস্তাবেজে, এবং ক্বচিৎ ধর্মসম্প্রদায়ের ব্যবহার্য পুস্তক পুস্তিকায়। এ ছাড়া গদ্যের যে নানা ব্যবহার ছিল তা প্রায় নগণ্য। প্রাগ্‌আধুনিক গদ্যের যে সকল নমুনা পাওয়া গিয়েছে তাদের দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়: (১) সংস্কৃত-শব্দবহুল রচনা, আরবী-পারশী মিশ্রিত রচনা। প্রথমোক্ত শ্রেণীর গদ্য ছিল, মুখ্যত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের ব্যবহারে, আর শেষোক্ত গদ্যের উৎপত্তি মুসলমান রাজদরবার সম্পর্কিত লোকদের হাতে।

ইংরেজ রাজত্বের সূত্রপাতের সঙ্গে সঙ্গে যে, গদ্যসাহিত্য গড়ে ওঠবার সূত্রপাত হয়েছিল তাতে রামমোহন রায়ের প্রভাব বিশেষভাবে গণনীয়। তিনি ষোড়শবর্ষ বয়সে পৌত্তলিকতার সমালোচনা ক'রে যে বই লিখেছিলেন তাই এ যুগের প্রথম গদ্য গ্রন্থ। এ বই ছাপা হয় নি। ইংরেজ সিবিলিয়ানদের শিক্ষার জন্য স্থাপিত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের উদ্যোগেই বাংলা গদ্য পুস্তক ছাপা শুরু হয়। ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত প্রথম মৌলিক বাংলা গদ্য পুস্তক ছিল ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত রামরাম বসুর রচিত। এই বইখানির পাণ্ডুলিপি রামমোহন রায় দেখে

দিয়েছিলেন। রামরাম বসুর বইএর পর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যক্ষ কেরী ও অন্যান্য কয়েকজন শিক্ষক মিলে পনেরো বছরের মধ্যে বারোখানি গদ্য পুস্তক রচনা করেন। কিন্তু এ সকল পুস্তক খুব দুর্মূল্য হওয়ায় এবং এদের বিষয়বস্তুর অভিনবত্ব ও আকর্ষণ না থাকায়, এরা সাধারণ বাঙালী পাঠকদের মধ্যে প্রায় অপ্রচারিত ছিল। বাংলা গদ্য রচনার বিশেষ প্রচার হ'ল রামমোহন রায়ের লিখিত ধর্ম ও সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধীয় পুস্তক পুস্তিকাদি প্রচারের ফলে। সর্বকার্যে ব্যবহারের উপযুক্ত সমাস-বিরল যে প্রাঞ্জল গদ্য রচনা এখনকার দিনে প্রচলিত, তার সূত্রপাত করেন রামমোহন রায়। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রধান বাংলা শিক্ষক ও গদ্য লেখক হিসাবে যিনি খ্যাতিলাভ করেছিলেন সেই মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের এবং রামমোহনের রচনার সঙ্গে কোন আধুনিক গদ্য রচনার তুলনা করলেই একথা বুঝতে সুবিধা হবে। রামমোহনের নিজের লেখা এবং তার উত্তর প্রত্যুত্তরে যে সকল রচনা প্রকাশ হয়েছিল কেবল যে তাদেরি দ্বারা গদ্য সুপ্রচারিত হ'ল তা নয়। রামমোহনের প্রথম লেখাগুলি প্রকাশের অল্পদিন পরে প্রতিষ্ঠিত 'স্কুল বুক সোসাইটি' এবং নানা সংবাদপত্র দ্বারাও বাংলা গদ্যের প্রচার ও প্রসার লোকসাধারণের নিকট বেড়ে গিযেছিল। রামমোহন নিজেই একখানি সংবাদপত্র প্রকাশ করেছিলেন এবং সেই পত্রের প্রতিক্রিয়ায়ও একাধিক সংবাদপত্র জন্মলাভ করেছিল। স্কুল বুক সোসাইটির কিছুকাল পর থেকে খ্রীষ্টান প্রচারকেরা বাংলায় নানা পুস্তক পুস্তিকা প্রকাশ করতে শুরু করেন। তাতেও বাংলা গদ্য প্রচারিত হওয়ার পথ প্রশস্ততর হয়েছিল। সর্বপ্রথম সুসম্পাদিত সংবাদপত্রপ্রকাশের গৌরবও খ্রীষ্টীয় প্রচারকগণের। এ প্রসঙ্গে শ্রীরামপুরের খ্রীষ্টান মিশনারী মহোদয়গণের ( কেরী মার্শম্যান আদির ) নাম বাংলা গদ্য, তথা সাহিত্যের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

রামমোহন রায়, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ, স্কুল বুক সোসাইটি এবং সংবাদপত্রাদি থেকে বাংলা গদ্যের প্রচার বৃদ্ধি ও সংস্কারের কাজ চলেছিল প্রায় চল্লিশ বছরের উপর ( ১৮০১-১৮৪৩ )। গদ্যের উন্নতি ও সংস্কার-

কল্পে রামমোহনের চেষ্টাই সর্বাপেক্ষা ফলবতী হয়েছিল ব'লে এই সময়কে বলা যেতে পারে 'রামমোহন যুগ'। এ যুগের বাংলা গদ্যে দুটি রীতির দ্বন্দ্ব চলেছিল। গোঁড়া ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ তাঁদের অভ্যস্ত দীর্ঘসমাস ও অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দ দিয়ে রচনাকে অস্বাভাবিক করে তুলতেন। আর রামমোহনের অনুগামীদের দ্বারা প্রায়শ অপেক্ষাকৃত সরল ভাষায়ই বক্তব্য প্রকাশিত হ'ত। খ্রীষ্টান লেখকগণও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের অনুকরণ না ক'রে রামমোহন প্রচারিত সরলতর ভাষারই অনুকরণ করতেন।

১৮৪১ সালে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ববোধিনী সভার মুখপাত্র হিসাবে ( অক্ষয়কুমার দত্তের সম্পাদনায় ) 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রচারিত হওয়ায় কাল ( ১৮৪৩ ) থেকে বাংলা গদ্যের আর এক যুগ আরম্ভ হয়। এর নাম দেওয়া যেতে পারে 'তত্ত্ববোধিনী যুগ'। কারণ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার অনুকরণে বা প্রতিক্রিয়ার ফলে বহু সাময়িক পত্র প্রচারিত হয় এবং এগুলির দ্বারা বাংলা গদ্যে রীতিসৌষ্ঠব ও সাহিত্যিক সৌন্দর্যবিকাশের বিশেষ সহায়তা হয়েছিল। তত্ত্ববোধিনী যুগের শ্রেষ্ঠ লেখকগণ হচ্ছেন :—দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, তারাশঙ্কর তর্করত্ন, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, প্যারীচাঁদ মিত্র, ভূদেব মুখোপাধ্যায়। এঁদের মধ্যে বিদ্যাসাগরের যশ সর্বাধিক হ'লেও বর্তমান বাংলা গদ্যের বিকাশে এর দান সে পরিমাণ নয়। নানা দিক দিয়ে দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার, প্যারীচাঁদ ও ভূদেবের গদ্যই বিশেষ ব্যাপকভাবে ফলপ্রসূ হয়েছিল।

১৮৭২ সালে 'বঙ্গদর্শন' প্রচারের সময় থেকে বাংলা গদ্যের তত্ত্ববোধিনী যুগ শেষ হয়ে 'বঙ্কিমযুগে'র আরম্ভ হ'ল বলা যায়। তত্ত্ববোধিনী যুগের বাংলা গদ্যে যে রীতিপারিপাট্য ও সাহিত্যিক সৌন্দর্য দেখা দিয়েছিল তা পূর্ণতর হ'ল স্বনামধন্য বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে। গোড়ার দিকে প্রায় কেবল বিদ্যাসাগরী গদ্যের অনুকরণ করলেও ১৮৭২ থেকে তিনি বাংলা গদ্যে নূতনতর রীতি প্রবর্তিত করলেন। এ রীতিতে প্যারীচাঁদ মিত্রের প্রভাব ছিল বিলক্ষণ। তখন থেকে তাঁর গদ্য এক অপূর্ব শক্তি ও সৌন্দর্যলাভ করেছিল।

বাংলা গদ্যে বঙ্কিম যুগের পরিসমাপ্তি হল বলা যায় ১৮৯২ থেকে। 'সাধনা' প্রকাশের পর থেকে রবীন্দ্রনাথ, কাব্যের সঙ্গে সঙ্গে গদ্যেরও চর্চায় উৎসাহী হলেন। এরি ফলে বাংলা গদ্যে দেখা দিল 'রবীন্দ্র যুগ'। আধুনিক বাংলা গদ্য যে যথাযোগ্যভাবে সর্বপ্রকার ভাবপ্রকাশের উপযোগিতা লাভ করেছে, তার মূলে রয়েছে রবীন্দ্রনাথের সাধনা। কেবল কাব্যসমৃদ্ধির জন্যে নয় গদ্য রচনার জন্যেও যে, বাংলা সাহিত্য আজ বিশ্বসাহিত্যের দরবারে সমাদর পাওয়ার যোগ্য বিবেচিত হচ্ছে তার প্রধান কারণ রবীন্দ্রনাথের প্রবর্তিত গদ্য। কিন্তু বলা বাহুল্য যে, বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশের ধারা এখানেই শেষ হয়নি। বিরাট্ ভবিষ্যৎ এর সামনে। বহু যোগ্য লেখক ( পুরাতন ও নূতন ) এখনও বাংলা গদ্যের সেবায় রত আছেন। তাঁদের হাতে এর বিকাশের ধারা কোন্ বা কোন্ কোন্ পথ অবলম্বন করে চলেছে, সে সম্বন্ধে কিছু না বললে আলোচ্য ইতিহাস কিয়দংশে অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

আধুনিক কালে যে সকল ব্যক্তি গদ্য লিখছেন তাঁদের মোটামুটি তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায় :—(১) রবীন্দ্রনাথের অবলম্বিত সাধুভাষার অনুকারী, (২) তাঁরই প্রবর্তিত চলতি ভাষার অনুকারী, (৩) বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্যের অনুকারী। এ তিন দলের মধ্যে প্রথম দলই সংখ্যায় সর্বাপেক্ষা বেশি বলে মনে হয়। আর সংখ্যায় বা গুরুত্বে শেষোক্ত দুই দলের মধ্যে, হয়ত চলতি ভাষার লেখকগণই ভারী। এই তিন দলের সংখ্যা বা গুরুত্বের অনুপাত যাই হোক না কেন, এদের প্রথম দ্বিতীয় দলের মধ্যেই উল্লেখযোগ্য লেখকদের সংখ্যা অধিক। অধুনা প্রচারিত মাসিকপত্র ও উপন্যাসগুলি দেখলেই এ কথার প্রমাণ মিলবে। কাজেই সত্যকার প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছে রবীন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত সাধুভাষার গদ্য ও চলতি ভাষার গদ্যের মধ্যে। এ দ্বন্দ্বের ফলে কোনও দিন সাধুভাষা এবং চলতি ভাষার মধ্যে একটি অপরটি কর্তৃক একেবারে পরাজিত হবে কিনা তাতে খুবই সন্দেহ আছে। তবে একথা মনে হয় যে, চলতি ভাষার ব্যবহার অল্পে অল্পে হলেও ক্রমেই বেড়ে চলবে। উল্লেখযোগ্য মাসিকপত্রগুলির কোনো কোনোটিতে কেবল যে চলতি ভাষায় প্রবন্ধ প্রকাশিত হচ্ছে তা নয়

সম্পাদকগণও নিজ নিজ মন্তব্য চলতি ভাষায় লিখছেন। দৈনিক কাগজ-গুলির মধ্যেও সাহিত্যচর্চা উপলক্ষে চলতি ভাষার ব্যবহার বেড়ে চলছে। যে সকল গল্প উপন্যাসের লেখক ইতিপূর্বে ভাবপ্রকাশের জন্য চলিত ভাষার আশ্রয় নিয়েছেন, তাঁদের নাম অধিকাংশ পাঠকেরই সুপরিচিত। কাজেই মনে হয়, বাঙালী ধীরে ধীরে হলেও সাহিত্যের ভাষা সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের মতকে বহুলাংশে গ্রহণ করবে। স্বামীজী লিখে গেছেন (১৯০০):—

"আমাদের দেশে প্রাচীনকাল থেকে সংস্কৃতয় সমস্ত বিদ্যা থাকার দরুণ, বিদ্বান্ এবং সাধারণের মধ্যে একটা অপার সমুদ্র দাঁড়িয়ে গেছে। বুদ্ধ থেকে চৈতন্য রামকৃষ্ণ পর্য্যন্ত যারা "লোক-হিতায়" এসেছেন, তাঁরা সকলেই সাধারণ লোকের ভাষায় সাধারণকে শিক্ষা দিয়েছেন। পাণ্ডিত্য অবশ্য উৎকৃষ্ট ; কিন্তু কটমট ভাষা যা অপ্রাকৃতিক, কল্পিত মাত্র, তাতে ছাড়া কি আর পাণ্ডিত্য হয় না ? চলিত ভাষায় কি আর শিল্পনৈপুণ্য হয় না ? স্বাভাবিক ভাষা ছেড়ে একটা অস্বাভাবিক ভাষা তয়ের করে কি হবে ? যে ভাষায় ঘরে কথা কও, তাতেই ত সমস্ত পাণ্ডিত্য গবেষণা মনে মনে করে ; তবে লেখবার বেলা, ও একটা কি কিম্ভূতকিমাকার উপস্থিত কর ? যে ভাষায় দর্শন বিজ্ঞান চিন্তা কর, দশজনে বিচার কর—সে ভাষা কি দর্শন-বিজ্ঞান লেখবার ভাষা নয় ? যদি না হয় ত নিজের মনে ও পাঁচজনে, ও সকল তত্ত্ববিচার কেমন করে কর ? স্বাভাবিক যে ভাষায় মনের কথা আমরা প্রকাশ করি, যে ভাষায় ক্রোধ, দুঃখ, ভালবাসা ইত্যাদি জানাই—তার চেয়ে উপযুক্ত ভাষা হতেই পারে না ; সেই ভাব, সেই ভঙ্গী, সেই সমস্ত ব্যবহার করে যেতে হবে। ও ভাষার যেমন জোর, যেমন অল্পের মধ্যে অনেক, যেমন যেদিকে ফেরাও সেদিকে ফেরে, তেমন তেমন কোন তৈরী ভাষা কোনও কালে হবে না। * * * *

যদি বল ওকথা বেশ, তবে বাঙ্গালাদেশে স্থানে স্থানে রকমারি ভাষা, কোনটি গ্রহণ করবো ? প্রাকৃতিক নিয়মে যেটি বলবান হচ্চে এবং ছড়িয়ে পড়ছে, সেইটিই নিতে হবে। অর্থাৎ এক কলকেতার

ভাষা। পূর্ব্ব-পশ্চিম, যে যেদিক হতেই আসুক না, একবার কলকেতার হাওয়া খেলেই দেখছি, সেই ভাষাই লোকে কয়। তখন প্রকৃতি আপনিই দেখিয়ে দিচ্ছেন যে, কোন ভাষা লিখতে হবে, যত রেল এবং গতাগতির সুবিধা হবে, তত পূর্ব্ব-পশ্চিম ভেদ উঠে যাবে এবং চট্টগ্রাম হতে বৈদ্যনাথ পর্য্যন্ত ঐ কলকেতার ভাষাই চলবে। কোন্ জেলার ভাষা সংস্কৃতর বেশি নিকট, সে কথা হচ্চে না—কোন ভাষা জিতছে সেইটি দেখ। যখন দেখতে পাচ্চি যে কলকেতার ভাষাই অল্পদিনের মধ্যে সমস্ত বাংলাদেশের ভাষা হযে যাবে, তখন যদি পুস্তকের ভাষা এবং ঘরে কথা কওয়ার ভাষা এক করতে হয় ত বুদ্ধিমান্ অবশ্যই কলকেতার ভাষাটি ভিত্তিস্বরূপ গ্রহণ করবেন। এবার গ্রাম্য ঈর্ষ্যাটিকেও জলে ভাসান দিতে হবে। সমস্ত দেশের যাতে কল্যাণ, সেথা তোমার জেলা বা গ্রামের প্রাধান্যটি ভুলে যেতে হবে।”

এ উক্তি সত্ত্বেও স্বামীজীর কোন কোন লেখা ছিল সাধুভাষায়, এবং তাঁর ইংরাজী বইগুলির বাংলা তর্জমা হয়েছিল সাধুভাষায় এবং তাঁর এ লেখার প্রায় চৌদ্দ বছর পরে (১৯১৪) ‘সবুজপত্র’ প্রকাশের পর সাহিত্যে চলিত ভাষা ব্যবহারের বিরুদ্ধে তুমুল প্রতিবাদের ধ্বনি উঠেছিল। সে যাই হোক, গতানুগতিকতার মোহ ধীরে ধীরে হলেও কেটে যাচ্ছে বলে মনে হয়। চলতি ভাষা সাধুভাষাকে একেবারে লোপ করে দিতে না পারলেও একদিন তারই মত জনপ্রিয় হতে পারবে সে সম্ভাবনা খুব সুদূর বলে মনে হয় না।

# পরিশিষ্ট (১)

## রামরাম বসুর জীবন সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ

### ১। জন্মসাল

বাঙালীর লেখা সর্বপ্রথম প্রকাশিত (১৮০১) মৌলিক বাংলা গদ্য-পুস্তকের রচয়িতা ছিলেন রামরামবসু (সংক্ষেপে 'রাম বসু')। কিছু না কিছু পরিমাণে তাঁর 'রাজ প্রতাপাদিত্য চরিত্রে'র আদর্শেই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ব্যবহারার্থে রচিত অব্যবহিত পরবর্তী এগারো-বারোখানি পুস্তক লেখা হয়েছিল। এ সকল পুস্তকেব সমসাময়িক প্রচার ও প্রভাব নানা কারণে খুব সীমাবদ্ধ[১] থাকলেও, বাংলা সাহিত্যিক গদ্যের পথিকৃৎ হিসাবে এ পুস্তকনিচয়ের লেখকবর্গের নাম প্রশংসার সহিত স্মরণীয়। এজন্যে বাংলা গদ্যের ইতিহাসে রাম বসুর স্থান অত্যন্ত উচ্চে। কিন্তু এ হেন কৃতী পুরুষের সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান খুব বেশি নয়। যত দূর জানা যায় তাঁর সম্বন্ধে সমসমায়িক কোন বাঙালীর স্বলিখিত বর্ণনা বর্তমান নেই। জন টমাস (১৭৮৭-১৮০১) ও উইলিয়ম কেরীর (১৭৬১-১৮৩৪) এবং ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলাশিক্ষক রূপে তিনি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে কাজ করেছিলেন। তাই টমাস ও কেরীর লেখা থেকে এবং ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কাগজপত্র থেকে রাম বসুর সম্বন্ধে নানা তথ্য জানা যায়। এছাড়া অন্য দু-এক জন মিশনারীর লেখার এবং শ্রীরামপুর মিশনের

(১) প্রবাসী ১৩৪৭ আশ্বিন, ৭৯৫-৭৯৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য। 'ফোর্ট উইলিয়ম গ্রন্থমালা'র সমসাময়িক বহুল প্রচার প্রমাণ করবার জন্যে কেউ কেউ লঙ-প্রণীত ক্যাটালগের দোহাই দিয়েছেন। কিন্তু ঐ পুস্তকের ১৩৫ নং অনুচ্ছেদে আছে ঃ—

Krishna Chandra Charitra by Rajib Lochan, 1st. ed. 1805. last 1834··· It was composed at the request of Dr. Carey······and though the price was 5 Rs. for 120 pp. it barely paid its expenses then, so limited was the demand for Bengali books. It was reprinted in London in 1830."

১৮৩০ অথবা ১৮৩৪ সালে পুনর্মুদ্রিত হওয়ার দ্বারা এ জাতীয় পুস্তকের সমসাময়িক প্রভাব কল্পনা করা হাস্যকর। কারণ তখন এর চেয়ে ভালো রচনা অনেক প্রকাশিত হয়েছিল। লঙ-এর out of prin ক্যাটালগখানি ৺দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' পুস্তকের ৬ষ্ঠ সংস্করণের সঙ্গে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। আলোচ্য অংশটি সে বই থেকে উদ্ধৃত।

রিপোর্ট আদিতেও রামবসুর সম্বন্ধে কিছু কিছু বৃত্তান্ত নিবদ্ধ আছে। কিন্তু এ সকলের মধ্যে, নানা কারণে কেরী ও টমাসের লিখিত বৃত্তান্তই সর্বাগ্রে বিবেচ্য। মুখ্যত এ বৃত্তান্তের সারাংশ আশ্রয় করেই এখানে রাম বসুর জীবন সম্বন্ধে আলোচনা করা যাবে।

রাম বসুর সম্বন্ধে কেরী যা লিখেছেন তার অধিকাংশই তাঁর Journal বা দিনলিপির অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এ দিনলিপি কখনো সমগ্রভাবে মুদ্রিত হয় নি। Memoirs of William Carey (London, 1836) নামক পুস্তকে এ দিনলিপির কিয়দংশ মাত্র মুদ্রিত হয়েছে। তাতে রাম বসুর সম্বন্ধে কেরী প্রদত্ত সব বৃত্তান্ত নেই বলেই মনে হয়। খুব সম্ভব এ পুস্তক থেকে সন্ধান পেয়েই স্বর্গীয় নিখিলনাথ রায় শ্রীরামপুরে গিয়ে 'কেরীর অপ্রকাশিত কাগজপত্র' থেকে কিছু অজ্ঞাত-পূর্ব ও মূল্যবান তথ্য বাঙালী পাঠকদের জানিয়েছেন। এ সকল তথ্য সম্বন্ধে ইতিপূর্বে সংক্ষেপে আলোচনা করা গিয়েছে[২]। কিন্তু উক্ত আলোচনা লেখার পরে জানা গেল যে ১৩২৮ সালের 'প্রবাসী' পত্রিকায় (মাঘ, ৫০৪ পৃঃ) 'শ্যামলবর্ম্মা,' নামে কোন এক ব্যক্তি নিখিলনাথ রায়ের উক্তিতে কিছু ত্রুটি আবিষ্কার করেছেন। 'প্রবাসী' খানা সংগ্রহ করে দেখা গেল যে 'শ্যামলবর্ম্মা'র অভিযোগ বিচারসহ নয়। ঐ লেখক **'কেরীর অপ্রকাশিত কাগজপত্রে'র অস্তিত্ব স্পষ্টত স্বীকার করলেও** তাঁর (কেরীর) উক্তির অভ্রান্ততা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন; লেখকের উক্তির মর্ম এই যে, রাম বসু রামমোহন রায়ের চেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ, অতএব তাঁর পক্ষে কোন কালে কোন বিষয়ের জন্য রামমোহন রায়ের নিকট শিক্ষার্থী হওয়া সম্ভবপর নয়। এ সম্বন্ধে উক্ত ব্যক্তি লিখেছেন :—

"Carey সাহেব রাম বসুর পূর্ব্ব জীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিতেন না। ঘনশ্যাম বসুর নিকট শুনিয়া যাহা কিছু জানিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত ঘটনাটি এই :—রামমোহন যখন নিতান্ত বালক তখন রাম রাম বসু ভাল বাংলা লিখিতে পড়িতে পারিতেন। ১৭৮৮ সালে তিনি বেশ ভাল বাংলা কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। ঐ সালে তিনি টমাস সাহেবের মুন্‌শী ছিলেন। তখন রামমোহন বড় জোর ১৪ বছরের বালক।" (প্রবাসী, ১৩২৮ মাঘ, পৃঃ ৫০৪)

এ আপত্তি আপাতত গুরুতর মনে হয় বটে, কিন্তু ধীর ভাবে বিবেচনা করলে এর গুরুত্ব ঢের কমে যায়; টমাসের নিকট চাকরী নেওয়ার

(২) প্রবাসী, ১৩৪৭ চৈত্র, ৭৫১-৭৫২ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

সময়ে রাম বসুর যথেষ্ট পার্শীজ্ঞান ছিল[৩]। সেরূপ জ্ঞান থাকার ফলেই তিনি সুপ্রীম কোর্টের কর্মচারী মিঃ চেম্বার্সের (William Chambers) অনুগ্রহ লাভ করতে পেরেছিলেন। এ চেম্বার্সের সুপারিসেই তিনি ১৭৮৭ সালে টমাসের শিক্ষকতায় নিযুক্ত হন। আচ্ছা, এ সময়ে তাঁর (রাম বসুর) বয়স ন্যূনপক্ষে কত থাকতে পারে? যদি মনে করা যায় যে, সে সময়ে তাঁর বয়স ১৮/১৯ বছরের মতো ছিল তবে অসম্ভাব্য কিছু কল্পনা করা হয় কি? আমাদের কালে ত দেখেছি ১৫ বছরের ছেলেরা ইংরেজীর মতো বিদেশী ভাষা আয়ত্ত করে প্রবেশিকা পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হচ্ছে। এ রকম ছেলে যদি কোন বিদেশীকে বাংলা শেখাবার ভার পায়, তবে তাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছু আছে বলে মনে হয় না। অতএব ১৭৮৭ সালে রাম বসুর বয়স এ রকম ছেলের চেয়েও ৩।৪ বছরের বেশি ছিল মনে করলে সেটা নিশ্চয় কষ্টকল্পনা বলে গণ্য হবে না। কারণ সতেরো বছর বয়সে কালীপ্রসন্ন সিংহ 'বিক্রমোর্ব্বশী' নামে বাংলা নাটক লিখে এর চেয়ে বেশি কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। কাজেই মনে হয় ১৭৮৮ সালে আনুমানিক ২০ বছর বয়সে রাম বসুর পক্ষে পদ্যে খ্রীষ্টকথা রচনা করা অত্যাশ্চর্য ব্যাপার নয়। সে যাই হোক, টমাসের নিকট চাকরী নেওয়ার সময়ে রাম বসুর বয়স হয়ত উনিশ বছরের বেশি ছিল, কারণ যে চেম্বার্সের সুপারিশে তিনি টমাসের চাকরী পান সে চেম্বার্সেরও নিকট তিনি হয়ত দু-এক বছর কাজ করে থাকবেন; তা হ'লে ১৭৮৭ সালে রাম বসুর আনুমানিক বয়স দাঁড়ায় প্রায় একুশ। অর্থাৎ তাঁর জন্ম সাল দাঁড়ায় প্রায় ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি[৪]। কিন্তু এ অনুমানের বিরুদ্ধে প্রবল আপত্তি হচ্ছে টমাসের উক্তি। ১৭৯২ সালে তিনি লিখছেন যে, রাম বসুর বয়স প্রায় পঁয়ত্রিশ বছরের মতো।[৫] টমাসের এই 'আন্দাজী' কথাকে কেউ কেউ 'সন্তোষজনক' তথ্যের মর্যাদা দিলেও এর বিরুদ্ধে দুটী যুক্তি আছে :—

---

(৩) C. B. Lewis, The Life of John Thomas, London, 1873, ৬৫ পৃঃ।

(৪) দীনেশবাবুর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে' (৬ষ্ঠ সং) তিনি লিখেছেন যে, লুইস্ লিখিত টমাসের জীবনচরিত অনুসারে রাম বসুর জন্ম ১৭৬০ সালের কাছাকাছি সময়ে। অনুসন্ধান করে দেখেছি যে উক্ত পুস্তকে এরূপ কোন কথা নেই। রাম বসুর কথা লিখতে গিয়ে দীনেশবাবু আরও অনেক ভুল করেছেন।

(৫) শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্রে'র (কলিকাতা, ১৩৪৩) ভূমিকা পৃঃ /৫, ।৶০ এবং ঐ গ্রন্থকার কৃত 'রাম রাম বসু', কলিকাতা ১৩৪৭, পৃঃ ১, ৬।

(১) যাঁরা একজাতীয়, এবং একদেশে বাস করেন তাঁদের পক্ষেও পরস্পরের বয়স আন্দাজ করা বেশ শক্ত কাজ। আন্দাজে বয়স নির্ণয় করতে গেলে প্রায়শ দেখা যায় যে, প্রকৃত বয়সের সঙ্গে 'আন্দাজী' বয়সের তফাৎ ১০ থেকে ১২ বছরের উপর পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকে। একই বয়সে বিভিন্ন ব্যক্তির শারীরিক গঠন ও স্বাস্থ্যের এতই বিপুল তারতম্য দেখা যায় যে, বয়স আন্দাজ করার কোন নির্ভুল সাধারণ সূত্র আবিষ্কার করা বড়ই দুঃসাধ্য; এবং ভিন্ন দেশবাসী ও ভিন্ন জাতীয় লোকের বয়সের নির্ভুল আন্দাজ করা স্বাভাবিক কারণেই সুকঠিন। (২) যিনি বয়স আন্দাজ করবেন তাঁর মানসিক অবস্থা যদি খুব স্বাভাবিক থাকে তবু এই কাঠিন্যের লাঘব হয় না; কিন্তু সেই মানসিক অবস্থা যদি একটু অস্বাভাবিক (*abnormal*) হয় তবে বয়স আন্দাজ করতে গিয়ে ভুলের সম্ভাবনা ভয়ানক ভাবেই বেড়ে যায়। যে-টমাসের আন্দাজের উপর নির্ভর করে, ১৭৯২ সালে রাম বসুর বয়স ৩৫ বছর মনে করা হয় সে-টমাসের মানসিক গঠন (*constitution*) যে একটু অদ্ভুত রকমের ছিল তার একাধিক প্রমাণ আছে। শ্রীরামপুর মিশনের আদিকর্মী জশুয়া মার্শম্যানের পুত্র জন ক্লার্ক মার্শম্যানের (সংক্ষেপে—'মার্শম্যান') উক্তি (১৮৫৯) থেকে জানা যায় যে টমাস eccentric (খামখেয়ালী)[৬] এবং wayward (ছেলেমানুষের মতো যুক্তিবিচারবর্জিত)[৭] ছিলেন। অধিকন্তু টমাসের চরিত্র সম্বন্ধে উক্ত মার্শম্যান লিখছেন:—

"পর্য্যায়ক্রমে তিনি (টমাস) যে আনন্দবিহ্বলতা ও হতাশভাব এবং উৎসাহ ও মানসিক আলস্য দেখাতেন তাতে তাঁকে সহযোগী হিসাবে বড়ই অবাঞ্ছিত করেছিল। কিন্তু এ কথা ভুললে চলবে না যে, এ দোষ তাঁর মানসিক গঠনের—নৈতিকতার নয়; এবং যে রোগের ফলে তাঁকে (বাতুল) আশ্রমে বাস করতে হয়েছিল সে রোগ যে তাঁর দৈহিক গঠনের অন্তর্নিহিত ছিল এ সম্বন্ধে সন্দেহ নেই।"[৮]

টমাসের এরূপ শোচনীয় মানসিক দুর্বলতা থাকার ফলে তাঁর কৃতকর্মে অদ্ভুতত্ব ছিল প্রচুর, এহেতু তাঁর জীবনী সম্বন্ধে বহুকাল যাবৎ খোলাখুলি ভাবে আলোচনা সম্ভবপর হয় নি। এ বিষয়ে তাঁর জীবনী-লেখক লুইস্ (C. B, Lewis) বলেন, (১৮৭৩) "[ইতিপূর্বে]

---

(৬) J. C. Marshman—the Life and Times of Carey, Marshman and Ward, London 1859, ২৯ পৃ.

(৭) প্রাগুক্ত গ্রন্থ (=প্রা, গ্র,)—৬৬ পৃ,

(৮) প্রা, গ্র, —১৫৩ পৃ,

ব্যাপটিষ্ট মিশনের পুরাণো বন্ধুরা মিঃ টমাসের ইতিহাসের অনেক ঘটনা প্রকাশিত হতে দেন নি। সন্দেহ নেই যে, সে সকল ঘটনা তাঁদের কাছে অগৌরবকর ( discreditable ) বলে বিবেচিত হয়েছিল।"[৯] টমাসের চরিত্রে এরূপ মারাত্মক ত্রুটি থাকার ফলেই ১৮৭১ সনের আগে তাঁর স্মৃতিকথার নির্বাচিত অংশও ছাপা হয় নি। আর তাঁর বৃহৎ জীবনচরিত্র ছাপা হয়েছিল ১৮৭৩ সালে, মৃত্যুর প্রায় সত্তর বছর পরে, যে সময়ে তাঁর দুর্বলতার কথা লোকে অনেকটা ভুলে গেছে। এহেন অব্যবস্থিতচিত্ত ও প্রায় আধপাগলা টমাসের আন্দাজকে রাম বসুর জন্মসময় সম্বন্ধে "সন্তোষজনক প্রমাণ' বলে মনে করা খুবই অসাবধানতার কাজ হবে। এমন অবস্থায় রাম বসুর জন্মসাল নিরূপণের জন্য অন্য প্রমাণের আশ্রয় নিতে হবে। সেরূপ প্রমাণ হয়ত দুর্লভ না হতে পারে কারণ, প্রসঙ্গত কেরী ও রাম বসু সম্পর্কিত ১৭৯৫ সালের বিবরণ বর্ণনা করতে গিয়ে লুইস্ লিখছেন :—

"রাম বসু তখনও কেরীর বাংলা শিক্ষক ছিলেন এবং গ্রামবাসীদের নিকট ( খ্রীষ্টধর্ম্ম ) প্রচারের সময় তাঁর ( কেরীর ) সাহায্য করতেন, কিন্তু তাঁর (রাম বসুর) চরিত্র **যতই পূর্ণভাবে বিকশিত হতে লাগল**, তিনি যে দীক্ষিত খ্রীষ্টান হবেন সে আশা ততই কমতে লাগল।"[১০]

এই চারিত্রিক বিকাশের কথা লিখে লুইস ( হয়ত অজ্ঞাতসারে ) বেশ সুস্পষ্ট ইঙ্গিত করেছেন যে, যখন রাম বসু টমাসের কাজে নিযুক্ত হয়েছিলেন তখন চরিত্র পূর্ণ বিকশিত হওয়ার মতো বয়স তাঁর ছিল না। যদি সে সময় রাম বসুর বয়স ত্রিশ বছরের মতো থাকত তবে লুইসের পক্ষে এরূপ উক্তির কোন সার্থকতা থাকে না। কারণ যে কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তিই স্বীকার করবেন যে ত্রিশ বছর বয়সেই চরিত্রের পূর্ণ বিকাশ হওয়ার সম্ভাবনা সর্বাপেক্ষা বেশী। অবশ্য কোন লোক যদি জড়বুদ্ধি ( mentally defective ) হয়, তবে তার সম্বন্ধে এ নিয়ম খাটবে না। কিন্তু রাম বসুর বুদ্ধির প্রাখর্য সম্বন্ধে সকলেই একমত। অতএব এরূপ অনুমান করা হয়ত অসঙ্গত হবে না যে, টমাসের নিকট চাকরী নেওয়ার সময়ে অর্থাৎ ১৭৮১ সালে রাম বসুর বয়স প্রায় ২১ বছরের মতো ছিল অর্থাৎ তিনি প্রায় ১৭৬৬ সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।[১১]

---

( ৯ ) Life of John Thomas, Preface, p, iv.

(১০) প্রা, গ্র,—২৫৬ পৃ,

(১১) ১৮১৩ সালের ১১ আগষ্ট লিখিত কেরীর পত্রে জানা যায় যে রাম বসুর পুত্র নরোত্তম তখন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে আট বছর ধ'রে কাজ করছেন। ('রামরাম বসু'

## ২। রাম বসু ও রামমোহন

রাম বসুর জন্ম সাল ( প্রায় ১৭৬৬ ) মেনে নেওয়ার কোন দুর্লঙ্ঘ্য আপত্তি যদি আবিষ্কৃত না হয় তবে রামমোহন রায়ের সঙ্গে তাঁর বয়সের তফাৎ দাঁড়ায় ৬ বছরের ( মতান্তরে ৮ বছরের )। বয়সের এহেন বিভিন্নতা এত গুরুতর নয় যে, বয়োধিক ব্যক্তির কখনও কোন বিষয়ের জন্য বয়োকনিষ্ঠ ব্যক্তির নিকট শিক্ষার্থী বা শিষ্য হতে পারেন না। বাস্তবিক এ ক্ষেত্রে বয়সের বাধা একটা বাধাই নয়। অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, মুরারি গুপ্ত, বাসুদেব সার্বভৌম প্রভৃতি চৈতন্যদেবের শ্রেষ্ঠ ভক্ত এবং শিষ্যবর্গ যে তাঁর চেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন, একথা যে-কোন শিক্ষিত বাঙালীর জানা আছে। আর আধুনিক কালেও হয়ত এরূপ বয়োকনিষ্ঠ ব্যক্তির শিষ্যত্ব গ্রহণের দৃষ্টান্ত দুর্লভ নয়।

অতএব কেরীর সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করে যদি কোন ব্যক্তি বিশ্বাস করেন যে, রাম বসু তাঁর জীবনের কোনও সময়ে রামমোহনের নিকট কোন কোন বিষয়ের শিক্ষার্থী হয়েছিলেন এবং তাঁকে ধর্ম্মসংক্রান্ত ব্যাপারেও গুরুর মতো জ্ঞান করেছিলেন, তবে সেই ব্যক্তিকে ভ্রান্ত বিবেচনা করার কোন ন্যায়সঙ্গত কারণ আছে বলে মনে হয় না।

এ স্থলে জিজ্ঞাস্য হতে পারে যে, কোন্ সময়ে রামমোহনের সঙ্গে রাম বসুর ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। রামমোহনের বাল্যে তাঁর সঙ্গে সেরূপ ঘনিষ্ঠতা ও তাঁর শিষ্যত্বগ্রহণ সম্ভবপর নয়। কাজেই পরবর্তী জীবনে যে উভয়ের সংযোগ হয়েছিল একথা অনুমান করা যেতে পারে। ১৭৯৬ সালে কেরীর চাকরী ছাড়ার পর থেকে ১৮০০ সালে কেরীর সঙ্গে পুনর্মিলনের পূর্ব পর্যন্ত রাম বসুর যে সময় কেটেছে, সে সময়েই হয়ত রামমোহন রায়ের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল বলে মনে হয়। কারণ ১৭৯৬ সালে রামমোহনের বয়স চব্বিশ ( মতান্তরে বাইশ ) এবং রাম বসুর বয়স প্রায় ত্রিশ। ১৭৯৬ থেকে ১৭৯৯ পর্যন্ত রামমোহন

---

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত, ১৩৪৭, পৃঃ ৩৩ )। নরোত্তম যদি ২০ বছর বয়সে ঐ কাজ পেয়ে থাকেন (এরূপ অনুমানে হয়ত দোষ নেই, কারণ বিদ্যাসাগরও প্রায় ঐ বয়সেই ঐ কলেজে কাজ পেয়েছিলেন) তবে তখন তাঁর বয়স ছিল ২৮ বছর। রাম বসুর জন্ম যদি ১৭৬৬ সালে হয় তবে মৃত্যুর সময় ( ১৮১৩ ) তাঁর বয়স হয় ৩৭এর কাছাকাছি এবং তার পুত্র নরোত্তমের জন্ম ধরা যেতে পারে তাঁর ১৯ বছর বয়সের সময়। সেকালকার বাল্য-বিবাহের দিনে কেন এখনও এরূপ ব্যাপার আশ্চর্যজনক বা অসম্ভব বিবেচিত হবে কি না সন্দেহ।

কলিকাতায় বাস করেছিলেন।[১২] তার আগেই তিব্বত থেকে ফিরে এসে (১৭৮৮ বা ১৭৮৯) কিছুকাল তিনি পাটনায় পারশী আরবি এবং কাশীতে সংস্কৃত ( বেদান্ত উপনিষৎ ) অধ্যয়ন ক'রে নিজের জ্ঞানভাণ্ডার বিশেষ ভাবে সংবর্ধিত করেছিলেন।[১৩] এহেন জ্ঞানবৃদ্ধ রামমোহনের নিকট যে বয়োজ্যেষ্ঠ রাম বসু সাগ্রহে শিক্ষার্থী বা শিষ্য হয়েছিলেন তা সহজেই অনুমেয়। কাজেই, রাম বসুর গদ্য রচনার পশ্চাতে রামমোহনের আদর্শ ও প্রেরণা কাজে করেছিল ব'লে কেরী যে উক্তি করেছিলেন, তার মধ্যে অবিশ্বাস্য কিছু আছে ব'লে মনে হয় না। পূর্বোক্ত 'শ্যামল বর্ম্মা' নিজ সূক্ষ্মদর্শিতার অভাবে এ সকল কথা ভেবে দেখতে পারেন নি। ১৮০০ সালের শেষভাগ থেকে ১৮০১ সাল পর্যন্ত এবং তার পরেও রামমোহন রায় প্রায়শ কলকাতায় বাস করিতেন। অবশ্য কলকাতা থেকে তিনি মাঝে মাঝে পাটনা, কাশী, রংপুর প্রভৃতি স্থানেও গতায়াত করতেন। অতএব ১৮০১ সালের কোন এক সময়ে রাম বসু যে রামমোহন রায়কে দিয়ে তাঁর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্রে'র পাণ্ডুলিপি দেখিয়ে নিতে পারেন এ কথা অসম্ভব ভাবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে ব'লে মনে হয় না।

## ৩। চরিত্র

রাম বসুর জন্মসাল এবং রামমোহন রায়ের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতার সম্বন্ধে একটা মোটামুটি সিদ্ধান্ত করার পরেই আলোচ্য রাম বসুর চারিত্রিক শুচিতা। নিখিলনাথ রায় 'কেরীর অপ্রকাশিত কাগজ পত্র, থেকে রাম বসুর চরিত্র সম্বন্ধে যে সকল তথ্য আবিষ্কার করেছিলেন দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় সে সকলের অধিকাংশ গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করেন নি। তিনি লুইসকৃত টমাসের জীবনচরিতের নজীরে রাম বসুকে এক অতি নীচাশয়, ভণ্ড, শঠ, কৃতঘ্ন ব্যভিচারী ও নৃশংস ব্যক্তি রূপে চিত্রিত করেছেন।[১৪] তার পর থেকে যাঁরাই রাম বসু সম্বন্ধে লিখেছেন তাঁরাই

( ১২ ) Rai Bahadur R. P. Chanda and Dr. J. K. Majumdar—'Selections from Official Letters and Documents relating to the life of Raja Rammohan Roy' vol. 1. Calcutta, 1938. pp. xxxiv-xxxv.

( ১৩ ) প্রা, গ্র, পৃ xxxii

( ১৪ ) 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' ৬ষ্ঠ সংস্করণ, পৃঃ ৫৭৪-৫৭৯। 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে'র এ অংশটি পূর্বে ১৩২৮ সালের ফাল্গুন মাসের 'বঙ্গবাণী'তে প্রকাশিত হয়েছিল।

প্রায় নির্বিচারে দীনেশ বাবুর পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন এবং রাম বসু যে একজন অতি ঘৃণ্যচরিত্র ব্যক্তি সে সম্বন্ধে তাঁদের বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই। কিন্তু নিখিলবাবুর উক্তির সত্যতা সম্বন্ধে বিশ্বাসবান্ বর্তমান লেখক এ বিষয়ে তাঁদের সঙ্গে একমত হতে পারেন নি। সেই জন্যে তাঁকে লুইস্কৃত টমাসের জীবনী ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক গ্রন্থের আলোচনা করতে হয়েছিল। এ আলোচনার ফল নিরপেক্ষ পাঠকবর্গের নিকট উপস্থিত করা যাচ্ছে।

দীনেশবাবু লুইস্কৃত টমাসের জীবনচরিতে নজীরে, বল্লেন যে, ব্যভিচার ও তদানুষঙ্গিক কোন গুরুতর অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় রাম বসু কেরীর চাকরী থেকে বিতাড়িত হন। ঘটনাটি সম্বন্ধে তিনি টমাসের উল্লিখিত জীবনীর যে যথাযথ অনুসরণ করেছেন তাতে সন্দেহ নেই। কেরীর উক্তি থেকেও জানা যায় যে রাম বাসু কোন অপরাধের জন্যে কর্মচ্যুত হন। কিন্তু অরোপিত অপরাধের গুরুত্ব সত্ত্বেও পরবর্তী কালে কেরী যে কেন তাঁকে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ চাকরী ও তৎসঙ্গে মিশন থেকে বৃত্তি দিয়েছিলেন তার কারণ ঠিক বোঝা যায় না। রাম বসুর মধ্যে নানাগুণের আধিক্যের জন্যেই যদি তাঁকে পুনরায় চাকরীতে নেওয়া সঙ্গত মনে হয়েছিল, তবে তাঁকে বিদায় দেওয়ারই বা কি প্রয়োজন ছিল? কেরীর মত খ্রীষ্টভক্তগণ তাঁকে এ ক্ষমা আগেও করতে পারতেন! এ কথাগুলি ভাবলে কেবল রাম বসুর চরিত্র নয়, কেরী প্রভৃতির চরিত্রও রহস্যজনক মনে হয়। নিখিলনাথ রায়ের উল্লিখিত 'কেরীর অপ্রকাশিত কাগজ পত্রে'র মধ্যে তিনি রাম বসুর সম্বন্ধে কেরীকৃত যে উচ্চ প্রশংসার সন্ধান পেয়েছিলেন, তাতে এ রহস্য আরও ঘনীভূত হয়ে পড়ছে। বেশ মনে হয় রাম বসুর প্রতি দোষারোপের মধ্যে একটা বড় রকমের গলদ্ আছে। এ গলদ্ আরও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে তখন, যখন দেখতে পাই যে পূর্বোল্লিখিত মার্শম্যান, কেরীর সঙ্গে রাম বসুর পুনর্মিলন (১৮০০) সম্বন্ধে লিখছেন :—

"প্রায় এ বছরের মাঝামাঝি শ্রীরামপুর মিশনের প্রতিষ্ঠার কথা শুনে রাম বসু মিশনারীদের সঙ্গে দেখা করতে আসেন। ইনি (পূর্বে) কয়েক বছর ধরে মিঃ টমাসের সাহচর্য করেছিলেন এবং কিছুকাল যাবৎ মিঃ কেরীর মুন্‌শী ছিলেন। সে সময়কার অন্য কোন দেশীয় লোকের চেয়ে খ্রীষ্টধর্মের তত্ত্বসম্বন্ধে তাঁর বোধ স্পষ্টতর ছিল এবং তিনি স্বদেশের লৌকিক কুসংস্কারগুলিকে দার্শনিকজনোচিত অবজ্ঞার সঙ্গে দেখতেন কিন্তু পরিবারের সম্পর্ক ছিন্ন করে নিজেকে খ্রীষ্টান বলে স্বীকার করার পক্ষে

পর্যাপ্ত দৃঢ়সংকল্প তাঁর ছিল না। মিঃ মার্শম্যান ( = জশুয়া মার্শম্যান ) লিখেছেন, "যে সকল বন্ধন পিতার, স্বামীর, সন্তানের এবং প্রতিবেশীর হৃদয়কে জড়িয়ে রাখে খ্রীষ্টের নিকট নিজকে সমর্পণ করিবার আগে সে সকলকে ছিন্ন করা প্রয়োজন।" রাম বসুর খ্রীষ্টধর্মে বিশ্বাসের চেয়ে সে সকল বন্ধন দৃঢ়তর ছিল"।[১৫]

যদি ও লুইসের মতে খ্রীষ্টের প্রতি রাম বসুর ভক্তি প্রদর্শন কেবল ভণ্ডামি এবং সরলপ্রাণ টমাসের অর্থশোষণের কৌশল মাত্র, মার্শম্যানদ্বয়ের উল্লিখিত উক্তি থেকে তেমন কিছু পাওয়া যায় না। বাস্তবিক পক্ষে রাম বসুর চরিত্র যদি বর্ণিতরূপ জঘন্য হত, তবে কেরীর সহযোগী জশুয়া মার্শম্যান যে তা জানতেন না এমন কল্পনা দুষ্কর মনে হয়। অথচ মার্শম্যান যে কেরীর জার্ণাল পড়েন নি একথা ভাবাও শক্ত। কিন্তু এরূপ পরস্পর সংহারক ( *conflicting* ) উক্তি থেকে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কি সম্ভব? টমাসের উল্লিখিত জীবনীখানি ভাল করে পড়লে এ প্রশ্নের সদুত্তর মিলতে পারে। তখন মনে হতে পারে যে, এ প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়া দুঃসাধ্য হলেও হয়ত অসাধ্য নয়। অন্ততঃ একবার চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে।

উপস্থিত সমস্যাগ্রন্থির মোচন দুভাবে হতে পারে: (১) অনুমান করা যেতে পারে যে, রাম বসু একবার অপরাধ করে থাকলেও পরে নিজকে শুধরে ছিলেন এবং খুব সম্ভব রামমোহন রায়ের মহৎ চরিত্রের প্রভাবে রাম বসুর চরিত্রে আশ্চর্য পরিবর্তন এসেছিল, যার ফলে কেরী তাঁকে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কাজে বা মিশনের কাজে নিয়োজিত করতে দ্বিধাবোধ করেন নি। কিন্তু এরূপ অমান অযৌক্তিক না হলেও ঐতিহাসিক সত্যের খাতিরে একে হয়ত পরিত্যাগ করতে হবে।

(২) পূর্বোল্লিখিত লুইসকৃত টমাসের জীবনীতে রাম বসু সম্বন্ধে এমন কতকগুলি ঘটনার উল্লেখ আছে যেগুলিকে সূক্ষ্মভাবে বিচারপূর্বক আলোচনা করলে মনে হয় যে, শত্রুদের ষড়যন্ত্রের ফলেই রাম বসুর বিরুদ্ধ অপবাদ রটেছিল এবং কেরী অজ্ঞতাপ্রযুক্ত তাঁকে দোষী মনে করতে বাধ্য হয়ে কর্মচ্যুত করেছিলেন; পরে নিজের ভুল বুঝতে পেরে রাম বসুকে

(১৫) মার্শমাসকৃত পূর্বোল্লিখিত পুস্তক—পৃঃ ১৩২; রাম বসুর জনৈক জীবনী-লেখক এ পুস্তকের উল্লিখিত অংশটির সংলগ্ন কোনও অংশ তাঁর বইতে উদ্ধৃত করলেও, কি কারণে জানি না, এ অংশটির প্রতি অবহেলা করেছেন ( দ্রঃ 'রামরাম বসু' বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত, পৃঃ ৩৬-৩৭ এবং পূর্বোক্ত 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্রে'র ভূমিকা—পৃঃ ২৸৹ )।

পুনরায় চাকরী দিয়ে পূর্বকৃত ভ্রমের প্রায়শ্চিত্ত করেন। একথাটি শুনে অনেকে আশ্চর্য হতে পারেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও লুইসকৃত টমাসের জীবনীতে রাম বসুর সম্বন্ধে উল্লিখিত ঘটনাগুলিকে ( যে ঘটনাগুলির সম্বন্ধে দীনেশ-বাবু ও তৎপরবর্তী রাম বসুর চরিতলেখকগণ আশ্চর্যজনক ভাবে উদাসীন) লুইসের মতামত থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিরপেক্ষভাবে দেখলে পূর্বোক্ত মতই পোষণ করতে হয়।[১৬]

টমাসের সঙ্গে কিছুকাল মালদহ বাস করার পরে রাম বসু নিজ যোগ্যতা ও মধুর ব্যবহারের দ্বারা এই প্রকারকের প্রীতিলাভ করেছিলেন। মনে হয় এই প্রীতির জন্যে অর্থহীন ও অভাবগ্রস্ত রাম বসুকে টমাস বেতনের অতিরিক্ত অর্থও মাঝে মাঝে দান করতেন। এ অর্থলাভ ছাড়াও রাম বসু টমাসের শিক্ষকতার দ্বারা অন্য দিক দিয়ে লাভবান্ হযেছিলেন। টমাস তখন মালদহের কমার্শিয়াল রেসিডেণ্ট মিঃ উড্নীর পরিবারে বাস করছিলেন। সে হেতু কোম্পানী বাহাদুরের কর্মচারীর উড্নীর বন্ধু টমাসের শিক্ষক-রূপে রাম বসুকে সেখানকার লোকে নিশ্চয়ই একটু সম্ভ্রমের চোখে দেখত। একুশ বাইশ বছরের একজন যুবকের এতটা সৌভাগ্য দেখে সে জায়গায় কোন কোন লোকের পক্ষে ঈর্ষান্বিত হওয়া খুব স্বাভাবিক। টমাসের জীবনীতে বর্ণিত যে সকল ঘটনা এখানে বলা যাবে সেগুলির আলোচনা করলে মনে হয় সত্যি এরূপই কিছু ঘটেছিল। কিন্তু শুধু এরূপ ঈর্ষায় রাম বসুর কোন ক্ষতিই হত না, যদি মিঃ টমাস স্থিরবুদ্ধি ও দৃঢ়চরিত্র লোক হতেন। তাঁর স্বভাবের দুর্বলতার ( বিশ্বাসপ্রবলতা ও ধর্মোন্মত্ততার) কথা যখন ক্রমে লোকে জানতে পারল তখনই ধীরে ধীরে রাম বসুর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের সূত্রপাত হল। মনে হয় ঐ ষড়যন্ত্রের মূলাধার ছিলেন মোহনচাঁদ অধিকারী নামক এক 'গুরুগিরিব্যবসায়ী' লোক। ইনি এক-দিন টমাসের নিকট উপস্থিত হয়ে খ্রীষ্টভক্তি জানাতেই তিনি স্বভাবসিদ্ধ বিশ্বাস-প্রবণতা (credulity) এবং ধর্ম্মান্ধতাবশত তাঁকে খাঁটি লোক মনে করে তদুপযোগী ব্যবহার করতে লাগলেন।[১৭] এ ঘটনার পরে রাম বসু একবার বাড়ি থেকে ফিরে এলে, টমাস তাঁকে খ্রীষ্টান হবার জন্যে পীড়াপীড়ি করলেন ; কিন্তু প্রকাশ্য খ্রীষ্টান হবার পক্ষে তাঁর যে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা আছে তা জানিয়ে দিতেই টমাস আর জোর করলেন না।[১৮] তখন থেকে রাম বসু

---

(১৬) ঘটনাগুলির জন্যে লুইসের উক্তি সংক্ষিপ্ত ভাবে পুনর্বর্ণন করলেও সে সহজ সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য ও টিপ্পনী প্রায়শ উল্লেখযোগ্য মনে করি নি। কারণ রাম বসু যে তাঁর শত্রু মোহনচাঁদের দুষ্কার্যের সহযোগী হতে পারেন নি এ সোজা কথাটি লুইস্ বুঝতে পারেন নি।

(১৭) লুইস—প্রা, গ্র, পৃঃ ১২৪

(১৮) লুইস্—প্রা, গ্র, পৃঃ ১২৫

এবং মোহনচাঁদ দুজনেই টমাসের সাহায্যকারী হিসাবে রইলেন।[১৯] রাম বসু ছিলেন বেতনভুক এবং মোহনচাঁদও মাঝে মাঝে কিছু অর্থ পেতেন। কিন্তু পরবর্তী ঘটনা থেকে মনে হয় মোহনচাঁদ অন্তরে রাম বসুর প্রতি ঘোরবিদ্বেষ পোষণ করতেন। ১৭৮৯ সালের শেষ ভাগে রাম বসু যখন ছুটি নিয়ে দেশে গেলেন তখন মোহনচাঁদ একদিন টমাসের নিকট রাম বসুর চরিত্র সম্বন্ধে এরূপ ইঙ্গিত করলেন যে তিনি ( টমাস ) যাঁকে বিশ্বাসী ও ভক্তিমান সেবক এবং শিষ্য বলে ভাবছেন তিনি নানা প্রতারণা ও দুষ্কর্মে নিপুণ। মোহনচাঁদ আরও বললেন যে, রাম বসু বাড়ি যাওয়ার নাম করে আর এক জায়গায় চাকরী খুঁজতে গিয়েছেন এবং চাকরী না পেলেই ফিরে আসবেন, এবং তিনি বিশ্বাসঘাতক, তাঁর পূর্ব্ব মনিব তাঁকে যে যে কাজের ভার দিয়েছিলেন সে সে কাজই রাম বসু তাঁকে ঠকিয়েছেন, আর তাঁর সম্বন্ধে সব চেয়ে গুরুতর কথা এই যে, তিনি এমন সব ঘৃণার্হ অপরাধ করেছেন যার বর্ণনা শুনলে লোকে ঘৃণায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে পারে।[২০]

এ সকল কথা জেনে টমাস সাময়িক ভাবে একটু দ্বিধাগ্রস্ত ও বিপন্ন হলেন, কিন্তু সত্য নির্ণয় করবার মত স্থিরবুদ্ধি না থাকায় সেদিকে তিনি কোন চেষ্টাই করলেন না। খ্রীষ্টতত্ত্ব জানতে উৎসুক এমন দু একজন লোক সঙ্গে করে রাম বসু যখন ফিরে এলেন তখন তাঁর চরিত্র সম্বন্ধে টমাসের দুশ্চিন্তা হালকা হয়ে গেল, কিন্তু মোহনচাঁদ যে মিথ্যা অভিযোগ এনে থাকতে পারেন এবং সে জন্যে তিরস্কারের যোগ্য, একথা তিনি ভুলেই গেলেন। রাম বসুর সঙ্গে তুল্য ভাবে মোহনচাঁদ টমাসের প্রিয়পাত্র হয়ে রইলেন।

এ ঘটনার অল্পকাল পরে পার্ব্বতী মুখোপাধ্যায় নামক মোহন অধিকারীর এক আত্মীয় এসে তার সঙ্গে জুটে টমাসের অর্থশোষণের কাজে ব্রতী হল।[২১] বলা বাহুল্য, এ লোকটিও মোহনচাঁদের মতো ভণ্ড। খুব সম্ভব মোহনই তাকে নিজের কাজের সুবিধার জন্যে জুটিয়ে ছিলেন এবং টমাসের নিকট রাম বসুকে অপদস্ত করাও হয় ত ছিল এই সংযোগের অন্যতম উদ্দেশ্য। অবশ্য এরূপ ধারণার পরিপোষক গৌণ ছাড়া কোন সোজাসুজি প্রমাণ নেই। সে যাই হোক সুচতুর পার্ব্বতী অল্প দিনের মধ্যেই টমাসের মনকে মুগ্ধ করল। একদা ..কাতা যাত্রার প্রাক্কালে রাম বসু ও পার্ব্বতীর সঙ্গে বসে টমাস যে ভগবৎ প্রার্থনা করেছিলেন তার বিবরণে তিনি লিখেছেন—

(১৯) লুইস্—প্রা, গ্র, পৃঃ ১৪১
(২০) লুইস্—প্রা, গ্র, পৃঃ ১৫৪
(২১) লুইস—প্রা, গ্র, পৃঃ ১৬৫-১৬৬

"মুনশীর (রাম বসুর) প্রার্থনা বেশ বিবেচনাপূর্ণ ও সুশৃঙ্খল হলেও পার্বতীর প্রার্থনার ধরণধারণ ও বক্তব্য তখন আমার নিকট অনির্বচনীয়-রূপে মধুর এবং ভাবোদ্দীপক লেগেছিল"।[২২]

এ ঘটনার কিছু কাল পরে আবার রাম বসুর বিরুদ্ধে টমাসের নিকট মিথ্যাভাষণ, প্রতারণা ও ব্যভিচারের অভিযোগ উপস্থিত হল।[২৩] কিন্তু কে এই অভিযোগ উত্থাপিত করল লুইস্ সে-সম্বন্ধে নীরব। যদি এ ক্ষেত্রে অনুমান অসঙ্গত না হয় তবে ভাবা যেতে পারে যে মোহনচাঁদ বা তারই পক্ষীয় কোন লোক দ্বারা এ কাজ সংঘটিত হয়েছিল। সে যাই হোক্ (লুইসের মতে) রাম বসুর অনুতাপবাণী শুনে টমাস তাঁকে ক্ষমা করলেন। এ ব্যাপারের পরে একদিন টমাস, রাম বসু, মোহন ও পার্বতী এ তিন জনকে স্পষ্ট জানালেন যে যদি তাঁরা খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা না নেন তবে তাঁদের বেতন ও অর্থসাহায্য বন্ধ করে দেওয়া হবে। তখন (লুইসের মতে) তাঁরা তিন জনে সময় ও স্থান নির্দেশ করে দীক্ষা নিতে স্বীকৃত হলেন, কিন্তু যথাকালে দীক্ষার স্থানে কাউকে পাওয়া গেল না।[২৪] এ ব্যাপারে টমাস মোহনচাঁদকেই সব চেয়ে বেশি দায়ী করেছিলেন।[২৫] লুইস কিন্তু টমাসের এ পক্ষপাতের কারণ বুঝতে না পেরে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন।[২৬]

এ সকল ঘটনার কিছুকাল পরে ১৭৯২ সনের গোড়ার দিকে টমাস এক দিন বিলাত চলে গেলেন, এবং রাম বসু ও পার্বতী গিয়ে তাঁকে জাহাজে তুলে দিলে এলেন। কিন্তু কিছুকাল বিলাতে থেকে ১৭৯৩ সালের শেষের দিকে টমাস কেরীকে সঙ্গে করে নিয়ে কলকাতায় ফিরলেন। মিঃ কেরী এদেশে আসবার পরে রাম বসুকে নিজের বাংলা শিক্ষক বা মুনশী নিযুক্ত করলেন। কেরীর সঙ্গে নানা স্থান ঘুরে রাম বসু যখন অবশেষে মদনাবাটিতে বাস করতে লাগলেন, তখন তাঁর শত্রু মোহনচাঁদ আবার সক্রিয় হ'য়ে উঠলেন। টমাস ও কেরী যথাক্রমে মইপালদীঘি এবং মদনাবাটিতে গিয়ে বসলে মোহনচাঁদ এসে তাঁদের দু'জনের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করলেন, কিন্তু পার্বতী তখনও দেখা দিতে চাইল না, কারণ কিছু আগে রাম বসুর সঙ্গে তার ঝগড়া হয়েছিল।[২৭] সে যাই হোক টমাস ও কেরী পার্বতীর খ্রীষ্টভক্তি সম্বন্ধে যে বর্ণনা পেলেন তাতে তাঁদের আশার সঞ্চার

---

(২২) লুইস্—প্রা, গ্র, পৃঃ ১৬৭
(২৩) লুইস্—প্রা, গ্র, পৃঃ ১৭৭
(২৪) লুইস্—প্রা, গ্র, পৃঃ ১৭৯
(২৫, ২৬) লুইস্—প্রা, গ্র, পৃঃ ১৮০
(২৭) লুইস্—প্রা, গ্র, পৃঃ ২৭৬

হ'ল।[২৮] এদিকে মোহনচাঁদও কেরীর আসবার কিছুকালের মধ্যে তাঁর বিশ্বাস অর্জন করলেন।[২৯] মোহনচাঁদের সম্বন্ধে কেরী আদির যখন এরূপ মনের ভাব, তখন মিশনারীরা দিনাজপুর থেকে পাঁচ জন উচ্চবর্ণের হিন্দুর স্বাক্ষরিত এক চিঠি পেলেন। তাতে ছিল খ্রীষ্টতত্ত্ব প্রচারের কাজে মোহনচাঁদের প্রশংসা এবং আবার মোহনচাঁদকে সেখানে পাঠাবার জন্য আবেদন। পত্র পেয়ে মিশনারীরা উল্লসিত হলেও কিছুকাল পরে দেখলেন যে আর ওরূপ চিঠি আসছে না। তখন তাঁরা খোঁজ নিয়ে জানলেন যে ঐ সকল নামের কোন লোকই দিনাজপুরে নেই। চিঠিখানা যে মোহনচাঁদের কারসাজি একথা তাঁরা স্পষ্ট বুঝলেন।[৩০] মোহনচাঁদ তাঁদের নিকট প্রত্যাশিত অর্থ ও সমাদর লাভ করতে না পেরে নিরাশ হলেন। এ ঘটনার কিছুদিন পরে ( ১৭৯৬ আরম্ভ ) রাম বসুর চরম অপমানের দিন ঘনিয়ে এল! কয়েকজন লোক মইপালদীঘিতে টমাসকে জানাল যে, রাম বসু ব্যভিচার ও তদানুষঙ্গিক ঘোর পাপে লিপ্ত হয়েছেন। রাম বসু তখন মইপালদীঘি থেকে প্রায় ষোল মাইল দূরবর্তী মদনাবাটীতে কেরীর মুনশী-রূপে আছেন। কাছেই টমাস কেরীকে ঘটনার অনুসন্ধানের জন্য পত্র দিলেন। পত্র পেয়ে কেরী এ বিষয়ে তদন্ত করলেন, এবং রাম বসু দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় তাকে কর্মচ্যুত করতে হল।[৩১] জানা যায় না কাদের সাহায্যে কেরী এ তদন্তকার্য করেছিলেন এবং এ তদন্তের কাজে মোহনচাঁদ, পর্বতী বা তাদের কোনো অনুগত লোকের সংশ্রব ছিল কি না। এবং কিঞ্চিদূর্ধ্ব দু-বছর এদেশে থেকে কেরী কতটা বাংলা শিখেছিলেন, বা পল্লীগ্রামের লোকদের ষড়যন্ত্র কৌশল ভেদ করার মতো অভিজ্ঞতা তাঁর হয়েছিল কি না, সে সম্বন্ধেও কিছুই স্পষ্ট জানা যায় না। এমন অবস্থায় তাঁর অনুসন্ধানের ফলকে অভ্রান্ত সত্য বলে মেনে নিতে, যে কোন সূক্ষ্মবুদ্ধি লোকেরই দ্বিধা হবে। অতএব নূতন তথ্য আবিষ্কার হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত, রাম বসুর নামে যে কলঙ্ক রটেছে সম্বন্ধে সন্দিহান থাকাই বোধ হয় যুক্তি-যুক্ত। তাঁর শত্রুদের ষড়যন্ত্রই হয় ত এ কলঙ্কের মূল কারণ।

(২৮) পূর্ব্ববৎ

(২৯) লুইস্—প্রা, গ্র, পৃঃ ২৭৭

(৩০) লুইস্—প্রা, গ্র, পৃঃ ২৮৮, ২৮৯

(৩১) লুইস্—প্রা, গ্র, পৃঃ ২৯৪

৩২। বিশেষ দ্রষ্টব্য—প্রবন্ধ অনেক বেশি বড় হবে এ ভয়ে টমাসের জীবনী এবং মার্শমানের বই থেকে অনুবাদিত অংশগুলির মূল এখানে দেওয়া গেল না। যাঁরা সেগুলির মূল ইংরাজী দেখতে চান তাঁরা 'বঙ্গীয় রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি'তে টমাসের জীবনী এবং 'ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী'তে মার্শমানের বইখানা দেখতে পারেন।

# পরিশিষ্ট (২)

## নাটকে ব্যবহৃত গদ্যের দিগ্‌দর্শন

### ১। আরম্ভকালের কথা

গল্প উপন্যাস বা সাধারণ প্রবন্ধ রচনার জন্যে যে গদ্য গ'ড়ে উঠেছে, নাটকে ব্যবহৃত গদ্য তার চেয়ে খুব আলাদা না হ'লেও এর খানিকটে বিশেষত্ব আছে। কারণ নাটকের গদ্য সংলাপাত্মক ব'লে চলতি ভাষায় হতে বাধ্য। কাজেই এ ক্ষেত্রে তথাকথিত সাধুভাষা একান্ত অচল। কিন্তু চলতি ভাষার দাবী সাহিত্যক্ষেত্রে বহুদিন যাবৎ ভালো করে স্বীকৃত হয় নি। তাই নাটকের ব্যবহৃত সংলাপের গদ্য খুব অনায়াসে গড়ে ওঠেনি। আর নাটকীয় প্রয়োজনের জন্যেও সংলাপের গদ্যে একটি বিশেষ রূপ দেওয়া দরকার। বাংলা নাটক লেখকদের একথা বুঝতে সময় লেগেছে ব'লেও নাটকীয় গদ্য পড়ে উঠ্‌তে বেশ সময় লেগেছে, এবং সে হিসাবে এর ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ সাধারণ গদ্যের ইতিহাস থেকে আলাদা ভাবে লক্ষ্য করবার মতো।

বাংলা কথাবার্তার ভাষার দিকে সর্বপ্রথমে নজর দিয়েছিলেন উইলিয়ম কেরী। তাঁর 'কথোপকথন' ( ১৮০১ ) নামক বইতে সেকালকার নানা শ্রেণীর বাঙালীর কথাবার্তার নমুনা সংগৃহীত হয়েছিল। এ নমুনাগুলিতে খানিকটে নাটকীয় রস বিদ্যমান থাকলেও এ বই নাটকজাতীয় নয়; বিদেশীদের বাংলা কথাবার্তা শেখাবার জন্যেই বইখানি রচিত। এতে কেরী গুরুগম্ভীর চালের ( grave style ) যে কথাবার্তাগুলি দিয়েছেন সেগুলিকে পরবর্তীকালের নাটকাদিতে ব্যবহৃত ভদ্রলোকের ভাষার পূর্বাভাষ বলে ধরে নেওয়া যায়। নিচে এর একটি দৃষ্টান্ত উল্লিখিত হ'ল :—

"তাঁহার ভ্রাতুস্পুত্রেরা কেমন আছেন ?"

"তাঁহারা মহারাজ চক্রবর্ত্তী; তাঁহাদের সহিত কার কথা ? তাঁহারদের সহিত প্রতিযোগিতার লোক আমার দেশে নাই।"

"এবারে কোম্পানীর কার্য্য পাইয়া মহা ধনাঢ্য হইয়াছেন; তাঁহারদের সমান ধনী লোক আমার দেশে চাকরি করিয়া হইতে পারে নাই।"

"কেবল ধনীও নয়, বিষয়ও অনেক করিয়াছে ; আজি লাগাএদ কম বেশ লাকো টাকার জমিদারি করিয়াছে।"

"সমস্তই ভাগ্যের বশীভূত, দেখ দিকি তাঁহারা কি ছিলেন কি হইয়াছেন ? আঙ্গুল ফুলিয়া কলাগাছ হইয়াছে।

"তাঁহারদের পূর্ব্ব বিবরণ আমরা সমস্তই জানি। মাতাপিতার দুঃখের পরিসীমা ছিল না।"

"যত্তক্ষণে বড় ভট্টাচার্য্য কিছু দিতেন তবেই সেদিন নির্ব্বাহ হইত নতুবা হরিমটুক।"

উল্লিখিত স্থলটিতে সংস্কৃত শব্দ নিতান্ত কম থাকলেও এ গদ্য বেশ স্বাভাবিক ও লঘুগতি। নাটকে এ জাতীয় গদ্যের ব্যবহার মোটেই অসঙ্গত নয়, আর পণ্ডিতি গদ্যের প্রভাব স্বীকার না ক'রে, বাংলার নাটকীয় গদ্য তার পদচারণা অভ্যাস করতে পারে নি। দৃষ্টান্তস্বরূপ **রামনারায়ণ তর্করত্নের** লেখার উল্লেখ করা যেতে পারে। সর্বাগ্রে অভিনয় ক্ষেত্রে বিশেষ সম্মান পেয়েছিল বলেই তাঁর নাটক গুলির গদ্য নিয়ে আলোচনা শুরু করতে হয়।

রামনারায়ণের নাটকে চলিত ভাষার উত্তম সংলাপ বেশ সুলভ. কিন্তু তা সত্ত্বেও উচ্চশ্রেণীর পাত্রদের মুখ তিনি পণ্ডিতি গদ্য ব্যবহার না করে পারেন নি। নিচে এর একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাচ্ছেঃ—

"কুলধ। চল ভাই, এখন ঘরে যাওয়া হউক, অনেক বেলা হয়েছে।

কুলপা। (ঊর্দ্ধবিলোকন করিয়া) এ কি মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত! সহস্রকিরণ সূর্য্য প্রচুর কিরণ প্রদানে আপনার সহস্রকিরণ নামই কি সার্থক করিতে উদ্যত হইযাছেন ? এক্ষণে অনবরত পথপরিশ্রান্ত ও দিনকর কিরণে নিতান্ত ক্লান্ত পান্থ লোকেরা সন্তাপশান্তি নিমিত্ত ছায়াপ্রধান পাদপতলে পল্লব শয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রা ভজনা করিতেছে। মহীরুহচয় একান্ত পবনপাতবিরহে সজ্জনমানসের ন্যায় চাপল্য পরিত্যাগ করিয়া স্থির ভাবে অবস্থান করিতেছে। * * * * * অতএব এতাদৃশ সময়ে আমিও পরিশ্রম স্বীকার করিতেছি। গৃহে গমন করিয়া মধ্যাহ্নিক কর্ম্ম সম্পন্ন করি। * * * *

রামনারায়ণের রচিত সংলাপে যে পণ্ডিতী গদ্যের প্রভাব সহজেই চোখে পড়ে তার জন্যে তাঁকে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না। স্বয়ং যে ইংরেজীনবীশ মাইকেল, তাঁর প্রথম নাটকের গদ্যও এ দোষে কিয়ৎ পরিমাণে দুষ্ট।

## ২। মাইকেল মধুসূদন দত্ত

মাইকেল আধুনিক ধরণের নাটক রচনার প্রবর্তক। তাঁর 'শর্ম্মিষ্ঠা' এ বিষয়ে পরবর্তীদের পথপ্রদর্শক। এ বই খানিতে নাগরিকগণের কথোপকথন তাঁর পণ্ডিতী ধরণের ভাষার উত্তম দৃষ্টান্ত। নিচে এর কিয়দংশ দেওয়া হ'ল :—

"প্রথম। আহা! কি সমারোহ! মহাশয়, ঐ দেখুন,—

দ্বিতীয়। আমার দৃষ্টিপথে সকল বস্তুই যেন ধূসরময় বোধ হচ্চে। ভাই হে, সর্ব্বচোর কাল সময় পেয়ে আমার দৃষ্টিপ্রসর প্রায়ই অপহরণ করেছে।

প্রথম। মহাশয়! ঐ দেখুন, কত শত হস্তিপকেরা মদমত্ত গজপৃষ্ঠে অরূঢ় হয়ে অগ্রভাগে গমন কচ্ছে। আহা!—এ কি মেঘাবলী না পক্ষহীন অচলকুল আবার সপক্ষ হয়েছে? আহা, মধ্য ভাগে নানা সজ্জায় সজ্জিত বাজিরাজীই বা কি মনোহর গতিতে যাচ্চে। মহাশয়! এবার ঐ রথসংখ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। ঐ দেখুন শত শত পতাকাশ্রেণী আকাশমণ্ডলে উড্ডীয়মান হচ্চে। * * * (নেপথ্যে মঙ্গল বাদ্য) ঐ দেখুন, মহারাজ রথোপরি মহাবল বীরদলে পরিবেষ্টিত হয়ে রয়েছেন। আহা মহারাজের কি অপরূপ রূপলাবণ্য! বোধ হচ্চে, যেন অদ্য স্বয়ং পুরুষোত্তম বৈকুণ্ঠনিবাসী জনগণ-সমভিব্যাহারে গরুড়ধ্বজ রথারোহণে কমলার স্বয়ংবরে গমন কচ্ছেন।

এরূপ অস্বাভাবিক কথাবার্তার গদ্য মাইকেলের পরবর্ত্তী নাট্যরচনা থেকে ধীরে ধীরে বিদায় নিয়েছিল। 'পদ্মাবতী' নাটকের রাজার উক্তি এর দৃষ্টান্তরূপে উল্লিখিত হতে পারে। নিচে এর কিছু অংশ তুলে দিচ্ছি :-

রাজা। ( চতুর্দ্দিক অবলোকন করিয়া স্বগত ) হরিণটা দেখতে দেখতে কোন দিকে গেল হে? কি আশ্চর্য্য! আমি কি নিদ্রায় আবৃত হয়ে স্বপ্ন দেখ্‌ছি? আর তাই বা কেমন ক'রে বলি। এই ত ভগবান বিন্ধ্যাচল অচল হয়ে আমার সম্মুখে রয়েছেন। ( চিন্তা করিয়া ) এই পর্ব্বতময় প্রদেশে রথের গতিরোধ হয় ব'লে আমি পদ-ব্রজে হরিণটার অনুসরণক্লেশ স্বীকার করে, অবশেষে কি আমার এই ফল লাভ হোলো যে আমি একলা একটা নির্জ্জন বনে এসে পড়লেম। মরুভূমিতে মরীচিকা বারিরূপে দর্শন দেয়, তা এ স্থলে সে কি মায়ামৃগ হয়ে আমাকে এত বৃথা দুঃখ দিলে?........."

উল্লিখিতাংশের রচনায় সংস্কৃতশব্দ প্রচুর থাকলেও তা বেমানান হয় নি। পরবর্তীকালের নাটকে, বিশেষ করে যাত্রার 'পালা' রচনায় এ শ্রেণীর গদ্য বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। তবে লেখকদের রুচির তারতম্য অনুসারে তারও মাঝে মাঝে সংস্কৃত শব্দের আধিক্য বা অল্পতা ঘটেছে। কিন্তু এ সকলই হ'ল নাটকে উত্তম পাত্রপাত্রীদের সম্বন্ধে ব্যবস্থা। রাজারাজড়া, মন্ত্রী, সেনাপতি, মুনি ঋষি বা রাণী আদির মুখেই উল্লিখিত শ্রেণীর ভাষা দেওয়া হ'ত। বিদূষক, নাগরিক বা সাধারণ জনতার মুখে ভিন্ন ধরণের অর্থাৎ আরও হালকা ভাষা দেওয়া দরকার। কিন্তু গোড়ার দিকের নাটক লেখকেরা এ বিষয়ে তেমন সাবধানতা দেখাতে পারেন নি। মাইকেলের 'শর্ম্মিষ্ঠা' নাটক থেকে বিদূষকের একটি উক্তি নিচে দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লিখিত হচ্ছে :—

"বিদূ। উঃ আজ যে আপনার গাঢ় ভক্তি দেখতে পাচ্চি। লোকে বলে যে,দৈত্যদেশে সকলেই পাপাচার, দেবতা ব্রাহ্মণকে কেউ শ্রদ্ধা করে না; কিন্তু আপনি যে ঐ দেশে কিঞ্চিৎকাল ভ্রমণ করে দ্বিজভক্ত হয়েছেন, এ ত সামান্য চমৎকারের বিষয় নয়। বয়স্য! আপনার কি মহর্ষি ভার্গবের সহিত কোন বিষয়ক বিবাদ হয়েছে? বলুন দেখি মহর্ষি শুক্রাচার্য্যের আশ্রমে কি কোন নন্দিনীনাম্নী কামধেনু আছে,না আপনি তার দেবযানী নাম্নী নন্দিনীর কটাক্ষশরে পতিত হয়েছেন? বয়স্য, বলুন দেখি, শুক্রকন্যা দেবযানীকে আপনি দেখেছেন কিনা?"

উপরে উদ্ধৃত উক্তি সাধুভাষা মূলক হ'লেও 'শর্ম্মিষ্ঠা' নাটকেরই পরবর্ত্তী অংশে মাইকেল বিদুষকের মুখে আরো একটু হালকা ভাষা দিয়েছেন। নিচে তার কিয়দংশ উদ্ধৃত হ'ল :—

বিদূ ( স্বগতঃ ) এই ত মহিষীব পরিচারিকাদের উদ্যান; তা কৈ? মহারাজ কোথায়? রক্ষক বেটা মিথ্যা কথা বল্লে না কি? কি আপদ! প্রিয় বয়স্য অস্ত্রধারী ব্যক্তির নাম শুনলেই একেবারে নেচে উঠেন। ছি! ক্ষত্রজাতির কি দুঃস্বভাব। এঁদের কবি ভায়ারা যে নরব্যাঘ্র বলেন সে কিছু অযথার্থ নয়। * * * * যা হোক মহারাজ গেলেন কোথায? তিনি যে একাকী দস্যুদলের সঙ্গে যুদ্ধ কত্তে বেরিয়েছেন একথা শুনে পুরবাসীরা সকলে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়েছে * * *। কি উৎপাত! ডাঙ্গায় বসে যে মাছ বড়শীতে অনায়াসে গাঁথা যায়, তার জন্যে কি জলে ঝাঁপ দেওয়া উচিত? ( চিন্তা করিয়া ) এও কিছু অসম্ভব নয়। দেখ এই উদ্যানের চতুষ্পার্শ্বে রাণীর পরিচারিকারা বসতি করে। তারা সকলেই দৈত্যকন্যা। শুনেছি, তারা নাকি পুরুষকে ভেড়া ক'রে রাখে। * * যদিও আমি মহারাজের মতন স্বয়ং মূর্ত্তিমান মন্মথ নই, তবু আমি যে নিতান্ত কদাকার, তাও বলা যায় না। কে জানে যদি আমাকে দেখেও আবার কোন মাগী ক্ষেপে ওঠে, তা হলেই ত আমি গেলাম! * * * ( নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিল সচকিতে ) ওকি? ঐ না—এক মাগী আমার দিকে তাকিযে রয়েছে, ও বাবা, কি সর্ব্বনাশ। ( বস্ত্রেব দ্বারা মুখাবরণ ) মাগী আমার মুখটা না দেখতে পেলেই বাঁচি। হে প্রভু অনঙ্গ! তোমার পায়ে পড়ি, তুমি আমাকে এ বিপদ হ'তে রক্ষা কর! তা আর কি? এখন দেখ্‌ছি, পালাতে পল্লেই রক্ষা। (বেগে পলায়ন )"

এতে সাধুভাষার প্রভাব থাকলেও উদ্ধৃতাংশটির ভাষা অধিকাংশ স্বাভাবিক হয়ে এসেছে, যদিও সেকালে প্রচলিত সাধুভাষার প্রভাব মাইকেল ভালো ভাবে অতিক্রম করতে পারেন নি।

মাইকেলের প্রহসন দুখানির ভাষার আদর্শ ছিল প্যারীচাঁদ মিত্রের

লেখা, 'মদ খাওয়া বড় দায়', 'জাত রাখার কি উপায়' নামক নকশাদ্বয়। এ সম্বন্ধে ইতিপূর্বে আলোচনা করা গিয়েছে। মাইকেল যে ভাষায় তাঁর প্রহসন দুখানি লিখে গেছেন সে ভাষা আজও পুরাণো হয় যায় নি।

## ৩। দীনবন্ধু মিত্র

মাইকেল যে নাটকীয় গদ্যের প্রবর্তন করেন পরবর্তী নাট্যকার দীনবন্ধু তা পুরোদস্তুর অনুসরণ করেন নি। তাঁর লেখা সংলাপে মাঝে মাঝে সাধুভাষার মিশ্রণ ঘটেছে। নিচে 'নীলদর্পণ' থেকে একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাচ্ছে :—

"গোপী। আমি জানতাম, গোলক বোস বড় ভীত মানুষ, ফৌজদারীতে যাইতে হইলে পাগল হইবে। নবীন বোসের যেমন পিতৃভক্তি, তাহা হইলে বেটা কাজে কাজেই শাসিত হইবে; এই জন্য বুড়োকে আসামী করিতে বল্লাম। হুজুর যে কৌশল বাহির করিয়াছেন, তাহাও মন্দ নয়, বেটার পুষ্করিণীর পাড়ে চাষ দেওয়া হইয়াছে। উহার অন্তঃকরণে সাপের ডিম পাড়িয়াছে।"

দীনবন্ধু মিত্রের পরবর্তী নাটকগুলিতেও এজাতীয় সাধুভাষা মেশানো কথোপকথনের ভাষা দেখতে পাওয়া যায়। মনে হয় এদিক দিয়ে প্যারীচাঁদের 'আলালে'র ভাষার প্রভাব তাঁর উপর কার্যকরী হয়েছিল। কারণে আগেই দেখা গিয়েছে যে তাঁর ব্যবহৃত কথ্যভাষায়ও মাঝে মাঝে সাধুভাষার মিশ্রণ রয়েছে। সাধুভাষার মিশ্রণ ছাড়াও দীনবন্ধুর ব্যবহৃত উত্তম পাত্রদের গদ্যসংলাপে অন্যান্য দোষ দেখা যায়; যেমন বৃহৎ সমাস ও বহু সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ। নিচে এর কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাচ্ছে :—

"যোগ। অতি মনোহর স্বপ্ন।—একদা কাশীধামে অযোধ্যা নিবাসী আমার পরম মিত্র মহীপৎ সিং তীর্থপর্য্যটন অভিলাষে আগমন করেন। ইন্দীবরবিনিন্দিত নীলনয়নশোভিতা বিদ্যুল্লতাতুল্যা অহল্যানাম্নী অবিবাহিতা দুহিতা সমভিব্যাহারে ছিল। কন্যার

বয়স অষ্টাদশ বৎসর। অকস্মাৎ মহীপৎ মানবলীলা সংবরণ করিলেন। শোকাকুলা অহল্যা একাকিনী,—আশু স্বদেশগমনে উপায়হীনা। এই সময়ে এ প্রদেশের এক ধনাঢ্য লম্পট কাশীতে বাস করে। ঐ নীচান্তঃকরণ, মহীপতের পাণ্ডাকে সহস্র মুদ্রা দিয়া অচতুরা অবলাকে বিবাহব্যপদেশে কানপুরে লইয়া যায়। কুলললনা কৌশলে লম্পটের করগত শ্রবণে, আমার লোমকূপ দিয়া অনলকণা বহির্গত হইতে লাগিল ; তদ্দণ্ডে ভয় প্রদর্শনে পাণ্ডাকে বশীভূত করিয়া তাহার দ্বারা ম্যাজিষ্ট্রেটকে সংবাদ দিলাম।"

উত্তম পাত্রপাত্রীদের মুখের কথায় প্রায়শ এরূপ কৃত্রিম ভাষা প্রয়োগ করলেও দীনবন্ধু এক এক স্থানে বেশ সরস ও স্বাভাবিক কথ্য ভাষা ব্যবহার করেছেন। যেমন—

"রাজীব। উপরি কি আছে ?

সুশীল। যারা সত্যের মাহাত্ম্য জানে তারা উপরি কাকে বলে জানে না।

রাজীব। অপর লোকের কাছে এইরূপ বলতে হয়, কিন্তু আমার কাছে গোপন করার আবশ্যক কি ?

সুশীল। আপনি বিবেচনা করেন, আমি মিথ্যা কথা বলে থাকি ?

রাজীব। দোষ কি, তোমাদের একালে কেমন এক রকম হয়েছে মিথ্যা কথা কবে না, ভালতেও না, মন্দতেও না। বলতে দোষ নাই, আমি তো আর সিঁদকাটি গড়িয়ে চুরি কত্তে বলছিনে। কলমের জোরে বা মোড় দিযে যে টাকা নিতে পারে সে তো বাহাদুর।

সুশীল। * * * যবনের অন্ন খেতে আপনার যেরূপ ঘৃণা হয়, আমার মিথ্যা প্রবঞ্চনায় সেইরূপ ঘৃণা হয়।

রাজীব। তোমার বাপ অতি মুর্খ তাই তোমারে কলেজে পড়তে দিয়েছে। কলেজে পড়ে কেবল কথার কাপ্তেন হয়, টাকার পন্থা দেখে না—সৎপরামর্শ দিতে গেলেম, একটা কদুত্তর ক'রে বসলে।"

## ৪। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

নাট্যকার হিসাবে দীনবন্ধুর পরেই উল্লেখ করতে হয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম, কিন্তু এঁর রচিত সংলাপের গদ্য দীনবন্ধুর সংলাপের গদ্যের চেয়ে ঢের ভালো; এঁর 'অশ্রুমতী' নাটকের ভাষা প্রায় পঁয়ষট্টি বছর পরেও বিশেষ সেকেলে হয়ে যায় নি। নিচে এ বইএর রচনায় কিছু নিদর্শন উদ্ধার করা যাচ্ছে:

"প্রতাপ। * * * * * বিশেষতঃ বিলাসই আমাদের সর্বনাশের মূল—বিলাসেই আমরা উৎসন্ন যাই—বিলাসকে বিষবৎ পরিত্যাগ করা উচিত।

মহিষী। কিন্তু মহারাজ সৌভাগ্যলক্ষ্মী যতদিন প্রসন্ন থাকেন, ততদিন কৃতজ্ঞ হয়ে তাঁর প্রসাদ কি ভোগ করা উচিত নয়?

প্রতাপ। কি বল্লে মহিষি—সৌভাগ্যলক্ষ্মী? সৌভাগ্যলক্ষ্মী কি আর আছে? সৌভাগ্যলক্ষ্মী অনেকদিন যে চিতোর পরিত্যাগ করেছেন তা কি তুমি জান না?—হা! যে অশুভ দিনে চিতোর মুসলমানের হস্তগত হয়েছে সেই অবধি লক্ষ্মী আমাদের পরিত্যাগ করেছেন। আর এখন আমাদের কি আছে—চিতোরের যখন স্বাধীনতা গেছে তখন সকলই গেছে—( উঠিয়া ) যে চিতোর পূজনীয় বাপ্পারাওর স্থাপিত যে চিতোর আমার পূর্ব্বপুরুষের বাসস্থান—যে চিতোর স্বাধীনতার লীলাস্থল—সে চিতোর যখন গেছে, তখন আর আমাদের কি আছে? মহিষি, তোমরা স্ত্রীলোক, তোমরা বস্ত্র, অলঙ্কার, ধন, ধান্যকেই লক্ষ্মী ব'লে জ্ঞান কর—কিন্তু তোমরা জান না স্বাধীনতাই সৌভাগ্যের প্রাণ—স্বাধীনতাই—"

উল্লিখিতাংশে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দীর্ঘ সমাসাদির আড়ম্বর না করেও যে পরিমাণ ওজস্বিতা সঞ্চার করেছিলেন তা সেকালে কেন তাঁর অব্যবহিত পরবর্তী কালের নাট্য-সাহিত্যেও বিশেষ সুলভ নয়।

## ৫। গিরিশচন্দ্র ঘোষ

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পরেই নাট্যজগতে ঘটে গিরিশচন্দ্রের অভ্যুদয়। তাঁর পৌরাণিক নাটকগুলিই তাঁকে বিশেষ জনপ্রিয় করে ছিল। কিন্তু

এ সকল নাটকের সংলাপে তিনি কখনো গদ্যকে মুখ্যস্থান দেন নি। তাঁর নামে পরিচিত 'গৈরিশ ছন্দ'কেই তিনি এ নাটক গুলিতে এবং অন্যান্য কোনো কোনো নাটকে গদ্যের কাজে লাগিয়েছেন। গদ্যের মধ্যে ওজস্বিতা সঞ্চার বেশ শক্ত বলে তিনি এক্ষেত্রে ছন্দের সাহায্য নিয়েছিলেন। উক্ত পাত্র পাত্রীদের সংলাপে দু'এক স্থানে যে গদ্য ব্যবহার করেছেন তা চলনসই গোছের। এর একটা দৃষ্টান্ত নিচে দেওয়া গেল :—

"গিরি। মহিষি! অধিরা হ'ও না; দেখ রজনী গভীরা, প্রকৃতি তিমিরবসনে আবৃতা, এ সময়ে সেই যোগিনী পরিবেষ্টিতা ভয়ঙ্করী কৈলাসপুরীতে কেমন ক'রে গমন করি, কিঞ্চিৎ ধৈর্য্যাবলম্বন কর।

মেনকা। মহারাজ! তুমি পাষাণ, নতুবা এ দুঃস্বপ্নের কথা শুনে কিরূপে নিশ্চিন্ত আছ! লতিকার ক্রোড় হ'তে প্রফুল্ল কুসুমটিকে যখন ছিন্ন ক'রে লয়ে যায়, লতা নীরবে রোদন করে। লতার হৃদয় নাই, তবু রোদন করে; ফুলটিকে আদর করবে জানে তবু রোদন করে। আমার এই ফুলটিকে হস্তি পদতলে দিয়েছি। আমি রমণী, আমি রোদন কচ্ছি কেন? মহারাজ, আমি রোদন কচ্ছি কেন?— আহা মার চাঁদবদন সম্বৎসর দেখিনি—"

গিরিশচন্দ্র তাঁর সামাজিক নাটকগুলিতে যে গদ্য সংলাপ লিখেছেন একেবারেই সাদাসিধে এবং অনেকাংশে সাহিত্যরসবর্জিত। সমগ্র নাটক থেকে বিচ্ছিন্ন করলে আংশিকভাবে এ সংলাপ গুলিকে নিতান্ত আকর্ষণহীন মনে হবে। নিচে প্রফুল্ল' নাটক থেকে কিয়দংশ উদ্ধৃত করা হল :—

"যোগেশ। বেরিও হে, আদালত বন্ধই হোক আর যাই হোক্, বেরুন ভাল। শোন, একটা কথা বলি—যদিচ আমরা পৈতৃক সম্পত্তি কিছু পাইনি, কিন্তু আমি তোমাদের পেয়েছিলুম, নইলে আমি এত উৎসাহের সঙ্গে কাজ করতে পাত্তেম না। সমস্তদিন খেটে যখন রাত্তিরে কাজ করতে আলস্য বোধ হত, তোমরা সেই খোলার ঘরের ভিতর শুয়ে—ফিরে দেখতুম, আর আমার দ্বিগুণ উৎসাহ

বাড়তো, সেই উৎসাহই আমার উন্নতির মূল। আমার যা বিষয়-আশয় তাতে তোমরা সম্পূর্ণ অংশী। * * * * * *।"

## ৬। অমৃতলাল বসু

নাট্যকার হিসা.ব অমৃতলাল গিবিশচন্দ্রের মতোই খ্যাতিসম্পন্ন। তবে তাঁর গদ্য সংলাপ প্রায়শ একটু হালকা রকমের। এ সব অবশ্য ঘটেছে তাঁর বিষয়বস্তুর জন্যে। তিনি হাস্যরপ্রধান নাট্য রচনার জন্যেই নাম করেছেন ; তাঁর এই নাটকগুলির ভাষা বেশ হালকা ও স্বাভাবিক। নিচে তাঁর কোন নাটক থেকে একটি দৃষ্টান্ত তুলে দেওযা যাচ্ছে :—

"ফুল। * * * তা বেশ! অস্থাবর সম্পত্তি দেখছি, সবই আপনাকে সমর্পণ করেছেন, আপনি ও তা সন্তুষ্ট হযে গ্রহণ করেছেন?

তিল। চন্দ্র সূর্য্য যমুনা সাক্ষী করে।

ফুল। উত্তম! চন্দ্র ঐ আদালতে উপস্থিতই আছেন, সূর্য্যিঠাকুরও কাকের মুখে খবর পেলেই এসে হাজির হবেন, আর আমি ভদ্র-লোকের কথায় অবিশ্বাস করছি না; নইলে যমুনা সুন্দরীর নামে সপিনা বার করতেম। শ্রীকৃষ্ণের বাঁশরী শুনে মাঠের মাঝখানে রূপের তরঙ্গ তুলে নাচতে যার লজ্জা হয নি, বেণীমাধবের প্রেমে উন্মাদিনী হয়ে যে যমুনা বিউনী খুলে নাযককে কালো কেশের লহরলীলা দেখিয়েছেন, হিন্দু বৌদ্ধ পাঠান মোগল ক্রমে ক্রমে সকলেই যে যমের সহোদরার অন্ধকার অন্দরমহলে স্থান পেযেছে, তাঁকে ত আর কোন আইনে পর্দ্দানশীন বলা যায না।"

## ৭। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

গিরিশচন্দ্র ও অমৃতলালের পরবর্তী নাট্যকারের সংখ্য নেহাৎ অল্প নয় কিন্তু তাঁদের মধ্যে খুব কম লোকেরই সংলাপ রচনার উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব আছে। এ দিক দিয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের (ডি. এল. রায়) বচনায একটু কৃতিত্ব আছে। তাঁর নাটকের ভাষা বেশ জোরালো এবং পাত্রপাত্রীদের ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সম অনুপাতে রচিত। নিচে তাঁর 'চন্দ্রগুপ্ত' থেকে একটি অংশ উদ্ধৃত করা যাচ্ছে :—

"সেকেন্দার। সত্য সেলুকস! কি বিচিত্র এই দেশ, দিনে প্রচণ্ড সূর্য্য এর গাঢ় নীল আকাশ পুড়িয়ে দিয়ে যায়; আর রাত্রি-কালে শুভ্র চন্দ্রমা এসে তাকে স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় স্নান করিয়ে দেয়। তামসী রাত্রে অগণ্য উজ্জ্বল জ্যোতিপুঞ্জে যখন এর আকাশ ঝলমল করে, আমি বিস্মিত আতঙ্কে চেয়ে থাকি। * * * আমি নির্ব্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে দেখি। এর অভ্র.ভদী ধবলতুষারমৌলি নীল হিমাদ্রি স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আছে। * * * *"

দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকগুলি যে যে কারণে খুব জনপ্রিয় হয়েছিল, তাঁর চমৎকার ভাষা তাদের অন্যতম। এবং এই ভাষার জন্যে তাঁর নাটকগুলি দীর্ঘকাল যাবৎ সাহিত্যরসিকদের মনোযোগের বিষয় হয়ে থাকবে।

## ৮। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কেবল কথাসাহিত্য বা প্রবন্ধ রচনায় নয়, নাটকের সংলাপ রচনায়ও রবীন্দ্রনাথ যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়াছেন। পেশাদাররঙ্গ মঞ্চে তাঁর নাটক-গুলি তেমনভাবে ভিড় জমাতে না পারলেও এদের সাহিত্যিক আকর্ষণ যে উচ্চশ্রেণীর, এটা বিশেষভাবে ঘটেছে তাঁর সংলাপের অপূর্ব ভঙ্গীর জন্য। কিন্তু এ ভঙ্গী পাত্রপাত্রীদের চরিত্র অনুসারে বিবিধ ও বিচিত্র। উপস্থিত প্রবন্ধে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা সম্ভবপর নয়। রবীন্দ্রনাথ রচিত সংলাপের কেবল তিনটি নমুনা উদ্ধৃত ক'রে বাংলা নাটকীয় গদ্যের মোটামুটি পরিচয় সমাপ্ত করা হবে। রবীন্দ্রনাথের রচিত হাস্যরসমূলক সংলাপগুলিই সর্বাগ্রে বিবেচ্য। এদিক দিয়ে তাঁর কৃতিত্ব সর্বোত্তম। স্থূলতা ও গ্রাম্যতা বর্জন করেও তিনি সুন্দর হাস্যরস সৃষ্টি করেছেন। নিচে "হাস্যকৌতুক' থেকে একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাচ্ছে:—

"কার্ত্তিক। আমি ত বিষম মুস্কিলে পড়েছি। আমার নাম কার্ত্তিক আমার ছোট শালার নাম কীর্ত্তি। আমার স্ত্রী তার ভাইকে কীর্ত্তি বলে ডাকতে পারে কি না, এটা স্থির করে না দিলে স্ত্রীর সঙ্গে একত্র বাস করাই দায় হয়েচে। তার উপর গয়লা বেটার নাম কীর্ত্তিবাস,

এখন গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করতে হবে আর স্ত্রী যদি কীর্ত্তিবাস গোয়ালাকে বাসুদেব বলে ডাকে তা হলে বৈধ হয় কি না। বাড়ীতে কার্ত্তিক পূজার সময় স্ত্রী যদি কার্ত্তিককে নাত্তিক বলে, নাম খারাপ করার দরুণ ঠাকুরের কিম্বা তাঁর মার কোনো অসন্তোষ ঘটে কিনা এও জিজ্ঞাস্য।

অপূর্ব্ব। আমারো একটা ভাবনা পড়েছে। সে বার শ্রীক্ষেত্রে গিয়ে জগন্নাথকে কুল দিয়ে এসেছিলুম, এখন, এই গর্ম্মির দিনে কুলটুকু, বাদ দিয়ে যদি তার ঝোলটুকু খাই তাতে অপরাধ হয় কি না?"

এ ভাষায় কোন ভারিক্কি চাল নেই আর এতে ইতরতাও অনুপস্থিত অথচ হাস্যরস চমৎকার ফুটেছে। পেশাদারী নাটকলেখকদের মধ্যে এ গুণ একান্ত দুর্লভ। বাংলা লিরিকের ও সঙ্গীতের অপূর্ব স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথের নাটকীয় গদ্যে করুণ রস যে খুব স্বাভাবিক ভাবে ফুটেছে তা বলাই বাহুল্য। 'গৃহ প্রবেশ' থেকে এর একটু নমুনা নিচে দেওয়া গেল :—

"যতীন। ঐ বাঁশীটা থামিয়ে দাও না ওটা কি গৃহ প্রবেশের জন্য আনিয়েছে? ওর আর দরকার নেই।

মাসি। পাশের বাড়িতে বিয়ে, ওবাঁশি সেই খানে বাজছে।

যতীন। বিয়ের বাঁশি? ওর মধ্যে এত কান্না কেন? বেহাগ বুঝি? তোমাকে কি আমার স্বপ্নের কথা বলেচি, মাসি?

মাসি। কোন্ স্বপ্ন?

যতীন। মণি যেন আমার ঘরে আবার জন্যে দরজা ঠেলছিল। কোনো মতেই দরজা এতটুকুর বেশি ফাঁক হ'ল না। সে বাইরে দাঁড়িয়ে দেখ্‌তে লাগল। কিছুতেই ঢুক্‌তে পারলে না। অনেক করে ডাকলুম, তার আর গৃহপ্রবেশ হ'ল না। হ'ল না, হ'ল না, হ'ল না। ( মাসি নিরুত্তর ) বুঝেছি আমি দেউলে। একেবারে দেউলে। সব দিকে। * * * *"

করুণ রসের কোমলতা ছাড়া নাটকীয় সংলাপের মধ্যে তিনি

ওজস্বিতাকেও ফুটিয়েছেন বেশ সার্থকভাবে। নিচে এর একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাচ্ছে :—

"লোকেশ্বরী। নির্ব্বোধকে কেমন করে বোঝাব অহিংসা ইতরের ধর্ম্ম! হিংসা ক্ষত্রিয়ের বিশাল বাহুতে মাণিক্যের অঙ্গদ, নিষ্ঠুরের তেজে দীপ্যমান।

বাসবী। শক্তির কি কোমল রূপ নেই?

লোকেশ্বরী। আছে, যখন সে ডোবায়। যখন সে দৃঢ় করে বাঁধে তখন না। পর্ব্বতকে সৃষ্টিকর্ত্তা নির্দ্দয় পাথর দিয়ে গড়েছেন, পাঁক দিয়ে নয়। তোমাদের গুরুর কৃপায় উপর থেকে নীচে পর্য্যন্ত সবই কি হবে পাঁক? * * *

* * * * * * * *

তা হ'লে নির্দ্দয়তা করবার গুরুতর কাজ গ্রহণ করবে কে? কেউ যদি না করে তবে বীরভোগ্যা বসুন্ধরার কী হবে গতি? যত সব মাথাহেঁট করা উপবাসজীর্ণ ক্ষীণকণ্ঠে মন্দাগ্নিম্লান নির্জ্জীবের হাতে তার দুর্গতির কি সীমা থাকবে? তোরা ক্ষত্রিয়ের মেয়ে, কথাটা তোদের কাছে এত নতুন ঠেকচে কেন বাসবী?"

এ ধরণের বীররস ছাড়া নানা রস রবীন্দ্রনাথের নাটকীয় গদ্যে স্ফুর্ত্তি পেয়েছে। এ দিক দিয়েও তিনি বাংলা গদ্যকে সমৃদ্ধ করেছেন।

# পরিশিষ্ট (৩)

## প্রমাণপঞ্জী ও বিশেষ মন্তব্য*

### ১ম অধ্যায়

রামগতি ন্যায়রত্ন—বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব,

রমেশচন্দ্র দত্ত – Literature of Bengal,

দীনেশচন্দ্র সেন—বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, বঙ্গসাহিত্য পরিচয়, Bengali Prose Style,

সুশীলকুমার দে—History of Bengali Literature in the 19th century,

### ২য় অধ্যায়

দীনেশচন্দ্র সেন—বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, বঙ্গসাহিত্য পরিচয়,

শিবরতন মিত্র—Types of Early Bengali Prose,

সুশীলকুমার দে—History of Bengali Literature in the 19th century,

দোম আন্তনিও (Dom Antonio) ব্রাহ্মণ-রোম্যান-ক্যাথলিক-সংবাদ —সুরেন্দ্রনাথ সেন সম্পাদিত,

আসুম্পসাঁও ( Manoel da Assump c m )—কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ

জ্ঞানমার্জনী গ্রন্থ ( অমুদ্রিত পুঁথি )।

### ৩য় অধ্যায়

দীনেশচন্দ্র সেন —বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, বঙ্গসাহিত্য পরিচয়,

শিবরতন মিত্র —Types of Early Bengali Prose,

সুশীলকুমার দে—History of Bengali Literature in the 19th century,

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ( ১৯শ ভাগ ),

* মুখ্যত যে সকল বইএর সাহায্য নিয়ে এ গ্রন্থ [illegible], গ্রন্থপঞ্জীতে অধ্যায়ানুক্রমে সেগুলির উল্লেখ করা হ'ল। আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে যারা আরো বেশী জানতে চান এতে তাদের সুবিধা হবে আশা করা যায়।

নিখিলনাথ রায়—প্রতাপাদিত্য,
প্রবাসী, ১৩৪৭, ১৩৪৮ বাং।

**পৃঃ ২৬**—( পংক্তি ২১ ) রামরাম বসু ( অনুমানিক ) ১৭৬৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মৃত্যু হয় ১৮১৩ সালে। পরিশিষ্ট (১) দ্রষ্টব্য।

## ৪র্থ অধ্যায়

সুশীলকুমার দে—History of Bengali Literature in the 19th century,
রামরাম বসু—রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র, লিপিমালা,
গোলোকনাথ শর্ম্মা—হিতোপদেশ,
মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার—বত্রিশ সিংহাসন, হিতোপদেশ, রাজাবলী,
গিলক্রীষ্ট ( Gilchrist )—Oriental Fabulist,
চণ্ডীচরণ মুনশী—তোতা ইতিহাস,
রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়—রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্র,
উইলিয়ম কেরী ( W. Carey )—কথোপকথন, ইতিহাসমালা,
হরপ্রসাদ রায়—পুরুষ পরীক্ষা,
লঙ্ (Long, Rev. J,)—A Descriptive Catalogue of 1400 Vernacular Works and Pamphlets.

## ৫ম অধ্যায়

শিবনাথ শাস্ত্রী—রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ,
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—সংবাদপত্রে সেকালের কথা,
রামমোহন রায়—বাংলা গ্রন্থাবলী,
মৃতুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার—বেদান্তচন্দ্রিকা,
কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন—পাষণ্ডপীড়ন।

## ৬ষ্ঠ অধ্যায়

রামজয় তর্কালঙ্কার—সাংখ্যপ্রবচন ভাষ্যের অনুবাদ,
তারাচাঁদ দত্ত—মনোরঞ্জনেতিহাস,

ফিলিক্স্ কেরী (F. Carey)—ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা,
কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন—ভাষাপরিচ্ছেদের অনুবাদ, পাষণ্ডপীড়ন,
ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায—কলিকাতা কমলালয, নববাবুবিলাস,
গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার—স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক,
ভ্রমপ্রকাশপত্র ( খ্রীষ্টান মিশনারীদের কৃত ),
নীলরত্ন হালদার—বহুদর্শন,
ভবানীচরণ তর্কভূষণ—জ্ঞানরসতরঙ্গিণী,
পিয়ার্স ( W. Pearce )—পশ্বাবলী।

## ৭ম অধ্যায়

লঙ্ ( Long Rev. J. )—সংবাদসার,
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায—সংবাদপত্রে সেকালের কথা।

## ৮ম অধ্যায়

লঙ্—সংবাদসার,
রামগতি ন্যায়রত্ন—বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষরক প্রস্তাব,
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাস, সংবাদ-
পত্রে সেকালের কথা।

## ৯ম অধ্যায়

মার্শম্যান ( J. C, Marshman )—সদ্‌গুণ ও বীর্য্যের ইতিহাস,
ভারতবর্ষের ইতিহাস,
ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়—গ্রীক দেশের ইতিহাস,
মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ( ? )—প্রবোধচন্দ্রিকা,
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—Essays and Letters,
কলিকাতা বাইবেল সোসাইটি প্রকাশিত বাইবেলের অনুবাদ (১৮৩৩-৪০)
গোপাললাল মিত্র—জ্ঞানচন্দ্রিকা,
গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ—জ্ঞানপ্রদীপ ( ১ম ভাগ ),
প্রেমচাঁদ রায়—জ্ঞানার্ণব,
ব্রজমোহন দেব ( মজুমদার )—পথ্যপ্রকাশ।

## ১০ম অধ্যায়

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—বাংলা সাময়িকপত্রের ইতিহাস,

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ( ১৮৫৪-১৮৫৫ ),

প্রিয়নাথশাস্ত্রী-দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনচরিত, পরিশিষ্টের পূর্বপরাংশ,

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান, ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা, আত্মজীবনী,

অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পৃঃ ৯৯ (পংক্তি ৮) —দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'তত্ত্ববিদ্যা',' 'প্রবন্ধমালা', 'নানাচিন্তা' ও 'গীতা পাঠের ভূমিকা' উল্লেখযোগ্য গদ্য রচনা।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর—'বৌদ্ধধর্ম্ম', 'বোম্বাই চিত্র' এবং 'আমার বাল্যকথা ও বোম্বাইপ্রবাস' এই তিনখানি সত্যেন্দ্রনাথের প্রসিদ্ধ গদ্যরচনা। তিনি রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত 'বিবিধার্থ-সংগ্রহে'ও প্রবন্ধ লিখতেন।

জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর—'প্রবন্ধমালা','সত্য, সুন্দর, মঙ্গল', 'মার্কাস অরিলিয়সের আত্মচিন্তা', 'ইংরাজবর্জিত ভারতবর্ষ' জ্যোতিরিন্দ্র নাথের গদ্য রচনার উত্তম নিদর্শন।

স্বর্ণকুমারী দেবী—'দীপনির্ব্বাণ' 'হুগলীর ইমামবাড়ী' 'নবকাহিনী' পড়লেই স্বর্ণকুমারীর গদ্য রচনার প্রকৃতি বুঝতে পারা যাবে। এ সকল রচনায় বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাবও বিদ্যমান।

## ১১শ অধ্যায়

অজিত কুমার চক্রবর্ত্তী—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর,

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ( ১৮৪৩ ৫৫ ),

অক্ষয়কুমার দত্ত—চারু পাঠ ২য় ভাগ (৺সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত), বাহ্য-বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার, ধর্ম্মনীতি, পদার্থ বিদ্যা, ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়,

ইয়েটস্ ( Dr. Yates )—সার সংগ্রহ।

**পৃঃ ১০৭** (পংক্তি ১৮-২০) এখানে উদ্ধৃতাংশ "বাহ্যবস্তুর" ৮ম মুদ্রণের ( ১৮০৩ শকাব্দা ) ৬৬-৬৭ পৃষ্ঠায় কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে প্রকাশিত হয়েছে।

**পৃঃ ১০৭** ( পংক্তি ২৭-২৮ ) এবং **পৃঃ ১০৮** পংক্তি (১-১২)—এখানে উদ্ধৃতাংশটি 'ধর্ম্মনীতি'র ১১শ মুদ্রণ ( ১৮৬১ শক) ৪৬-৪৭ পৃষ্ঠায় অবিকল ভাবে মুদ্রিত হয়েছে।

**পৃঃ ১১০** ( পংক্তি ৩০ )—রজনীকান্ত গুপ্ত ( ১৮৪৯-১৯০০ )মহাশয়ের বহু রচনার মধ্যে 'সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস' এবং 'আর্য্যকীর্ত্তি' বিশেষ খ্যাত।

## ১২শ অধ্যায়

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায —উপদেশ কথা, সত্যস্থাপন ও মিথ্যানাশন, বিদ্যাকল্পদ্রুম।

## ১৩শ অধ্যায়

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—বেতাল পঞ্চবিংশতি ( ১ম সং ), জীবন চরিত (১ম সং), শকুন্তলা (১ম সং) সীতার বনবাস (১ম সং ও চারুচন্দ্র চন্দ্যোপাধ্যায সম্পাদিত সং ), গ্রন্থাবলী,

তারাশঙ্কর তর্করত্ন— কাদম্বরী,

কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য— দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথাভ্রমণ,

রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়—টেলিমেকস,

রামগতি ন্যায়রত্ন—রোমাবতী,

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়— বিষবৃক্ষ।

**পৃঃ ১৩০** (পংক্তি ১৩) 'বঙ্গ ভাষার লেখক' নামক পুস্তকে (পৃঃ ৫২৬) অক্ষয়চন্দ্র সরকার, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্যের 'দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ' সম্বন্ধে বলেন, "বাঙ্গালা ভাষার ও বাঙ্গালা সাহিত্যের নানারূপ আলোচনা আলোড়ন হইতেছে, কিন্তু এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা খানির কথা কাহাকেও বলিতে শুনি না, বা লিখিতে দেখি না। অথচ আমার বিশ্বাস "দুরাকাঙ্ক্ষে"র ভাষা বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষার জননী।

হউক বা না হউক, এই ভার বিশেষত্বের দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে ক্ষতি কি ?”

**পৃঃ ১৩০** (পংক্তি ১৭)—এ প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিত “বাঙ্গালা সাহিত্যে ৺প্যারীচাঁদ মিত্রের স্থান” নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

## ১৪শ অধ্যায়

রাজেন্দ্রলাল মিত্র—বিবিধার্থ সংগ্রহ (১৮৫১-১৮৫৮), রহস্যসন্দর্ভ (১৮৭০) খৃষ্টীয় স্তব।

## ১৫শ অধ্যায়

প্যারীচাঁদ মিত্র—গ্রন্থাবলী।

## ১৬শ অধ্যায়

ভূদেব জীবনী—কুমারদেব মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়—ঐতিহাসিক উপন্যাস, ইংলণ্ডের ইতিহাস, বাঙ্গালার ইতিহাস, স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস, বিবিধ প্রবন্ধ, সামাজিক প্রবন্ধ, পারিবারিক প্রবন্ধ, আচার প্রবন্ধ,

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় –Essays and Letters.

## ১৭শ অধ্যায়

উপদশক (১৮৪৭-৫২),

সত্যার্ণব (১৮৫৯-১৮৫৩),

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—বাংলা সাময়িকপত্রের ইতিহাস।

## ১৮শ অধ্যায়

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী।

## ১৯শ অধ্যায়

রহস্য সন্দর্ভ—রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত,

হরিমোহন মুখোপাধ্যায়—বঙ্গ ভাষার লেখক ১ম ভাগ,

প্যারীচাঁদ মিত্রের গ্রন্থাবলী (বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লিখিত ভূমিকাসহ)

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—আনন্দমঠ, চন্দ্রশেখর, বিষবৃক্ষ, রজনী, সীতারাম।

**পৃঃ ১৯৩** (পংক্তি ১৭)—সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—এঁর রচিত ‘পালামৌ’, বাংলা গদ্য সাহিত্যের স্থায়ী সম্পৎ।

যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ—গারীবল্ডির জীবনবৃত্ত’, ‘ম্যাটসিনির

জীবনবৃত্ত', 'আত্মোৎসর্গ', 'হৃদয়োচ্ছ্বাস', 'কীর্ত্তিমন্দির' প্রভৃতি গ্রন্থ লিখে বাংলা গদ্যকে পরিপুষ্ট করে গেছেন।

চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁর রচিত বাংলা গদ্য কাব্য 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমে'র জন্য চিরস্মরণীয় হয়ে গেছেন।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর গদ্য রচনাবলির মধ্যে 'বাল্মীকির জয়', 'বেণের মেয়ে' প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায 'নবীন সন্ন্যাসী', 'দেশী ও বিলাতী' আদি উপন্যাস ও গল্প লিখে যশস্বী হয়ে গেছেন।

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলি ('ধর্ম্মপাল', ময়ূখ' আদি) তাঁর গদ্য রচনার উত্তম নিদর্শন।

## ২০শ অধ্যায়

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত—কেশবচন্দ্র ও বঙ্গসাহিত্য

স্থলভ সমাচার ও কেশবচন্দ্রের রাষ্ট্রবাণী

কেশবচন্দ্র সেন—আচার্য্যের উপদেশ,

হরিমোহন মুখোপাধ্যায়—বঙ্গভাষার লেখক ১ম ভাগ,

কালীপ্রসন্ন ঘোষ—প্রভাত চিন্তা, নিভৃত চিন্তা, নিশীথ চিন্তা,

রমেশচন্দ্র দত্তের গ্রন্থাবলী ( বসুমতী সংস্করণ ),

মীর মশারফ হোসেন—বিষাদসিন্ধু।

পৃঃ ২১০ ( পংক্তি ১১ )

'স্বর্ণলতা ( ১৮৭৪ ) রচয়িতা তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ও বঙ্কিম যুগের একজন সুপরিচিত গদ্য লেখক। তবে তাঁর রচনারীতির কোন উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য নেই।

## ২১শ অধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র, য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারী, বৌঠাকুরানীর হাট, চোখের বালি, নৌকাডুবি, গল্পগুচ্ছ, প্রাচীন সাহিত্য, রাজর্ষি, গোরা,

সুকুমার সেন—বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য, ( ১ম সং )

**পৃঃ ২২৪** ( পংক্তি ২৮ )

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গদ্য রচনাবলি তাঁর গ্রন্থাবলীতে সংগৃহীত হয়েছিল। সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রবন্ধাবলি তাঁর গদ্য রচনার নিদর্শন। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর 'জিজ্ঞাসা'‘'কর্ম্মকথা', 'চরিত-কথা', 'শব্দকথা', 'যজ্ঞকথা' ইত্যাদি প্রবন্ধগ্রন্থ চিন্তাশীল পাঠকগণের বিশেষ পরিচিত। এ সকল বইতে তিনি বেশ সহজ ভাষায় নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা করেছেন।

## ২২শ অধ্যায়

সবুজপত্র ( ১ম পর্যায় ),

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—ছিন্নপত্র, চতুরঙ্গ, শান্তিনিকেতন, ঘরে বাইরে, যোগাযোগ, শেষের কবিতা, ছেলেবেলা।

## ২৩শ অধ্যায়

স্বামী বিবেকানন্দ—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, পরিব্রাজক, ভাববার কথা, বর্ত্তমান ভারত,

প্রমথ চৌধুরী—বীরবলের হালখাতা,

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায—শ্রীকান্ত ( ১ম পর্ব )

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর—রাজকাহিনী, পথে বিপথে, শকুন্তলা, ক্ষীরের পুতুল, নালক।

**পৃঃ ২ ৬** ( পংক্তি ২৮ ) রবীন্দ্রযুগের লেখক লেখিকাদের নামের সঙ্গে নিম্নলিখিত নামগুলিও উল্লেখ করা উচিত। ৺কুমুদিনী বসু—এঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'শিখের বলিদান'। স্বর্গীয় বিপ্লিনচন্দ্র পাল—এঁর প্রবন্ধগুলি নানা সাময়িক পত্রে ছড়ানো আছে। স্বর্গীয় দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী—ইনি 'নব্য ভারত, পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। এঁর রচিত 'ভিখারী' আদি প্রবন্ধ পুস্তক আছে।

## ২৪শ অধ্যায়

স্বামী বিবেকানন্দ—ভাববার কথা।

# অকারাদিক্রমে নাম-সূচী